اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

মাওয়ায়েযে আশ্‌রাফিয়া

দুনিয়া ও আখেরাত (১)

ভলিউম-১

লেখক
কুত্‌বে দাওরান, মুজাদ্দিদে যমান, হাকীমুল উম্মত
হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী চিশ্‌তী (রঃ)

অনুবাদক
মাওলানা মোহাম্মদ নূরুর রহমান এম,এম; এফ,আর
প্রাক্তন সহকারী অধ্যক্ষ, রায়পুর আলিয়া মাদ্রাসা, নোয়াখালী

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার ঃ ঢাকা

মুখবন্ধ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهٗ

সৃষ্টির আদিকাল হইতে কেবল এই উদ্দেশ্যেই আম্বিয়া আলাইহিমুস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালাম প্রেরিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা আল্লাহ্ পাকের সম্পর্কহারা মানবজাতিকে ওয়ায-নসীহত এবং এরশাদ ও হেদায়তের সাহায্যে পুনরায় আল্লাহ্ তা'আলার সহিত তাহাদের সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিবেন। এই মর্মেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

অর্থাৎ "[হে মোহাম্মদ (দঃ)]! আপনি (বিভ্রান্ত মানব জাতিকে) সুন্দর নসীহত এবং হেক-মতের সহিত আপনার প্রভুর পথের দিকে আহ্বান করুন।"

এই জন্যই যেসমস্ত ওলামায়ে কেরাম উক্ত উদ্দেশ্যকে স্বীয় জীবনের একমাত্র লক্ষ্যরূপে অবলম্বন করিয়াছেন এবং উক্ত উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য দুনিয়ার যাবতীয় লোভ-লালসা, ভয়-ভীতি ও তিরস্কার-ভর্ৎসনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দাওয়াতে হকের মশাল হাতে বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন, একমাত্র তাঁহারাই নবীর সত্যিকারের ওয়ারিস বলিয়া দাবী করিতে পারেন। এই পবিত্র ও মহান মনীষীদের বদৌলতে অসংখ্য ঝড়ঝঞ্ঝা ও বাধা-বিঘ্নের মোকাবিলায় আজও পৃথিবীর বুকে ইসলামের মশাল প্রজ্বলিত রহিয়াছে। ইন্‌শাআল্লাহ্, কিয়ামত পর্যন্ত ইহা প্রজ্বলিতই থাকিবে। এই প্রসঙ্গে হুযূর (দঃ) বলিয়াছেনঃ

لَايَزَالُ طَآئِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِىْ مَنْصُوْرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لَايَضُرُّ هُمْ مَّنْ خَذَلَهُمْ

অর্থাৎ "আমার উম্মতের এক দল সর্বদা সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। শত্রুপক্ষ তাহাদের কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না।" সুতরাং কোন শতাব্দী এবং কোন যুগই এই পবিত্র সত্যপন্থীর দল হইতে শূন্য থাকিতে পারে না, প্রত্যেক যুগেই ইঁহাদের এক দল বিদ্যমান থাকিয়া ইসলাম প্রচার করেন এবং আল্লাহ্ পাকের বাণীকে সর্বোচ্চে তুলিয়া ধরার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর (রঃ) [জন্ম-১২৮০ হিঃ, মৃত্যু-১৩৬২ হিঃ] মহান ব্যক্তিত্ব ছিল এই খোদায়ী সাহায্যপ্রাপ্ত দলের শিরোমণি। সমগ্র জগত তাঁহাকে হাকীমুল উম্মত (আত্মার চিকিৎসক) এবং মুজাদ্দিদুল মিল্লাত (যুগ-সংস্কারক) আখ্যায় আখ্যায়িত করিত। এই আখ্যা বাস্তবিকই তাঁহার প্রাপ্য ছিল। তাঁহারই মহামূল্য ও অমর অবদান ওয়াযসমূহের কতিপয় ওয়ায বাংলাভাষায় অনুবাদ করিয়া বাংলাভাষী ভাইদের খেদমতে পেশ করা হইতেছে।

ধর্মের অপরাপর শাখার ন্যায় পেশাদার ওয়ায়েযগণ জনসাধারণের চক্ষে ধর্মীয় ওয়াযের মর্যাদা খর্ব ও হেয় করিয়া দিয়াছে। বিশেষত ধর্মীয় ওয়াযের নামে বাংলা ও উর্দু ভাষায় আজ পর্যন্ত যেসমস্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, উহা পাঠ করিয়া ধর্মীয় ওয়াযের স্বরূপ সম্বন্ধে জনমনে এরূপ ধারণা জন্মিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, ধর্মের সুন্নত, মুস্তাহাব এবং কতিপয় নিষ্প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত এবং অচিন্তনীয় বিবেক বহির্ভূত ফযীলত ও উদগ্র বাসনা সৃষ্টি এবং মিথ্যা ও অলীক হাদীস এবং সত্যের সহিত সংগতিহীন কাল্পনিক জগতের কতিপয় চিত্তাকর্ষক ও মুখরোচক কেস্সা-কাহিনীর সমষ্টির নামই ওয়ায। অবশ্যই ইত্যাকার ধারণা পোষণের জন্য তাহাদিগকে দোষারোপ করা যায় না। কারণ, সচরাচর যেসমস্ত ওয়ায শ্রবণ বা ওয়াযের বহি-পুস্তক পাঠের সুযোগ তাহারা পাইয়া থাকে, সত্য বলিতে কি, উহার অধিকাংশই জ্ঞান-বুদ্ধির উন্নতি সাধন এবং সামাজিক ও চারিত্রিক দুর্বলতার সংস্কার বা সংশোধনের পরিপন্থী। এমন কি, ধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের ভুল বিশ্বাস, বিরূপ ধারণা এবং নৈরাশ্যের সৃষ্টি হইতে থাকে। মাওয়ায়েযে আশরাফিয়ার এই সংকলন পাঠ করার পর ইহারা নিজেদের ভ্রান্ত ধারণা পরিবর্তন করিতে নিশ্চয়ই বাধ্য হইবে। তাহাদের চোখ খুলিয়া যাইবে। তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে, সত্যিকার ওয়ায, যাহা নবীদের দায়িত্বে ছিল, কাহাকে বলে এবং মানব প্রকৃতির উন্নতি বিধান এবং সামাজিক জীবন গঠন ও উহার উন্নতিসাধনে উহা কত প্রয়োজনীয় ও উপকারী।

মাওয়ায়েযে আশরাফিয়ার প্রশংসায় কিছু বলিতে যাওয়া সূর্যকে আলো দেখানোরই সমতুল্য। آفتاب آمد دلیل آفتاب 'অর্থাৎ, সূর্য নিজেই নিজের প্রমাণ'

مشك آنست كه خود ببويد نه عطار بگويد

"আতরের সুগন্ধই আতরের পরিচয়, আতর বিক্রেতার প্রশংসার মুখাপেক্ষী নহে।"

মাওয়ায়েযে আশরাফিয়ার পাঠকবৃন্দ প্রথম দৃষ্টিতেই উহার মধ্যে নিম্নলিখিত গুণাবলী উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

১। এই ওয়াযগুলি কোরআন-হাদীসের সত্যিকারের ব্যাখ্যা হিসাবে ইহার উপকারিতা কোন স্থান বা কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে; বরং ইহা প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক স্তরের জন্য সর্বদা প্রাথমিক কালের ন্যায়ই সমান উপকারী ও শিক্ষণীয়।

২। প্রতিটি ওয়াযের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত—প্রত্যেকটি কথাই জ্ঞানগর্ভ সূক্ষ্ম তত্ত্ব, সারগর্ভ চিন্তার বিকাশ এবং সংস্কারমূলক হেদায়তে পরিপূর্ণ। শুধু জোর গলাবাজি ও বিচিত্র বর্ণনাভঙ্গি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অর্থহীন ও অমূলক বাক্যের সংমিশ্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।

৩। প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত সমস্ত কেস্সা-কাহিনী এবং কৌতুক বাক্যই উপদেশমূলক এবং জ্ঞান-বর্ধক। এমন কোন কেস্সাই ইহাতে নাই যাহা কেবল সাময়িক আনন্দ প্রদান এবং শ্রোতৃবর্গকে চমৎকৃত করিয়া বাহবা হাসিল করার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে।

৪। ইহাতে মিথ্যা ও অলীক রেওয়ায়ত এবং কাল্পনিক কেস্সা-কাহিনীর নাম-গন্ধও নাই। যাহাকিছু বলা হইয়াছে—নির্ভরযোগ্য সনদ, সঠিক বরাত এবং সুষ্ঠু জ্ঞান ও বিবেকের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে।

৫। পেশাদার ওয়ায়েযদের ন্যায় স্থান, কাল এবং শ্রোতৃবর্গের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া প্রত্যেক ওয়াযে একই জাতীয় কয়েকটা কথা বার বার আওড়ান হয় নাই। যাহাতে দুই-চারিটি

ওয়ায শ্রবণ বা পাঠ করার পরই বিরক্তি ও বিতৃষ্ণভাব উৎপন্ন হয়; বরং ইহার প্রত্যেকটি ওয়াযেই শ্রোতৃবর্গের ধর্মীয় প্রয়োজন ও অবস্থা অনুযায়ী নূতন নূতন জ্ঞাতব্য বিষয় এবং শরীঅত বিধান-সমূহের হেকমত ও রহস্যসমূহ দৃষ্টিপথে তরঙ্গায়িত হইবে। অর্থাৎ, একটি ওয়ায পাঠ করার পর আর একটি পাঠের পিপাসা বৃদ্ধিই পাইতে থাকিবে।

৬। আমলের ফযীলত বর্ণনা, বেহেশ্‌তের প্রতি আগ্রহান্বিত করা এবং দোযখের ভয় প্রদর্শনের মধ্যেই ওয়াযগুলি সীমাবদ্ধ নহে; বরং অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আহ্‌কাম এবং দ্বীনী মাসায়েলের ব্যাখ্যা, রহস্য ও হেকমত সম্বন্ধীয় বিস্তারিত বিবরণ এবং এল্‌মে মা'রেফাত ও হাকীকতের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত, ইহার বিভিন্ন স্তরের অতুলনীয় বিশ্লেষণের মহামূল্য ও অফুরন্ত ভাণ্ডারে এ সমস্ত ওয়ায পরিপূর্ণ।

৭। এই পবিত্র মাওয়ায়েযের সর্বপ্রধান ও মৌলিক বিশেষত্ব এই যে, ইহা এমন একজন মহাপুরুষের ওয়ায, যাঁহার কথা ও কাজ এবং ভিতর ও বাহিরের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য ছিল। এই কারণেই তাঁহার ওয়াযের মধ্যে কোথাও লৌকিকতা এবং কৃত্রিমতার নাম-গন্ধ পর্যন্ত নাই। নিয়মও তাইঃ

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ضرور

"অন্তর হইতে যে কথা বাহির হয় উহার ক্রিয়া অবশ্যই হয়।" সুতরাং উহার সক্রিয় আকর্ষণে প্রত্যেক শ্রোতা ও পাঠকের অন্তরে সত্যান্বেষণের স্পৃহা এবং নেক আমলের আকাঙ্ক্ষা বিশেষভাবে জাগিয়া উঠে। ইহা বাস্তবিকপক্ষে তাঁহার নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতারই ফলঃ

ایں سعادت بزور بازو نیست ـ تانہ بخشد خدائے بخشندہ

"আল্লাহ্ তা'আলা দান না করিলে এই সৌভাগ্য বাহুবলে অর্জন করা যায় না।"

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের কারণে তৎকালীন বিশিষ্ট আলেমগণ হযরত মাওলানা থানবীর (রঃ) ওয়াযগুলিকে যথাসময়ে শব্দে শব্দে অবিকল নকল করিয়া লওয়ার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন। এইভাবে তাঁহার অধিকাংশ ওয়াযই লিপিবদ্ধ করা হয়। অতঃপর পুস্তকাকারে প্রকাশ করার পূর্বে সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্য স্বয়ং হযরত মাওলানা (রঃ) কর্তৃক উহার শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই করিয়া লন। এই ওয়ায লিপিবদ্ধকারী মনীষীবৃন্দের বদৌলতেই হযরত থানবীর (রঃ) কয়েক শত ওয়ায দ্বারা বিশিষ্ট ও সাধারণ শ্রেণীর লোকের উপকৃত ও লাভবান হওয়ার ধারা আজ পর্যন্ত জারি রহিয়াছে। বলাবাহুল্য, ইহার তুলনা প্রাচীনকালেও দেখা যায় না।

فَجَزَاهُمُ اللهُ تَعَالٰى عَنَّا وَعَنْ سَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرَ الْجَزَاءِ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ

এমন মহোপকারী মাওয়ায়েয বাংলাভাষায় অনূদিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বহুদিন যাবৎ অনুভূত হইয়া আসিতেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা ঢাকা এমদাদিয়া লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা **আলহাজ্জ মৌলবী আবদুল করিম** সাহেবকে দ্বীন-দুনিয়ার উন্নতি দান করুন—তিনি এই বিরাট খেদমত আন্‌জাম দেওয়ার সাহস করিয়াছেন। ইহার ফলেই আজ মাওয়ায়েযের প্রথম খণ্ড বাংলাভাষায় পাঠকবৃন্দের সম্মুখে পেশ করা হইতেছে। ইন্‌শাআল্লাহ্, অবশিষ্ট মাওয়ায়েযের অনুবাদও পাঠক-বৃন্দের খেদমতে ক্রমশ পেশ করা হইবে। জনাব মৌলবী আবদুল করিম সাহেবই ইতিপূর্বে

হযরত থানবীর (রঃ) সুবিখ্যাত তফ্‌সীর বয়ানুল কোরআনের বঙ্গানুবাদ 'তফ্‌সীরে আশরাফী' এবং 'বেহেশ্‌তী জেওর' ও 'হায়াতুল মুসলেমীন' প্রভৃতি বহু মূল্যবান গ্রন্থ বাংলাভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত কিতাবগুলি সকল শ্রেণীর লোকের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। আল্লাহ্ পাকের দরবারে দো'আ করিতেছি, তিনি যেন তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করেন এবং হযরত থানবীর অবশিষ্ট কিতাবগুলি স্থানীয় ভাষায় প্রকাশ করিবার তাওফীক দান করেন। —আমীন !!

জনাব মাওলানা মোহাম্মদ নূরুর রহমান সাহেব একজন অভিজ্ঞ আলেম ও অনুবাদকার্যে পারদর্শী। ইতিপূর্বে তিনি সুবিখ্যাত উর্‌দু তফ্‌সীর বয়ানুল কোরআনের বিরাট অংশ ও পারসী গ্রন্থ কিমিয়ায়ে সা'আদাত প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। আমি তাঁহার অনুবাদিত মাওয়ায়েযে আশ্‌রাফিয়ার পাণ্ডুলিপি মূল উর্দুর সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি। তিনি মূল বিষয়বস্তুর সহিত মিল রাখিয়া এমনভাবে হুবহু অনুবাদ করিয়াছেন যে, ইহা অনুবাদ বলিয়া ধরা যায় না। ইহা অনুবাদকের এক বিরাট কৃতিত্ব। ইহার ভাষা যেমন সরল, তেমনি সাবলীল।

বাংলাভাষায় মাওয়ায়েযে আশ্‌রাফিয়ার প্রকাশনা বাংলা সাহিত্যে এক বিরাট সংযোজন এবং স্মরণীয় অবদান বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আমি আশা করি, দেশের সকল শ্রেণীর লোক ইহার প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা দান করিবেন এবং কিতাবটি বহুল পরিমাণে কাট্‌তি হইয়া এই শ্রেণীর কিতাবসমূহ প্রকাশনায় প্রকাশকের উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে।

এই মাওয়ায়েয একাকী পাঠ করা ছাড়াও সভা-সমিতিতে এবং ঘরে ঘরে পাঠ করিয়া শুনাইবার যোগ্য। এই উপায়ে নিরক্ষর লোকেরাও ইহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারিবে। এল্‌ম ও আমলের দুর্বলতা লইয়া যেসমস্ত পেশাদার ওয়ায়েয রসমী ওয়ায করিয়া বেড়াইতেছে, তাহা শ্রবণ করার চেয়ে এই মাওয়ায়েয পাঠ করা ও শ্রবণ করা সহস্র গুণে উপকারী হইবে। এই মাওয়ায়েযের মধ্যে যেন হযরত থানবী (রঃ) স্বয়ং কথা বলিতেছেন। মাওলানা থানবীর উপস্থিতিতে তাঁহার ওয়ায ত্যাগ করিয়া যার তার ওয়ায শ্রবণ করা কি কেহ পছন্দ করিবে? (কখনই না।)

فَبَشِّرْ عِبَادِىَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُو الْاَلْبَابِ

[হে মোহাম্মদ (দঃ)]! আপনি আমার সেসমস্ত বান্দাদিগকে সুসংবাদ দিন, যাহারা আমার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে, আর ভাল কথার উপর আমল করে। ইহারাই তাহারা—যাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা হেদায়ত দান করিয়াছেন। আর ইহারাই বুদ্ধিমান।

ওবায়দুল হক জালালাবাদী
ফাযিল দেওবন্দ,
অধ্যাপক, মাদ্রাসা আলীয়া ঢাকা,

২৬ শে শা'বান, ১৩৮৬ হিজরী
১০/১২/১৯৬৬ ইং

সূচী-পত্র

সূচী-পত্র

মাওয়ায়েযে আশ্‌রাফিয়া

■

আল-মুরাদ

■

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ - بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا - وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا - كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا - اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّ اَكْبَرُ تَفْضِيْلًا

ভাষণের মূল উদ্দেশ্য

হযরত থানবী (রঃ) বলেনঃ "এখন আমি আপনাদের সম্মুখে যে আয়াতগুলি তেলাওয়াত (আবৃত্তি) করিলাম, ইহার সবগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা এস্থলে বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আজ শুধু প্রথমোক্ত দুইটি আয়াত সম্বন্ধেই বর্ণনা করিব। এই দুইটি আয়াতে আল্লাহ্ পাক মানুষের দ্বিবিধ কামনার কথা উল্লেখ করিয়াছেনঃ একটি পার্থিব কামনা, অপরটি পারলৌকিক কামনা। সঙ্গে সঙ্গে উভয়বিধ কামনার পরিণাম ফলও বর্ণনা করিয়াছেন। এই বিষয়টির বিবরণ বহুবার আপনাদের শ্রুতিগোচর হইলেও আপনারা কেহই কোনদিন পূর্ণ মনোনিবেশ সহকারে উহা শ্রবণ করেন নাই। এই কারণেই সেই শ্রবণ আপনাদের মধ্যে কোন 'তাছীর' বা ক্রিয়া করিতে পারে নাই। কিছুমাত্র ক্রিয়া করিলে অবশ্যই উহার নিদর্শন ও লক্ষণসমূহ আপনাদের মধ্যে পরিলক্ষিত

হইত। পুনঃ পুনঃ শ্রবণ সত্ত্বেও যখন কাহারও মধ্যে ইহার কোন ক্রিয়া বা 'তাছীর' দেখা যাইতেছে না, সুতরাং এখন উক্ত আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যাই আমি আমার অদ্যকার ওয়াযের বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করিলাম। এই বিষয়টির অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কাহারও কোন প্রকার দ্বিমত থাকিতে পারে না। অতএব, আজ আমি তাহাই বর্ণনা করিব। সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাদের নিকট এই অনুরোধও জানাইতেছি, আপনারা এই বিষয়টিকে একটি সাধারণ বিষয় মনে করিয়া পূর্বের ন্যায় অমনোযোগিতার সহিত শ্রবণ করিবেন না। অমনোযোগী হইয়া শ্রবণ করা আর না করা সমান কথা। শ্রবণকালে কোন বিষয়ের প্রতি মনোযোগ না থাকিলে আপনি তাহা শ্রবণ করিয়াছেন বলা যায় না। দেখুন, হুযূরে আক্‌রাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিলে উহার আওয়ায কাফেরদের কর্ণে অবশ্যই প্রবেশ করিত। কিন্তু তৎপ্রতি তাহাদের মনোযোগ ছিল না বলিয়া আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন শরীফের বিভিন্ন স্থানে তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ "ইহারা শ্রবণ করে না", "ইহারা বধির"। মনে রাখিবেন, কোন বিষয় শ্রবণ করিয়া তৎসম্বন্ধে গভীরভাবে অনুধাবনপূর্বক তদনুযায়ী আমল করার নামই প্রকৃত শ্রবণ। এতদ্‌সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা 'সূরা-ছাদে' বলিয়াছেনঃ

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُو الْاَلْبَابِ ○

"এই পবিত্র কিতাব আমি আপনার প্রতি নাযিল করিয়াছি। উদ্দেশ্য এই যে, জ্ঞানের অধিকারী মানুষ ইহার মর্মার্থ অনুধাবন করিবে এবং উহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করিবে।" আবার কোরআন শরীফের মর্মার্থ গভীরভাবে উপলব্ধি না করার দরুন মানুষকে তিরস্কার করিয়া বলিলেনঃ

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ "তাহারা কি কোরআনের মর্মার্থ গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখে না?"

আমাদের মধ্যে প্রধান ত্রুটি এই যে, আমরা কোরআনের ভাবার্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা করি না। ইহার অর্থ কেহ হয়তো মনে করিবেন যে, তরজমা বা অনুবাদসহ কোরআন পাঠ করা উচিত। কিন্তু শুধু কোরআনের অনুবাদ পাঠ করা যথেষ্ট নহে। যাঁহারা অনুবাদসহ কোরআন তেলাওয়াত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যেও এই ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় যে, তাঁহারা কোরআনের মর্মার্থ অনুধাবন করেন না। ভাসা ভাসারূপে অনুবাদ পড়িয়া যান মাত্র। আপনারা হয়তো বলিবেন, "তবে কি ইহার অর্থ এই যে, সমস্ত মুসলমানকেই বিজ্ঞ আলেম হইতে হইবে?" না, কখনই না। আমি আপনাদিগকে বিজ্ঞ আলেম হইবার পরামর্শ দিতেছি না। সকলের পক্ষে তাহা সম্ভবও নহে; বরং আমার কথার উদ্দেশ্য এই যে, আলেমগণ কোরআন শরীফের যেসমস্ত প্রয়োজনীয় অংশ আমলের সুবিধার্থে একত্রিত করিয়া ফেকাহ্ নাম দিয়াছেন, আপনারা মনোযোগের সহিত তৎসমুদয় অনুধাবন করেন না।

কোরআনে মনোনিবেশঃ কোরআনে মনোনিবেশ করার অর্থ ইহা নহে যে, কোরআন শরীফ সম্মুখে রাখিয়াই উহার ভাবার্থ সম্বন্ধে অনুধাবন করিতে হইবে; বরং যেসমস্ত কিতাবে কোরআন শরীফের বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, মনোযোগ সহকারে সেসমস্ত কিতাব অনুধাবনে পরিশ্রম করাও কোরআনে মনোনিবেশ করারই শামিল। এখন হয়তো আপনারা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কোরআনের অনুবাদ না জানা মুসলমানদের পক্ষে ত্রুটিজনক বা দূষণীয় নহে। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে কোরআনের তরজমা শিক্ষা করা সম্ভবও নহে। এতদ্ব্যতীত সকলেরই

আলেম হওয়া কঠিন। তরজমা শিক্ষা করা কোরআনের মর্ম উপলব্ধির জন্য যথেষ্টও নহে। সুতরাং এই অপূর্ণ পন্থা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। সত্য বলিতে গেলে, উর্দু তরজমা পাঠ করিয়া কোরআন -এর ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করাও বিজ্ঞ আলেম ব্যতীত কোন সাধারণ মানুষের কাজ নহে। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে, উর্দু তরজমা পাঠকারীদিগকে কোরআনের বহু বিষয়বস্তু বুঝাইতে যাইয়া গলদঘর্ম হইতে হইয়াছে। কেননা, কোরআনে এমন অনেক বিষয়বস্তু রহিয়াছে যাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, 'নাহু, (ব্যাকরণশাস্ত্র) বালাগাত (অলঙ্কারশাস্ত্র) নাসেখ ও মানসুখ (রহিত ও রহিতকারী আয়াতসমূহের বিবরণ) ওছুল এবং ফেকাহ্ (মূলনীতি ও শাখাবিধান) প্রভৃতি কতিপয় শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি থাকা প্রাথমিক প্রয়োজন। এই প্রাথমিক শাস্ত্রগুলিতে যতক্ষণ কেহ জ্ঞানলাভ না করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোরআন শরীফের উক্ত বিষয়গুলি কোনরূপেই অবগত হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নহে।

তদুপরি মহাসমস্যা এই যে, কোন কিছু বুঝিতে অক্ষম হইলে অপরের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হওয়ার অভ্যাস আজকাল মানুষের মধ্যে অতি বিরল। কোন বিষয়ে সন্দেহ জন্মিলে অধিকাংশ লোকই নিজের বিবেকানুযায়ী উহার কোন না কোন এক অর্থ আবিষ্কার করিয়া লয়। ইহার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আকীদা নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতে এরূপ ধারণা করার কোন কারণ নাই যে, তবে তো সাধারণ মানুষের জন্য কোরআন শরীফ দ্বারা উপকৃত হওয়ার কোনই উপায় রহিল না। ইহার একটি উত্তর আমি ইতিপূর্বে দিয়াছি যে, কোরআনের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সহজ বিষয়-বস্তু সম্বলিত যেসমস্ত কিতাব লিখিত হইয়াছে, তাহা গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করা। আর যেসমস্ত বিজ্ঞ আলেম নিজেদের ওয়াযে কোরআনের বিষয়বস্তু ও সঠিক আহ্‌কামসমূহ বয়ান করিয়া থাকেন, মনোযোগ সহকারে তাহা শ্রবণ করা সাধারণ লোকের পক্ষে কোরআনের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার একটি সহজ উপায়। এতদ্ব্যতীত শুধু তরজমা দ্বারা উপকার লাভেরও একটি পন্থা আছে। তাহা এই যে, অধুনা জগতে দুই শ্রেণীর লোক রহিয়াছে। এক শ্রেণীর লোক এল্‌ম শিখিবার জন্য যথেষ্ট অবসর পাইয়া থাকে। তাহাদের উচিত আল্লাহ্‌র নাম লইয়া পরিশ্রমের সহিত ঐসমস্ত শাস্ত্রগুলি শিক্ষা করা, যাহা ব্যতীত কোরআন শরীফের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নহে। অতঃপর তরজমা পাঠ করা।

আর এক শ্রেণীর লোক এতখানি অবসর পায় না। তাহাদের উচিত, প্রথমতঃ কোন নির্ভর-যোগ্য আলেমকে জিজ্ঞাসা করা যে, কোরআন শরীফের কোন্ তরজমা বা কাহার কৃত তরজমা অধিকতর ছহীহ্ এবং গ্রহণযোগ্য। নিজে নিজে কিছু স্থির করা উচিত নহে। অধুনা লোকে কোরআন অনুবাদের এক মাপকাঠি নিজেরাই স্থির করিয়া লইয়াছে, তাহাদের এই মাপকাঠি যে ভুল তাহা আমি এখনই প্রমাণ করিয়া দিতেছি।

কোরআনের খাঁটি তরজমা*ঃ হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল কাদের (রঃ) এবং হযরত মাওলানা শাহ্ রফীউদ্দীন (রঃ) কৃত কোরআনের তরজমা টাঁকশালী অর্থাৎ, খাঁটি তরজমা, একেবারে বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। অবশ্য ভাষার পরিবর্তনের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পারিভাষিক নীতি বিবর্জিত হওয়ার ফলে উক্ত তরজমা দুইটি উর্দু ভাষার দিক দিয়া খুব উচ্চমানের না হইলেও

টীকা

* বাংলাভাষায় তফ্‌সীরে আশ্‌রাফী এবং মাওলানা আলী হাসান ও আবদুল হাকিমের তফ্‌সীর প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

কোরআনের ব্যাখ্যা হিসাবে যে উচ্চ মর্যাদা এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে, অপর কাহারও তরজমা তাহা করিতে সক্ষম হয় নাই। ইহা তাঁহাদের 'খুলুছ' বা নেক নিয়তের ফল বৈ আর কিছুই নহে। আজকাল ভাষার চাকচিক্য এবং বর্ণনা-চাতুর্যকেই মানুষ উত্তম অনুবাদের মাপকাঠিরূপে নির্ধারণ করিয়া লইয়াছে।

ভ্রাতৃগণ! ভাবিয়া দেখুন, কোন শহরে দুই জন চিকিৎসক আছেন। একজন চিকিৎসাশাস্ত্রে তথা রোগ নির্ণয়ে ও ঔষধ নির্বাচনে অতিশয় পারদর্শী, কিন্তু ভাষায় দুর্বল। অপর চিকিৎসক ভাষায় সুপণ্ডিত, কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রে বিচক্ষণ ও দক্ষ নহেন। বিচার করিয়া বলুন, আপনারা ইহাদের মধ্যে কাহার ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করিবেন? বলাবাহুল্য, বিচক্ষণ চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রই প্রত্যেক চিকিৎসাকামী রোগী গ্রহণ করিবে। চিকিৎসাশাস্ত্রে অপারদর্শী ভাষাবিদ চিকিৎসকের আলঙ্কারিক ভাষার ব্যবস্থাপত্র কেহই গ্রহণ করিবে না। কেননা, রোগমুক্ত হওয়াই রোগীর উদ্দেশ্য। ভাষার চাতুর্য ও চাকচিক্যে তাহার কোন প্রয়োজন নাই।

বন্ধুগণ! আমরা যদি কোরআন শরীফকে আমাদের 'রূহানী' রোগের চিকিৎসা গ্রন্থ মনে করিতাম, তবে উহার তরজমা নির্বাচনের বেলায় এই চিন্তাই করিতাম যে, কোন্ তরজমাটি তফসীর-শাস্ত্রে বিচক্ষণ সুবিজ্ঞ আলেম কর্তৃক কৃত, যাহাকে নির্ভরযোগ্য মনে করিয়া নিঃসন্দেহে তদনুযায়ী আমল করা যাইতে পারে। আর কোন্ তরজমাটি ভাষার দিক দিয়া অতি মনোরম এবং চাকচিক্য-ময় হইলেও বিজ্ঞ আলেমের কৃত নহে বলিয়া নির্ভরযোগ্যও নহে, তদনুযায়ী আমলও করা যাইতে পারে না। যখন আমল করা উদ্দেশ্য, তখন শুধু ভাষার প্রাঞ্জল্যে ও মাধুর্যে কি কাজ দিবে? কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, কোরআন পাককে আমরা গল্প-গ্রন্থের ন্যায় মনে করিয়া থাকি। এই কারণেই আমাদের নিকট ভাষার চাকচিক্যের আদর। যদি আমলই উদ্দেশ্য হইত, তবে ভাষার চাকচিক্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিতাম। যদি ভাষার প্রাঞ্জল্য এবং বর্ণনা-চাতুর্যের প্রতিই আগ্রহ হইয়া থাকে, তবে কোরআনের তরজমা কেন? "চার দরবেশের কাহিনী" নামক রূপক গ্রন্থ পড়াই শ্রেয়। এখন কোরআনের তরজমা লইয়া অযথা টানাটানি করায় লাভ কি? বলিতে কি, আজকাল সাধারণ মানুষের যে রুচি হইয়া গিয়াছে, তদনুযায়ী কোরআনের তরজমা নির্বাচন করা ঠিক নহে। সঠিক মাপকাঠি হইল যাহা আমি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বিচক্ষণ এবং শ্রেষ্ঠ অনুবাদকের অনুবাদই গ্রহণযোগ্য। শুধু তরজমা পড়াই যথেষ্ট হইবে না, তাহা আবার সুবিজ্ঞ আলেমের নিকট সবকে সবকে পড়িয়া ভালরূপে কোরআনের মর্মার্থ বুঝিয়া লইতে হইবে।

কোরআনের তরজমা বুঝিবার জন্য কেবল সাহিত্যিক (আরবী বা উর্দু সাহিত্যে সুপণ্ডিত) হওয়া যথেষ্ট নহে। অধুনা মানুষের মধ্যে প্রধান দোষ এই যে, যে ব্যক্তি আরবী ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারে কিংবা প্রবন্ধাদি লিখিতে পারে, তাহাকেই সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে এবং মনে করে যে, ইনি একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং অতিশয় উপযুক্ত লোক। কিন্তু কেহই একথা মনে করে না যে, কোরআনের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করার জন্য কেবল সাহিত্যবিশারদ অর্থাৎ, ভাষায় সুপণ্ডিত হওয়াই যথেষ্ট নহে। বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে বুঝিবার জন্য আমি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছি। মনে করুন, যদি অপনি কোন কবির নিকট একটি আইন গ্রন্থ পড়েন—যিনি আইনশাস্ত্রে আদৌ জ্ঞানী নহেন। আবার তাহা অপর একজন আইনশাস্ত্র বিশারদ আইনজীবীর নিকট লইয়া যান, যিনি আইনশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত, কিন্তু ভাষাজ্ঞান তাঁহার তত নাই। এখন যদি উক্ত আইন গ্রন্থের স্থান-বিশেষে কোন আইন সম্বন্ধে এই দুই ব্যক্তির মধ্যে মতভেদ ঘটে; ভাষাবিদ একরূপ অর্থ করেন

এবং ভাষাজ্ঞান বিবর্জিত আইনজ্ঞ ব্যক্তি অন্যরূপ অর্থ বলেন, এখন আমি যুগের জ্ঞানী লোক-দের জিজ্ঞাসা করি, এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহারা কি আইনজ্ঞ ব্যক্তির মত গ্রহণ করিবেন, না ভাষাবিদ ব্যক্তির মতকে গ্রহণীয় মনে করিবেন ? বলাবাহুল্য, এমতাবস্থায় জ্ঞানীমাত্রেই আইনজ্ঞ লোকটির মতকেই প্রাধান্য প্রদান করিবেন। আইন-শাস্ত্র বিশারদ উকিলের সম্মুখে আইনের ব্যাপারে সাহিত্য -বিশারদ কবির মতের কানাকড়িও মূল্য হইবে না। ভাষায় সুপণ্ডিত হইলেই কোন নির্দিষ্ট শাস্ত্র তাহার জন্য সহজ হয় না। নির্দিষ্ট শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান লাভ করিতে হইলে কঠোর সাধনার সহিত তাহা অধ্যয়ন করিতে হয়।

ওস্তাদের প্রয়োজনীয়তা ঃ সুতরাং কোরআন শরীফের তরজমা শিখিবার জন্য এল্‌মে শরীঅত -এর একজন সুবিজ্ঞ আলেমকে ওস্তাদরূপে গ্রহণ করিতে হইবে এবং পূর্ণ কোরআনের তরজমা তাঁহার নিকট হইতে বুঝিয়া লইতে হইবে। কোন মুসলমান কখনও এমন ধারণা যেন মনে স্থান না দেন যে, কোরআনের তরজমা যখন উর্দু (ও বাংলা) ভাষায় হইয়া গিয়াছে, তখন আর ওস্তাদের নিকট পড়িতে হইবে কেন ? উর্দু (বাংলা) তো আমাদের নিজেদেরই ভাষা। বন্ধুগণ ? তরজমার সাহায্যে কেবল বাক্যগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বাক্যের আভিধানিক অর্থ জানা যায়। কোরআন শরীফ তো কেবল 'মকামাতে হারিরী' (আরবী সাহিত্য পুস্তক) নহে যে, ভাষাগত অর্থ জানা-ই উহার অন্তর্নিহিত বিষয় বুঝিবার জন্য যথেষ্ট হইবে। কোরআন শরীফে এল্‌মে আকায়েদ, তায্‌কিয়ায়ে আখ্‌লাক (চরিত্র গঠন), ফেকাহ্‌ প্রভৃতি নানাবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান রহি-য়াছে। তরজমা পড়িবার সময় যতক্ষণ পর্যন্ত ঐসমস্ত বিষয় বুঝাইয়া না দেওয়া হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত শুধু তরজমা পড়িয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নহে। যে ব্যক্তি উক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানও রাখে না এবং কোন সুবিজ্ঞ আলেমের নিকট তাহা পড়েও নাই, সে ব্যক্তি যদি কোরআন শরীফের শুধু তরজমা পড়িতে থাকে, তবে সে কুখ্যাত মুরজিয়াহ্‌ বা ক্বাদরিয়াহ্‌ সম্প্রদায়ের মতাবলম্বী হইয়া পড়ার আশঙ্কা রহিয়াছে।*

কেননা, প্রত্যেক বিষয় বা শাস্ত্রের জন্য বিশিষ্ট পরিভাষা রহিয়াছে। কোন ওস্তাদের সাহায্য ব্যতীত শুধু তরজমা পড়িয়া তাহা আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। যাহারা কোরআনের শুধু তরজমা পাঠ করে, তাহারা কোরআনের মর্ম ঠিক সেইরূপই বুঝিয়া থাকে। যেমন, কোন এক ব্যক্তি 'গুলেস্তাঁ' কিতাবের নিম্নোক্ত কবিতাটির অর্থ বুঝিয়াছিল ঃ

دوست آں باشد كه گيرد دست دوست ـ در پريشـــاں حـالى ودر مـانـدگى

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বিপদ-আপদে বন্ধুর হস্ত ধারণ (সাহায্য) করে সে ব্যক্তিই প্রকৃত বন্ধু। লোকটি কবিতাটির অনুবাদ নিজে নিজে পাঠ করিয়া উহার মর্ম এইরূপ বুঝিয়াছিল যে, "বিপদ-আপদে বন্ধুর হাত ধরিলে প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় দেওয়া হয়।" ঘটনাক্রমে একদিন সে দেখিতে পাইল, জনৈক ব্যক্তি তাহার কোন এক বন্ধুকে বেদম প্রহার করিতেছে। সে দৌড়াইয়া গিয়া বন্ধুর দুই হাত সজোরে ধরিয়া রাখিল। ইহাতে প্রহারকারী আরও সুযোগ পাইল এবং বেচারীকে ভীষণ-

টীকা

* যাহাদের বিশ্বাস এই যে, মানুষের যাবতীয় কার্যের কর্তা আল্লাহ্‌ তা'আলা। মানুষের তাহাতে কোনই অধিকার নাই, তাহাদিগকে 'মুরজিয়াহ্‌' বলে। আর যাহারা এরূপ বিশ্বাস করে যে, মানুষ তাহার যাবতীয় কার্য নিজ ইচ্ছা এবং ক্ষমতাবলেই করিয়া থাকে, আল্লাহ্‌ তা'আলার তাহাতে কোন হাত নাই; তাহাদিগকে 'ক্বাদরিয়াহ্‌' বলে।

ভাবে প্রহার করিল। এই অভাবনীয় কাণ্ড দেখিয়া প্রহৃত বন্ধু তাহার প্রতি অতিশয় রাগান্বিত হইল এবং বলিলঃ বন্ধু হিসাবে আমার এই বিপদে তোমার কর্তব্য ছিল আমাকে সাহায্য করা। কোথায় তুমি আমাকে সাহায্য করিবে, তাহা না করিয়া বরং উল্টা আমার হাত ধরিয়া রাখিয়া আমার আত্মরক্ষার পথও বন্ধ করিয়া দিলে। বন্ধুর রাগ দেখিয়া লোকটি বিস্মিত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলঃ আমি তো শেখ সা'দীর উক্তির মর্মানুযায়ীই বন্ধুত্বের হক্ আদায় করিয়াছি। এই ব্যক্তি আমার প্রতি রাগান্বিত হইতেছে কেন? সে প্রকাশ্যে বন্ধুকে বলিলঃ বন্ধু, আমি তো শেখ সা'দীর কবিতার মর্মানুযায়ী বন্ধুত্বের হক আদায় করিতে কিছুমাত্র ক্রটি করি নাই। শেখ সা'দী 'গুলেস্তাঁ' কিতাবে যাহা বলিয়াছেন, আমি তো শুধু তাহাই করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেনঃ

دوست آں باشد کہ گیرد دست دوست

বন্ধুগণ! লোকটি কবিতাটির শাব্দিক অনুবাদে কোন ভুল করে নাই। তাহার ক্রটি শুধু এই ছিল যে, কোন ভাষাবিদ ওস্তাদের নিকট হইতে তরজমাটির ভাবার্থ বুঝিয়া লয় নাই। শুধু নিজে তরজমা পড়িয়া শাব্দিক অর্থ বুঝিয়া লইয়াছিল। সুতরাং ভাবিয়া দেখুন, 'গুলেস্তাঁর' ন্যায় মানব রচিত একটি সামান্য কিতাবের প্রকৃত মর্ম যখন ওস্তাদের নিকট না পড়িলে নিজে নিজে অনুবাদ পড়িয়া অনেক সময় পণ্ডিত ব্যক্তিও ভুল করিয়া বসে, তখন নিজে নিজে শুধু তরজমা পাঠ করা কেমন করিয়া যথেষ্ট হইতে পারে? তাহাতে ভুল হওয়া অসম্ভব কি? এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কোরআন-এর তরজমাও যখন ওস্তাদের নিকট না পড়িয়া হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয় না, তখন তরজমা করারই প্রয়োজন কি ছিল? ইহাতে লাভ কি হইয়াছে? উত্তরে বলা যায়, তরজমা না হইলে কোরআন শরীফ বুঝিবার জন্য প্রথমতঃ ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র প্রভৃতি প্রাথমিক শাস্ত্রগুলি আয়ত্ত করিয়া আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিতে হইত। ইহাতে দীর্ঘকালব্যাপিয়া পরিশ্রম ও সাবধানতা প্রয়োজন ছিল। তরজমা হওয়াতে এতটুকু সুবিধা হইয়াছে যে, ভাষায় দক্ষতা অর্জনে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত না করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে ওস্তাদের নিকট হইতে কোরআনের বিষয়গুলি শিখিয়া লওয়া যায়। ইহা নিতান্ত সামান্য লাভ নহে। কোরআনের তরজমা-কারী আলেমগণ এরূপ উদ্দেশ্য লইয়া কখনও তরজমা করেন নাই যে, ওস্তাদের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া কেহ তরজমা দ্বারাই কোরআনের সারমর্ম বুঝিতে সক্ষম হইবে।

বন্ধুগণ! পার্থিব কাজ-কর্মের প্রতি একবার লক্ষ্য করুন, সামান্য সামান্য কাজগুলিও ওস্তাদের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ ব্যতীত কেহই নিজে নিজে আয়ত্ত করিতে পারে না। এমন কি, কাঠ মিস্ত্রীর কাজ যদি কেহ ওস্তাদ ব্যতীত নিজে নিজে শিখিতে আরম্ভ করে, তবে সে নিশ্চয়ই নিজের হাত-পা কাটিয়া ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিবে। অথচ প্রত্যেক মানুষ নিজের জীবনে বহু কাঠমিস্ত্রী-কে আসবাবপত্র নির্মাণ করিতে দেখিয়াছে। কিন্তু এক্ষেত্রে কেহ এরূপ বলে না যে, "আমি কাঠ মিস্ত্রীকে আসবাবপত্র প্রস্তুত করিতে দেখিয়াছি এবং কাজের প্রণালী শিখিয়া ফেলিয়াছি। সুতরাং শিক্ষা গ্রহণ না করিয়াই আমি মিস্ত্রীর কাজ করিতে পারিব।" পার্থিব এই সমস্ত কাজ-কর্মে সকল লোকের ঐক্যমত এই যে, যথারীতি ওস্তাদের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করা ব্যতীত কাজকর্মে পারদর্শিতালাভের জন্য শুধু প্রণালী দেখিয়া লওয়া যথেষ্ট নহে।

নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, পবিত্র কোরআন শরীফকে এমনই সাধারণ 'কালামের' স্তরে স্থান দেওয়া হইতেছে যে, কোন ওস্তাদের সাহায্য ব্যতীত নিজে নিজে ইহার তরজমা পড়িয়া লওয়াকেই যথেষ্ট মনে করা হইতেছে।

বন্ধুগণ! আপনারা শুনিয়া বিস্ময় বোধ করিবেন যে, আমার বর্তমান বয়স পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক। ইতিমধ্যে আমাকে বহু লেখাপড়ার কাজ করিতে হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাবধি আমি কলম কাটিতে জানি না। কেননা, কলম কাটা আমি কোনদিন কাহারও নিকট হইতে শিখিয়া লই নাই। এমনি বাঁকা-টেড়াভাবে কাটিয়া কোনরূপে কাজ চালাইয়া থাকি। যখন এমন একটা ক্ষুদ্রতম কাজ ওস্তাদ ব্যতীত শিক্ষা করা যায় না, তখন ওস্তাদ বিহনে কোরআন শরীফের ন্যায় এমন একটা মহা আসমানী কিতাব শিখিয়া ফেলার দাবী নিতান্ত বাতুলতা ছাড়া আর কি হইতে পারে? যাঁহারা এমন অর্থহীন দাবী করিয়া থাকেন, তাঁহারা আমার উপরোক্ত মন্তব্যের সার্থকতা এইরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন যে, প্রথমে একবার সমস্ত কোরআনের তরজমা নিজে নিজে পাঠ করুন। অতঃপর তাহা আবার বিজ্ঞ আলেমের নিকট পড়িতে আরম্ভ করুন। ইন্‌শাআল্লাহ্, ওস্তাদের অধ্যাপনা শ্রবণ করিয়া তিনি নিজেই নিজেকে অজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিবেন। আর ইহাও বুঝিতে পারিবেন যে, কেবল মেধাবী হইলেই চলে না।

তাই আমি বলিতেছিলাম—কোরআনের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করার জন্য প্রত্যেকটি মানুষের বিজ্ঞ আলেম হওয়া জরুরী নহে; বরং কোরআনের মর্মার্থ বুঝিবার জন্য অনেক সহজ পন্থাও রহিয়াছে, যাহা বিজ্ঞ আলেম হওয়া ছাড়াও লাভ হইতে পারে। কিন্তু আমার উপরোক্ত কথা হইতে কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, তরজমা পাঠ করা ভিন্ন যখন কেহই কোরআনের বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, তখন নিছক তেলাওয়াতে কোরআনে কোনই ফায়দা নাই। আসল কথা এই যে, ঐ কাজকেই অনর্থক ও বেকার বলা যায়, যাহাতে কোন উপকারিতা নাই। অথচ কোরআন তেলাওয়াতে যথেষ্ট উপকার আছে।

কোরআন তেলাওয়াতের উপকারিতাঃ কোরআন তেলাওয়াতে বহুবিধ উপকারিতা রহিয়াছে। প্রথম উপকারিতা কোরআন শরীফ বুঝিয়া তেলাওয়াত করিয়া তদনুযায়ী আমল করা। দ্বিতীয় উপকারিতা তেলাওয়াতের সওয়াব হাসিল করা। সুতরাং না বুঝিয়া তেলাওয়াতে কোন উপকারিতা নাই তখনই বলা যাইতে পারে, যখন কোরআন পাঠে কোন সওয়াবলাভ না হয়। না বুঝিয়া তেলাওয়াত করিলে সাওয়াব পাওয়া যাইবে কিনা তাহা হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে অনুসন্ধান করুন। তিনি বলিয়াছেনঃ "কোরআন তেলাওয়াতকারী প্রত্যেকটি হরফের বিনিময়ে ১০টি নেকী লাভ করিয়া থাকে। আমি বলিতেছি না যে, الٓمٓ একটি হরফ; বরং الف 'আলিফ' একটি হরফ, لام 'লাম্' একটি হরফ এবং ميم 'মীম' একটি হরফ, অর্থাৎ, الٓمٓ শব্দে তিনটি হরফ রহিয়াছে। কাজেই এই শব্দটি তেলাওয়াত করিলে মোট ৩০টি নেকী পাওয়া যাইবে। কোন কোন আলেম বলিয়াছেনঃ এস্থলে হুযূর (দঃ)-এর উদ্দেশ্য এই যে, الٓمٓ শব্দ লিখিতে যে তিনটি হরফ الف, لام, ميم রহিয়াছে, উহাদের প্রত্যেকটিতে তিনটি করিয়া হরফ আছে সুতরাং এই শব্দে সর্বমোট নয়টি হরফ হয়। প্রত্যেক হরফে ১০টি নেকী পাওয়া যাইবে, এই হিসাবে الٓمٓ শব্দটি কেহ পাঠ করিলে তাহার আ'মলনামায় মোট নব্বইটি নেকী লিখিত হইবে। হুযূর (দঃ) প্রত্যেক হরফের নামের প্রথম অক্ষরটির উল্লেখ করিয়া অবশিষ্ট ছয়টি অক্ষর ধারণার উপর ত্যাগ করিয়াছেন। অবশ্য কোরআনের মর্ম অনুধাবনপূর্বক পাঠ করার অসংখ্য সওয়াবের তুলনায় ইহা অতি সামান্য। তথাপি ভাবিয়া দেখুন, না বুঝিয়া কোরআনের একটি শব্দ তেলাওয়াত করিলেও নব্বইটি নেকী পাওয়া গেল। অথচ আমাদের খরচ হইল না কিছুই। এই নেকী الٓمٓ বা এই জাতীয় 'হরূফে মুকাততাআত' (অর্থাৎ, কতিপয় সূরার প্রথমে পৃথক

পৃথক উচ্চারিত হরফগুলি)-এর সহিত নির্দিষ্ট নহে। হুযূর (দঃ) الٓمٓ শব্দটি কেবল একটি দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। কোরআন শরীফের প্রত্যেকটি শব্দের সওয়াবই এইরূপ। আমরা সূরা-ফাতেহা পড়িতে আরম্ভ করিয়া الحمد শব্দটি উচ্চারণ করিবামাত্র ইহার ৫টি হরফের বিনিময়ে আমাদের আমলনামায় ৫০টি নেকী লিখিত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, আমরা এই সওয়াব পাওয়াকে কোন লাভ বলিয়া মনে করি না। অবশ্য মৃত্যুর পরে আমরা ইহার মূল্য বুঝিতে পারিব। কিন্তু তখন বুঝিলেও কোন উপকারে আসিবে না।

ইহার অনুরূপ একটি দৃষ্টান্ত শ্রবণ করুন, দুই জন লোক মক্কা শরীফ গমনের অভিলাষ করিয়াছে এবং ইহা জানা কথা যে, মক্কা শরীফে তাম্র মুদ্রা অচল। অতএব, তাহাদের একজন নিজ তহ-বিলের তাম্র মুদ্রাগুলির বিনিময়ে তথাকার প্রচলিত রৌপ্য মুদ্রা খরিদ করিয়া লইল। মক্কার অবস্থা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ অপর লোকটি জানে না যে, মক্কা শরীফে কিরূপ মুদ্রার প্রয়োজন। কাজেই সঙ্গীর মুদ্রা পরিবর্তনের ব্যাপার দেখিয়া সে হাসিতে লাগিল এবং তাহাকে বোকা মনে করিয়া বলিতে লাগিলঃ "তাম্র মুদ্রা যখন এদেশে চলে তখন উহা মক্কা শরীফেও চলিবে"। সে শুধু তাম্র মুদ্রাই টেঁকে বাঁধিয়া সফরে যাত্রা করিল। মক্কা হইতে প্রত্যাগত এবং তথাকার অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ একজন তৃতীয় ব্যক্তি ইহাদের কাণ্ড দেখিয়া নিশ্চয়ই এরূপ মন্তব্য করিবে যে, প্রথম ব্যক্তি আদৌ বোকা নহে; সে বুদ্ধিমান। দ্বিতীয় ব্যক্তিই বোকা। সে যে দেশে যাত্রা করিয়াছে তথাকার নিয়ম-প্রণালী কিরূপ, সে তাহার কিছুই জানে না। তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া যাত্রীদ্বয় মক্কা শরীফ যাইয়া পৌঁছিল। এখন ইহাদের অবস্থার তারতম্য ও প্রভেদ দেখা যাইতে লাগিল। যে ব্যক্তি মক্কার প্রচলিত মুদ্রা সঙ্গে আনিয়াছে, সে ব্যক্তি প্রত্যেক দোকানে যায় এবং নির্বিঘ্নে প্রত্যেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য খরিদ করিয়া লইয়া আসে। আর যাহার টেঁকে কেবল তাম্র মুদ্রা, সে ঐ অচল মুদ্রার বিনিময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খরিদ করিতে না পারিয়া অপরের মুখের পানে তাকাইয়া থাকে এবং নিজের বোকামির জন্য ক্রন্দন ও পরিতাপ করিতে থাকে, "হায়! যাত্রাকালে বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শে কর্ণপাত করি নাই। এখন সত্যই দেখিতেছি, এই তাম্র মুদ্রা এখানে সম্পূর্ণ অকেজো। আমি এখন খাদ্যদ্রব্য কেমন করিয়া ক্রয় করিব? পানি কিসের দ্বারা খরিদ করিব? এখানে আমার দিনগুলি কিরূপে অতিবাহিত হইবে?"

অনুরূপভাবে ইহজগতে আমরা যে নেকী অর্জন করিয়া থাকি, ইহার মূল্য আমরা আখেরাতে যাইয়া বুঝিতে পারিব। কেননা, এই নেকীই হইবে আখেরাতের চলতি মুদ্রা। সেখানে আপনাদের এ সমস্ত তাম্র ও রৌপ্য মুদ্রা কোন কাজেই আসিবে না। সকলকেই পরজগতে যাইতে হইবে, কোন মুসলমানেরই এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। যখন কিয়ামতের বাজার বসিবে, সেখানেও দুই প্রকারের লোক থাকিবে। এক প্রকারের লোক তথাকার চলতি মুদ্রা অর্থাৎ, নেকী থলি বোঝাই করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইবে, তাহারা নির্বিঘ্নে সর্বপ্রকারের সুখ-শান্তি উপভোগ করিতে থাকিবে। আর এক প্রকারের লোক, যাহারা নিজেদের অসতর্কতা ও অনভিজ্ঞতার দরুন ইহজীবনে পরলোকের কথা ভুলিয়া রহিয়াছিল এবং এই কারণে পরকালের সম্বলস্বরূপ কোন নেকী সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে নাই। তাহাদের অবস্থা হইবে এইরূপ—

که بازار چندانکه آگنده تر ـ تهی دست را دل پراگنده تر

"বাজারের দোকানসমূহে যত অধিক পরিমাণে পণ্য-দ্রব্যাদি সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত থাকিবে, উহা দেখিয়া রিক্তহস্ত নিঃস্ব ব্যক্তির হৃদয় তত অধিক পরিমাণে অনুতপ্ত ও দুঃখিত হইবে। সেদিন

আপনারা ঐসমস্ত লোককে সম্মানের চক্ষে দেখিবেন, যাহাদের সম্বন্ধে আজ এক শ্রেণীর লোক ব্যঙ্গোক্তি করিয়া বলেঃ "মোল্লা-মৌলবীর দল এই নিরীহ লোকদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে।" আর আজ নূতন যুগের আলোচ্ছটায় বিমোহিত লোকেরা যেসমস্ত ধর্মভীরু লোককে আহ্মক মনে করিয়া থাকে, তাঁহারাই পরলোকে জ্ঞানী বলিয়া প্রতিপাদিত এবং উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হইবেন। তাঁহাদের সফলতা ও উচ্চ মর্যাদা দেখিয়া সেই ব্যঙ্গোক্তিকারীদের তাক লাগিয়া যাইবে এবং বলিতে থাকিবে; "হায়! পৃথিবীতে যাঁহাদিগকে আমরা নিতান্ত হীন ও নীচ মনে করিতাম, আজ দেখিতেছি তাঁহারাই তো জাঁকজমকের অধিকারী। পক্ষান্তরে আমরা আজ তাঁহাদের সম্মুখে হীন ও অপদস্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি।

আমলের গুরুত্বঃ বন্ধুগণ! শেষ বিচারের দিনে নেক আমল ছাড়া আর কোনকিছুই কাজে আসিবে না। এমন ভরসা কখনও মনে স্থান দিবেন না যে, আমার পিতা-মাতা অতিশয় নেক্কার ছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে আমরাও ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া নিব। (পরলোকে তাহারা নিশ্চয়ই আমাদের কিছু না কিছু সাহায্য করিতে পারিবেন।) বস্তুত পরলোকে কেহ কাহারও কোন কাজে অসিবে না।

হাদীস শরীফে একটি ঘটনা বর্ণিত আছেঃ শেষ বিচারের দিন এক ব্যক্তির পাপ-পুণ্যের পরিমাণ সমান হইবে। সেদিনের বিচার-প্রণালী হইল, যাহার নেকীর পরিমাণ অধিক সে বেহেশ্‌তী, যাহার পাপের পরিমাণ বেশী সে দোযখী। আর যে ব্যক্তির পাপ-পুণ্যের পরিমাণ সমান সমান, তাহাকে কিছুদিন বেহেশ্‌ত এবং দোযখের মধ্যবর্তী আরাফ নামক স্থানে রাখা হইবে। এই প্রণালী অনুসারে তাহাকে বলা হইবে, "তুমি কাহারও নিকট হইতে একটিমাত্র নেকী সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারিলে বেহেশ্‌তে যাইতে পার। ইহাতে সে আনন্দিত হইয়া মনে মনে বলিবে, আমার পিতা-মাতা ও স্ত্রী-পুত্র রহিয়াছে এবং বহু আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব রহিয়াছে। এত হিতকাঙ্ক্ষী আপনজনের নিকট হইতে একটিমাত্র নেকী প্রাপ্ত হওয়া এমন কি কঠিন হইবে? তৎক্ষণাৎ সে নেকীর তালাশে গমন করিবে। পিতার নিকট যাইয়া নিজের অবস্থা ব্যক্ত করিয়া বলিবেঃ বাবা! আমি একটিমাত্র নেকীর জন্য বেহেশ্‌তে যাইতে পারিতেছি না। আপনি আমার জন্মদাতা পিতা; আমার এই সঙ্কটাবস্থার প্রতি সদয় হইয়া আমাকে একটি নেকী দান করুন। তিনি পরিষ্কার জবাব দিবেন যে, এখানে আমার নিজের জীবন নিয়া নিজেই অস্থির, তোমাকে কেমন করিয়া নেকী দান করিব? মাতা, অর্ধাঙ্গিনী স্ত্রী, কলিজার টুক্‌রা সন্তান-সন্ততি এবং বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতেও একই জবাব পাইবে। পরিশেষে নিরাশ হইয়া ফিরিবার পথে এক হৃদয়বান দানশীল ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তাহার আমলনামায় একটিমাত্র নেকী থাকিবে। আগন্তুক লোকটিকে পেরেশান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, ব্যাপার কি? এত বিষণ্ণ হইয়াছ কেন? সে জবাব দিবে, "আমার দুঃখের প্রতিকার সম্ভব হইলে প্রকাশ করিতাম; কিন্তু ইহার প্রতিকার কাহারও দ্বারা সম্ভব হইবে না। প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় অস্থির। অতএব, আমার দুঃখের কথা প্রকাশ করিয়া কি লাভ হইবে? মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবই যখন নিরাশ করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে, তখন তুমি আমার দুঃখের কি প্রতিকার করিবে?" সে বলিবে, "একবার বল না শুনি, হয়তো আমার দ্বারা কোন উপকার হইতেও পারে।" বহু কথাবার্তার পর অবশেষে লোকটি তাহার অবস্থা বর্ণনা করিবে, "আমি শুধু একটিমাত্র নেকীর মুখাপেক্ষী।" দাতা ব্যক্তি জবাব দিবে, আমার তহবিলে মোটে একটিমাত্র নেকীই আছে। উহা আমার কোনই কাজে আসিবে না। কেননা, আমার পাপের

পরিমাণ অনেক বেশী, আমার তো দোযখে যাইতেই হইবে। এই একটি নেকী থাকিলেই কি, আর না থাকিলেই কি? এই নেকী তুমি লইয়া যাও, তোমার নাজাত হউক। লোকটি বিস্মিত হইয়া মনে মনে বলিবে, ইয়া আল্লাহ্? ইনি কেমন আশ্চর্য দানশীল, এমন নির্ভীকভাবে নিজের নেকী অপরকে বিলাইয়া দিলেন। বন্ধুগণ! সেই মহাবিচারের দিনে ইহলোকের হৃদয়বান দাতাগণই মানুষের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রকাশ করিবেন। তখন মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন কোনই উপকারে আসিবে না। পরিশেষে লোকটি তাঁহার নিকট হইতে সেই একটিমাত্র নেকী লইয়া আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে পেশ করিবে। ফলে তাহার নেকীর পরিমাণ অধিক হইবে এবং পূর্বোক্ত বিচার -প্রণালী অনুযায়ী তাহাকে নাজাত দেওয়া হইবে।

অতঃপর সেই দানশীল ব্যক্তিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুই ইহা কি করিলে? নিজের নেকী অপরকে দিয়া ফেলিলে? তোর কি নিজের পরিত্রাণের চিন্তা নাই? সে ব্যক্তি আরয করিবেঃ ইয়া আল্লাহ্! আমার একটিমাত্র নেকী ছিল। এমতাবস্থায় বিচার-প্রণালী অনুসারে আমার ভাগ্যে দোযখ অনিবার্য, এই একটিমাত্র নেকী আমার কোন উপকারে আসিবে না। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমার এত পাপ সত্ত্বেও দয়া করিয়া আমাকে মাফ করিয়া দেন তাহা স্বতন্ত্র কথা।

কিন্তু আমার পরিত্রাণ যখন শুধু আল্লাহ্ তা'আলার দয়ার উপর নির্ভরশীল। আমার আমলের বিনিময়ে আমি ক্ষমা বা পরিত্রাণ পাওয়ার উপযুক্ত নই, তবে এই বেচারাকে নিরাশ করি কেন? অতএব, আমি আমার নেকীটি এই মুসলমান ভাইকে দান করিয়াছি। ইহাতে সে নাজাত পাইবে। আমার ব্যাপার আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহের উপর ন্যস্ত করিলাম। ফলে সেই লোকটি উক্ত দানের কারণে মুক্তি পাইবে। বন্ধুগণ! সেই মহাবিচারকের দরবার বড়ই বৈচিত্র্যময়। সেখানে অতি সামান্য সামান্য কথায় পরিত্রাণ লাভ হয়।

হাদীস শরীফে আরও এক ব্যক্তির ঘটনা এইরূপ উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তির আমলনামায় কোনই নেকী ছিল না। কেবলমাত্র একদিন লোক চলাচলের রাস্তা হইতে কাঁটা সরাইয়া দিয়াছিল। বলাবাহুল্য, ইহা অতি সামান্য কাজ, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে এই তুচ্ছ কার্যটিরও মূল্য হইল এবং ইহার বদৌলতে তাহাকে ক্ষমা করিয়া বেহেশ্‌ত দেওয়া হইল।

বন্ধুগণ! নেকীর কাজ যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, কখনও তুচ্ছ এবং সামান্য মনে করিবেন না। কোন কোন সময় অতি সামান্য আমলও কবূল হইয়া যায়, আবার যেসমস্ত বড় বড় কাজ করিয়া মানুষ মনে মনে গর্ব অনুভব করে, তাহা প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকে।

এক বুযুর্গ লোকের ঘটনা—তাঁহার এন্তেকালের পর অপর একজন বুযুর্গ লোক কাশ্‌ফের সাহায্যে অথবা স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন যে, উক্ত পরলোকগত বুযুর্গ ব্যক্তির সওয়াল-জবাব হইতেছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "আমার জন্য কি আমল সঙ্গে আনিয়াছ?" তিনি উত্তর করিলেন, "আর তো কোন আমল আনিতে পারি নাই, কেবল 'তাওহীদ লইয়া আসিয়াছি"। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেনঃ "তুমি মিথ্যাবাদী, তোমার তাওহীদও ঠিক নহে, দুধের রাত্রি স্মরণ করিয়া দেখ।" দুধের রাত্রির ব্যাপার এই ছিল যে, এক রাত্রিতে দুগ্ধ পান করিয়া তাঁহার পেটে ব্যথা হইয়াছিল। তখন তিনি কাহারও নিকট বলিয়াছিলেন যে, দুগ্ধ হইতে পেট বেদনার উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব, আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে শুধাইয়া বলিলেন, তুমি দুগ্ধকেই ক্রিয়াকারক বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছ। অথচ যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের কারক আমি। ইহা কিরূপ তাওহীদ? যখন তাঁহার মূলবস্তু তাওহীদই ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তখন বুযুর্গ লোকটি অত্যন্ত

পেরেশান হইয়া পড়িলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে বলিলেনঃ তোমার কথা অনুযায়ী তুমি এখন দোযখের উপযোগী হইয়াছ। কেননা, তুমি স্বীকার করিয়াছ যে, তোমার মাত্র একটি নেকীই আছে। তাহাও ভুল সাব্যস্ত হইল। এখন তুমি দেখ, আমি কিসের উছিলায় তোমাকে মাফ করিয়া দিতেছি। কোন এক শীতের রাত্রিতে একটি বিড়াল ছানাকে প্রচণ্ড শীতে কাঁপিতে দেখিয়া উহার প্রতি তোমার দয়া হইলে তুমি একখানা লেপ আনিয়া উহার গায়ের উপর দিয়াছিলে। বিড়াল ছানাটি তোমার জন্য দো'আ করিলে আমি তাহা কবূল করিয়াছিলাম। সেই দো'আর বদৌলতেই আজ আমি তোমাকে ক্ষমা করিতেছি। অতি নগণ্য হইলেও ইহা একটি আমল ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা আমল ব্যতীত শুধু বাহ্যিক ছুরত দেখিয়াই ক্ষমা করিয়া দেন।

ইমাম বোখারীর ওস্তাদ কাযী ইয়াহ্ইয়া ইব্‌নে আকসামের এন্তেকালের পর কোন এক ব্যক্তি স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইল, তিরস্কার ও ধমকের সহিত তাঁহাকে সওয়াল করা হইতেছে, তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তিরস্কার শেষ হইলে তিনি আরয করিলেনঃ আমি হাদীস শরীফে পড়িয়াছি, إِنَّ اللهَ يَسْتَحْيِىْ مِنْ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ "আল্লাহ্ তা'আলা বৃদ্ধ মুসলমানকে দেখিয়া লজ্জা বোধ করেন এবং ক্ষমা করিয়া দেন।" কিন্তু এখানে তো ব্যাপার বিপরীত দেখিতেছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেনঃ যদিও কোন নেক আমল নাই, তথাপি তোমার বার্ধক্যের প্রতি সদয় হইয়া তোমাকে ক্ষমা করিলাম। আমার রাসূল ঠিকই বলিয়াছেন। বাস্তবিক, বৃদ্ধ মুসলমানের প্রতি আমার দয়া হয়। এই কথাটিই শেখ সাদী কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন—

دلم میدهد وقت وقت ایں امید ـ که حق شرم دارد زموئے سفید

"সময় সময় আমার মনে এই আশা উদিত হয় যে, খোদা, সাদা চুলওয়ালা লোক দেখিয়া লজ্জা বোধ করেন, অর্থাৎ, তিনি বার্ধক্যকে মর্যাদা দিয়া থাকেন।"

ইহা অপেক্ষা আরও অধিক বিচিত্র একটি ঘটনা শুনুন, কাযী ইয়াহ্ইয়া ইব্‌নে আকসাম তো প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধ লোক ছিলেন বলিয়া ক্ষমার পাত্র বিবেচিত হইলেন। এক রসিক যুবক মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হইলে নিজের পরিণাম ভাবিয়া অতিশয় ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িল। কারণ, সে জীবনে কোন নেক আমল করে নাই। সে ওসিয়ত করিল, মৃত্যুর পর আমার গোসল, কাফন সমাপ্ত হইলে তোমরা আমার দাড়িতে কিছু আটা মাখাইয়া দিও, উত্তরাধিকারীগণ তাহাই করিল। কিছুকাল পরে কেহ স্বপ্নে দেখিতে পাইল, তাহার সওয়াল-জবাব হইতেছেঃ "তুমি এমন ওসিয়ত কেন করিয়াছিলে?" সে আরয করিলঃ "ইয়া আল্লাহ্! আমার নেক আমল বলিতে কিছুই ছিল না। কাজেই আমার পরিণাম চিন্তা করিয়া আমি শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, আমি শুনিয়াছিলাম—হাদীসে নাকি বর্ণিত আছে; আল্লাহ্ তা'আলা বৃদ্ধ মুসলমানকে দেখিয়া লজ্জিত হন এবং ক্ষমা করিয়া থাকেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি বৃদ্ধও ছিলাম না, বার্ধক্য প্রাপ্ত হওয়া আমার এখ্‌তিয়ারেও ছিল না, সুতরাং আমি ওসিয়ত করিলাম যে, "আমার দাড়িতে আটা মাখিয়া অন্তত বৃদ্ধের চেহারা বানাইয়া দিও।" এতটুকু ক্ষুদ্র ব্যাপারের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। কোন কবি সত্যই বলিয়াছেনঃ رحمت حق بهانه می جوید "আল্লাহ্‌র মেহেরবানী বাহানার সন্ধানে থাকে।"

উল্লিখিত ঘটনাগুলি দীপ্ত হৃদয় আহ্‌লে-কাশ্‌ফ্ বুযুর্গ লোক কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। বুযুর্গানে দ্বীনের কাশ্‌ফ কিংবা স্বপ্ন শরীঅতের নির্ভরযোগ্য দলিল হইতে পারে না। কিন্তু এই কাশ্‌ফসমূহের মূল হাদীস শরীফেও বিদ্যমান রহিয়াছে। ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, চলাচলের পথ হইতে কাঁটা সরাইয়া ফেলার ফলে এক ব্যক্তিকে নাজাত দেওয়া হইয়াছে। এ সমস্ত ব্যাপারের মূল যখন হাদীসে পাওয়া যায়, তখন ইহার পোষকতার জন্য কাশ্‌ফের ঘটনা বিবৃত করা অসঙ্গত হয় নাই। কাশ্‌ফ বা স্বপ্নের ঘটনাসমূহের বিধান এই যে, কোরআন ও হাদীসের অনুকূল হইলে গ্রহণযোগ্য অন্যথায় প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

(এই পর্যন্ত বর্ণনা করিয়া হযরত মাওলানা থানবী [রঃ] নিজেই জুমার নামায পড়াইলেন এবং নামায শেষে মিম্বরে উপবেশনপূর্বক ওয়ায আরম্ভ করিয়া বলেনঃ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ـ اَمَّا بَعْدُ

আমি বলিতেছিলাম, পরলোকে আমাদের নিকট নেকীর মূল্য হইবে। কেননা, ইহা আখেরাত-এরই মুদ্রা, তথায়ই ইহার উপকারিতা জানিতে পারিবে। ইহলোকে নেকীর বিনিময়ে কোন টাকা-পয়সা লাভ করা যায় না। সুতরাং মানুষ নেকীর মূল্য বুঝিতে পারে না। মৃত্যুর পর-মুহূর্তেই সকলে ইহার মূল্য বুঝিতে পারিবে। একটু পূর্বেই আমি হাদীস দ্বারা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছি যে, অতি ক্ষুদ্র নেকীও পরলোকে বিশেষ কাজে আসিবে, অথচ সামান্য নেকীকে ইহলোকে আমরা কোনই মূল্য দিতেছি না।

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে ইহাই প্রমাণিত হইল যে, না বুঝিয়া কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিলেও বিফল হইবে না। কেননা, উহার প্রত্যেক হরফের বিনিময়ে দশ নেকী পাওয়া যাইবে। তবে এমন কাজ বিফল কেমন করিয়া হইতে পারে? কিন্তু একথার উদ্দেশ্য এই নহে যে, শুধু তেলাওয়াত করাই যথেষ্ট—অর্থ বুঝার প্রয়োজন নাই। অন্যথায় হাফেয ছাহেবগণ আনন্দিত হইয়া যাইতেন যে, আমাদের মর্যাদা আলেম ছাহেবদের চেয়ে অধিক, কিন্তু এরূপ ধারণা ঠিক নহে। কেননা, কোরআনের শব্দগুলি তেলাওয়াতে এত সওয়াব পাওয়া গেলেও ইহা অতি প্রকাশ্য কথা যে, শুধু শব্দগুলি তেলাওয়াত করিয়া সওয়াব হাসিলের জন্য কোরআন অবতীর্ণ হয় নাই; বরং উহার মর্ম অবগত হইয়া তদনুযায়ী আমল করাই প্রধান উদ্দেশ্য। এই বর্ণনা হইতে পরিষ্কার বুঝা গেল যে, কোরআনের মর্ম অনুধাবনের জন্য উহাতে গভীর মনোনিবেশ না করা পর্যন্ত শুধু তরজমা পাঠ করা যথেষ্ট নহে। কেননা, মর্ম অনুধাবন করার উপরই কোরআন অবতারণের মূল উদ্দেশ্য—'আমল' নির্ভর করে।

অনুরূপভাবে উপরোক্ত আয়াতগুলিও যদি কর্ণে প্রবেশ করিয়া থাকে; কিন্তু উহাদের মর্ম অনুধাবনে মনোনিবেশ না করা পর্যন্ত এই শ্রবণের কিছুমাত্র উপকারিতা নাই। কোরআনের তরজমা কাফেরেরাও বুঝিত এবং আমাদের চেয়ে অধিক বুঝিত; কিন্তু তাহাদের কোন উপকারে আসে নাই। কেননা, তাহারা মর্ম অনুধাবনে আদৌ মনোযোগ দেয় নাই। ফলত তাহাদের মনে

আমলের প্রেরণাও উদিত হয় নাই। আলোচ্য আয়াতগুলি এ যাবৎ কেবল ভাসাভাসা ভাবেই শ্রবণ করা হইয়াছিল। সুতরাং বিষয়টি গুরুত্বের সহিত পুনরায় এই জন্য বর্ণনা করিতেছি, যেন উহার মর্ম অনুধাবনে মনোনিবেশ করা হয় এবং তদনুযায়ী আমল করিতে চেষ্টা করা হয়।

নিয়তের ফল ঃ আমার পঠিত আয়াতগুলিতে একটি অতি মহৎ বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে, যদিও তাহা বাহ্যিক দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র বলিয়াই মনে হয়। এখানে নিয়ত বা কামনাকে দুনিয়া ও আখেরাতের সহিত সংযুক্ত করার ফল ব্যক্ত করা হইয়াছে। দুনিয়ার কামনা করিলে তাহার পরিণতি কি হইবে এবং আখেরাত কামনা করিলে তাহার ফল কি হইবে—আল্লাহ্ তা'আলা এখানে তাহা পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ফলকথা, এই আয়াতগুলির মধ্যে নিয়ত বা কামনার উল্লেখ রহিয়াছে। এ কথা নির্দিষ্টরূপে বুঝিবার পর আপনারা অবশ্যই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, বিষয়টি কত বড় গুরুত্বপূর্ণ! অথচ আমরা উহাকে নিতান্ত মামুলি ও সাধারণ পর্যায়ে স্থান দিয়া রাখিয়াছি। এই মামুলি জিনিসটিকে ঘড়ির হেয়ার স্প্রিং-এর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ঘড়ির এই ক্ষুদ্র অংশটি দেখিতে নিতান্ত সামান্য হইলেও ইহার উপরই ঘড়ি চলা নির্ভর করে। নিয়ত বা কামনা আমাদের মধ্যে একটি অদৃশ্য পদার্থ বলিয়া আমাদের নিকট উহার কোন গুরুত্ব নাই। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে খেয়াল ও আকাঙ্ক্ষা এমনই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, যাহা বর্জন করাতে আমাদের যাবতীয় অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে ইহার বদৌলতে অনেক 'ওলীআল্লাহ্' এ সঠিক অবস্থা ও মান প্রাপ্ত হইয়াছেন। বন্ধুগণ! নিয়ত অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ইহাকে কখনও সামান্য মনে করিবেন না। দুনিয়ার যাবতীয় কার্যও ইহারই প্রভাবে চলিতেছে। মানবজাতির মধ্যে এই নিয়ত একটি মহাশক্তি। একটি দৃষ্টান্ত হইতে বিষয়টি আপনারা পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিবেন।

মনে করুন, এক প্রচণ্ড শীতের রাত্রে বৃষ্টি বর্ষিতেছে এবং ঝড়ো হাওয়ার কারণে শীতের মাত্রাও অত্যধিক। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি ঘরে বসিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। এদিকে তীব্র পিপাসায় তাহার কণ্ঠতালু শুকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রচণ্ড ঝড়ের কারণে বাহিরে যাইতে সাহস পাইতেছে না। এমন সময় শাসনকর্তার তরফ হইতে তাহার নিকট এই মর্মে এক আদেশনামা আসিয়া পৌঁছিল যে, শহর হইতে বহু দূরবর্তী অমুক স্থানে এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। চিন্তা করুন, এই ব্যক্তি প্রচণ্ড শীতের দরুন তীব্র পিপাসা সত্ত্বেও পানির জন্য ঘরের বাহির হইতে সাহস পাইতেছিল না। আর এখন হঠাৎ তাহার মধ্যে এমন কোন্ প্রেরণা (আসিল, যদ্দরুন) তাহাকে ঘর হইতে আঙ্গিনায়, আঙ্গিনা হইতে বাহিরে এবং তথা হইতে শহরের বাহিরে কয়েক মাইল দূরবর্তী স্থানে এই দারুণ বৃষ্টি ও প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করিয়া লইয়া যায়। ইহা একমাত্র নিয়ত বা ইচ্ছাশক্তি ছাড়া কিছুই নহে। এতক্ষণ কোন শক্তিশালী প্রেরণার অভাবে তাহার ভিতর ইচ্ছা বা নিয়তের উৎপত্তি হয় নাই। এখন শাসনকর্তার আদেশ তাহার হৃদয়ে আশঙ্কা বা আগ্রহ উৎপন্ন করিয়াছে। আর এই শক্তিশালী প্রেরণাই তাহার ইচ্ছাশক্তিতে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং সে কম্বল জড়াইয়া সমস্ত বিপদ ও ভয়-ভীতি উপেক্ষা করিয়া শাসনকর্তার নির্দেশিত স্থানে যাইয়া পৌঁছিতে বাধ্য হইয়াছে।

নিয়ত বা ইচ্ছাশক্তির প্রবলতা উপলব্ধি করার পর জানা অবশ্যক যে, মূলত ইহা ভালও নহে, মন্দও নহে। ঈপ্সিত দ্রব্যের ভাল-মন্দের উপর ইচ্ছা বা নিয়তের ভাল- মন্দ নির্ভর করে। ভাল কাজের ইচ্ছা করিলে ইচ্ছা ভাল, আর মন্দ কাজের ইচ্ছা করিলে ইচ্ছাও মন্দ। ভাল কাজের ইচ্ছা করিলে কাজ সম্পন্ন না হইলেও সওয়াব পাওয়া যাইবে, আর মন্দ কাজের ইচ্ছা করিলে তাহা

যদি দৃঢ় হয়, তবে গোনাহ্ লেখা যাইবে। এই বর্ণনা হইতেও নিয়তের গুরুত্ব প্রতীয়মান হইতেছে। কেননা, নিয়ত ভিন্ন কোন কাজের সওয়াব বা আযাব বর্তে না। পক্ষান্তরে নিয়তের উপর কার্য সম্পন্ন না হইলেও আযাব বা সওয়াব লেখা যায়। নিয়ত ব্যতীত ভুল-চুকে কোন পাপ কার্য হইয়া গেলে তাহা ক্ষমার্হ। আল্লাহ্ তা'আলা এই মর্মে বান্দাগণকে দো'আ শিক্ষা দিয়া বলিতেছেনঃ

رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَأْنَا "হে আমাদের প্রভু! ভুলে-চুকে আমাদের দ্বারা কোন পাপ কার্য বা খাতা-কসুর হইয়া গেলে তজ্জন্য আমাদিগকে দায়ী করিবেন না।" হাদীস শরীফে আছে, সূরা-বাকারার শেষভাগে উল্লিখিত দো'আগুলি আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করিয়াছেন। অর্থাৎ, ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দাকে দণ্ডিত করিবেন না। অপর হাদীসে বিষয়টি আরও পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছেঃ رُفِعَ عَنْ اُمَّتِى الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ "আমার উম্মত -এর ভুল-ত্রুটি মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।" ইহা সকলেই জানেন যে, কোন কোন এবাদতে নিয়ত ব্যতীত আমল কবূলই হয় না। যেমন, নিয়ত ব্যতীত নামায্ শুদ্ধ হয় না। নিয়তের অপর নাম ইচ্ছা বা কামনা। ইচ্ছা ব্যতীত কোন ব্যক্তি সারাদিনব্যাপিয়া নামায পড়িলেও তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। পক্ষান্তরে নিয়তের সহিত দুই রাক'আত নামায পড়িলেও তাহা শুদ্ধ এবং কবূল হইবে। এই নিয়তের বা ইচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতেই শরীঅত ইচ্ছাকৃত খুন এবং অনিচ্ছাকৃত খুনের মধ্যে প্রভেদ করিয়াছে। ইচ্ছাপূর্বক খুন করিলে তাহাতে পাপও অতি গুরুতর; এমন কি, কোন কোন ছাহাবীর মতে তওবা করিলেও তাহা মাফ হইবে না। অবশ্য অধিকাংশ ছাহাবায়ে কেরাম এই মত খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ইচ্ছাপূর্বক খুন করিলে খুনী ব্যক্তির শাস্তি 'ক্বেছাছ' তথা মৃত্যুদণ্ড অবধারিত হয়। অর্থাৎ, খুনের দায়ে খুনীকে হত্যা করিয়া ফেলিতে হয়। পক্ষান্তরে ভুলে-চুকে অনিচ্ছাক্রমে খুন হইয়া গেলে; যেমন, শিকারের প্রতি নিক্ষিপ্ত তীরে কোন মানুষ নিহত হইলে তাহাতে গোনাহ্ তো হয়ই না, ক্বেছাছও লাগে না। কেবলমাত্র মৃত্যুপণ দিতে হয়। আবার এই নিয়তের গুরুত্বের কারণেই কোন পাপ কার্যের প্রতি দৃঢ় সংকল্প হইয়া গেলে তাহাতে গোনাহ্ লেখা যায়। পক্ষান্তরে নিয়ত বা এরাদা ভিন্ন ভুলে-চুকে পাপ কার্য হইয়া গেলে তাহাতে কোন গোনাহ্ হয় না, উহা ক্ষমার্হ। ইহার রহস্য এই যে, ইচ্ছাই উক্ত পাপ কার্যের প্রধান কারণ। সুতরাং এস্থলে কারণকে কৃতের স্থানে গণ্য করা হইয়াছে। মনে করুন, বিষ পান করিলে সাধারণত মৃত্যু ঘটে, যদি কেহ্ চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে এক তোলা পরিমাণ বিষ পান করে; অতঃপর জোলাব কিংবা বমির সাহায্যে তাহার জীবন রক্ষা পাইলেও সে আত্মহত্যার পাপে পাপী হইয়াছে। কেননা, সে স্বীয় প্রাণ বিনাশের কোন চেষ্টাই বাকী রাখে নাই। চেষ্টা সম্পন্ন করার পর দৈবাৎক্রমে তাহার জীবন রক্ষা পাইয়াছে। এইরূপে কোন ব্যক্তি পাপ কার্যের দৃঢ় সংকল্প করিলে পাপ কার্য সম্পাদনে তাহার করণীয় কার্য শেষ করিয়াছে। কেননা, মানুষ কোন কাজের দৃঢ় সংকল্প করিলে উক্ত কাজ সম্পন্ন হইয়া যাওয়া আল্লাহ্ তা'আলার চিরন্তন রীতি। দৈবাৎ কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটা অতি বিরল, তাহা ধর্তব্য নহে। কাজেই সংকল্প দৃঢ় হইয়া গেলে মানুষ এমন কারণ সম্পন্ন করিয়া ফেলিল, যাহাতে প্রায়শ কার্য সংঘটিত হইয়া যায়। এই কারণেই পাপী হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে নেক্ কাজের সংকল্প করিলে সওয়াবের অধিকারী হয়। কেননা, সংকল্পকারী কর্ম সম্পাদনকারী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এখন আপনারা নিশ্চয় বুঝিতে

পারিয়াছেন যে, নিয়ত বা সংকল্প কেমন গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। ইহা কার্য সম্পন্ন হওয়ার প্রধান কারণ। ইহার পরে কার্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংঘটিত হইয়া যায়। কাজেই শরীঅত কার্যের সংকল্পকে কার্যের সমতুল্য বলিয়া গণ্য করিয়াছে।

সাহস ও শক্তিঃ আজকাল মুসলমানদের মধ্যে দৃঢ় সংকল্পের যথেষ্ট অভাব দেখা যাইতেছে। লোকে প্রায়ই বলিয়া থাকে, অমুক কার্যটি করিতে আমি খুবই ইচ্ছুক ছিলাম; কিন্তু হইয়া উঠিল না। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, তাহারা উক্ত কাজের ইচ্ছাই করে নাই। কেবল আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল মাত্র। কোন সাধ্যায়ত্ত কার্যের ইচ্ছা করিয়া প্রতিনিয়ত উহার ধ্যানে থাকিয়া নিজের সর্বপ্রকারের চেষ্টা উহাতে নিয়োজিত করার নাম এরাদা বা দৃঢ় সংকল্প। ইহার পর কেহ বলুক দেখি যে, কাজ হয় নাই। এরূপ দৃঢ় ইচ্ছা ও প্রবল চেষ্টার পরেও যদি কাজ সম্পন্ন না হয়, তবে দুনিয়ার কাজ চলিবে কেমন করিয়া? সুতরাং কেহ যদি বলে, আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম কিন্তু কাজটি হইল না, আমি তাহা কখনও স্বীকার করিব না; বরং তাহাকে বলিব, তুমি সাধারণভাবে আশা করিয়াছিলে মাত্র, দৃঢ় সংকল্প কর নাই।

এক বৃদ্ধ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। সে এখন পর্যন্ত কু-দৃষ্টি ত্যাগ করিতে পারে নাই। আজকাল লোকে মনে করিয়া থাকে, যৌবনকালে পাপের লিপ্সা না ছুটিলেও বার্ধক্যে উপনীত হইলে ছুটিয়া যাইবে, কিন্তু আমি যথার্থ বলিতেছি, যে পাপের মোহ যৌবনে ছুটে না, তাহা বার্ধ্যক্যেও কোনদিন ছুটিবে না। এই মর্মেই হযরত শেখ সা'দী (রঃ) বলিয়াছেনঃ

درختے که اکنو گرفت ست پائے ـ به نیروئے شخصے برآید زجائے
اگر همچناں روزگارے هلی ـ به گر دونش از بیخ بر نگسلی

"যে চারাগাছ সবেমাত্র মাটিতে শিকড় গাড়িয়াছে, তাহাকে একজন লোকই অনায়াসে উপড়াইয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু উহাকে এই অবস্থায় কিছুকাল থাকিতে দিলে পরে উহাকে কাণ্ড ধরিয়া উৎপাটন করা সম্ভব হইবে না।"

সুতরাং যৌবনকালে যখন যুবকদের হৃদয়ে পাপের মূল ভাল করিয়া গজাইতে পারে নাই, তখন যদি উহাকে ত্যাগ করা না হয়, বার্ধক্যে উক্ত পাপের মূল সুদৃঢ় হইয়া যাইবে এবং চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে, তখন উহা ত্যাগ করা মোটেই সম্ভব হইবে না। এতদ্ভিন্ন আরও একটি অভিজ্ঞতার কথা এই যে, যুবকদের পবিত্রতা শক্তি দৃঢ় থাকে। কেননা, যৌবনে কামোত্তেজনা যেমন তীব্র হয়, তদ্রূপ উহা দমনের শক্তিও প্রবল থাকে। পক্ষান্তরে বার্ধক্যে উত্তেজনা হ্রাস পায় না, অধিকন্তু (এই উত্তেজনা) দমনের শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে—যদিও সে কিছু করিতে না পারে; তখন আর কিছু না হইলেও কু-দৃষ্টিতে তো সে লিপ্ত থাকিবেই। বিশেষত বৃদ্ধ বলিয়া মেয়েরা তাহাদের দৃষ্টি হইতে বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা করে না এবং পর্দাও করে না। এমতাবস্থায় সে জঘন্য পাপ করিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে দৃঢ় ইচ্ছা নিশ্চয়ই উদিত হয়। আমি ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, ইচ্ছার উপরই পাপ। যখন কোন ব্যক্তি পাপ কার্যের দৃঢ় সংকল্প করিয়া কর্মশক্তির অভাবে তাহার সংকল্প পূর্ণ করিতে অক্ষম হয়, তখন তাহার আমলনামায় গোনাহ্ লিখিত হয়। ফলকথা, উক্ত বৃদ্ধ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া এই বদভ্যাস দূরীকরণের নিমিত্ত কোন সহজ তদ্‌বীর প্রার্থনা করিল, যাহাতে সে উহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। আমি বলিলামঃ "উপায়ের সাথে সহজ হওয়ার শর্তের কারণে তো ইহার ধারা অন্তহীনভাবে চলিতেই থাকিবে।

আমি এক উপায় বলিয়া দিব, কিন্তু আপনি কাল আসিয়া বলিবেন, আরও সহজ, পরের দিন বলিবেন, আরও সহজ; এভাবে আপনার রোগের চিকিৎসা হইবে না। আপনি সহজের চিন্তা পরিহার করুন। দৃঢ় সংকল্প ব্যতীত ইহার কোন চিকিৎসা নাই। একবার দৃঢ়রূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন যে, যত কষ্টই হউক না কেন, দৃষ্টি কখনও উপরের দিকে উঠাইব না। কদাচিৎ দৃষ্টি উপরের দিকে উঠিলেও তৎক্ষণাৎ নিম্নমুখী করিয়া ফেলুন। এই উপায়ে আপনার বদভ্যাস 'ইন্‌শাআল্লাহ্' দূরীভূত হইবেই। এই উপায় ব্যতীত দূর হওয়া সম্ভব নহে।" সে বলিলঃ "এই অভ্যাস ত্যাগ করা আমার সাধ্যের বাহিরে; আমি কেমন করিয়া সংকল্প দৃঢ় করিব?" আমি বলিলামঃ আপনি ভুল করিতে-ছেন, আপনি নিশ্চয় এই অভ্যাস ত্যাগ করিতে সক্ষম এবং তাহার সক্ষমতা নিম্নোক্ত দলিল দ্বারা বুঝাইয়া দিলামঃ একদিকে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا "আল্লাহ্ পাক কাহারও উপর তাহার শক্তির বাহিরে ভার চাপান না।" আর একদিকে তিনি বলিয়া-ছেনঃ قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ "আপনি মুসলমানদিগকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং নিজেদের গুপ্তস্থানের হেফাযত করে।"

এই উভয় আয়াতের সম্মিলিত অর্থে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মানুষ নিজের দৃষ্টি অবনত রাখিতে সক্ষম। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখিতে আদেশ করিয়াছেন এবং মানুষের প্রতি তাঁহার কোন নির্দেশই মানব-শক্তির বহির্ভূত হয় না। আমার সম্মুখে তো লোকটি দলিলের বিপরীত অর্থ বাহির করিতে লাগিল। কিন্তু ঘরে ফিরিয়া সে উক্ত দলিলে গভীরভাবে চিন্তা করার পর আমাকে চিঠি লিখিয়া জানাইল যে, "সত্যই আমি ভুল ধারণায় ছিলাম।" মানুষ সর্ববিধ গোনাহ্‌র কাজ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম। অবশ্য প্রথম প্রথম কষ্ট হয়, তাহাও কেবলমাত্র প্রথমবারেই। অতঃপর এই কষ্ট ক্রমশ হ্রাস পাইয়া অবশেষে অভ্যাসে পরিণত হয়।

বন্ধুগণ! ইচ্ছাশক্তি মানবজাতির এমন একটি অমোঘ অস্ত্র, যাহার সাহায্যে সে সমগ্র সৃষ্টজগত -এর উপর জয়ী হইতে পারে। জানিয়া রাখুন, আপনাদের সঙ্গে দুই প্রকারের সেনাদল রহিয়াছে—ফেরেশ্‌তাদের এবং শয়তানদের। এই উভয় সেনাদলের মধ্যে সতত বিরোধিতা রহিয়াছে। ফেরেশ্‌তাদের চেষ্টা আপনাদিগকে পাপ কার্য হইতে রক্ষা করা, আর শয়তানদের চেষ্টা আপনা-দিগকে পাপে জড়িত রাখা। এতদুভয় সেনাদলের জয়-পরাজয়ে আপনাদের সংকল্প যাহাদের অনুকূলে থাকিবে তাহারাই জয় লাভ করিবে। আপনারা কোন পাপ কার্যের সংকল্প করিলে ফেরেশ্‌তার দল পরাজিত হইয়া পড়েন, তখন তাঁহারা জয় লাভ করিতে সক্ষম হন না। আবার পাপ কার্য হইতে আত্মরক্ষার সংকল্প করিলে শয়তানের লশকর পরাজিত হইয়া যায়। অতঃপর উহাদের জয়লাভের আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। দুঃখের বিষয়, আপনাদের মধ্যে এত বড় শক্তি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আপনারা বলিয়া থাকেন—আমরা পাপ কার্য পরিহার করিতে অক্ষম।

পাপের মলিনতাঃ বন্ধুগণ! আপনারা মোটেই অক্ষম নহেন, প্রকৃত কথা এই যে, আপনারা পাপ কার্যকে গুরুতর কিছু মনে করেন না। আপনাদের মনে পাপের পরিণাম সম্বন্ধে কোন ডর-ভয় নাই। পাপ কার্যকে আপনারা অতি তুচ্ছ ও মামুলি বিষয় মনে করিয়া থাকেন। এই কারণে পাপ কার্য ত্যাগ করিবার সংকল্পই আপনাদের মনে কখনও উদয় হয় না। মানুষ যে পাপ কার্যকে বড় মনে করে, কোন বাহানায়ই তাহা করিতে সাহস পায় না। দেখুন, পাপ কার্য বা অপরাধ দুই প্রকার। এক প্রকারের পাপ কার্য আছে যাহা কেবল পবিত্র শরীঅতের বিধানানুযায়ী নিষিদ্ধ। আর

এক প্রকারের পাপ কার্য আছে যাহা পার্থিব আইন-কানুন এবং শরীঅতের বিধান উভয় দিক হইতেই নিষিদ্ধ। বলুন তো, আইনত নিষিদ্ধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধের প্রতি আপনারা কেমন গুরুত্ব প্রদান করিতেছেন? বলাবাহুল্য, আপনারা কেহই তেমন নিষিদ্ধ কার্য করিতে সাহসী হন না। আপনাদের মধ্যে কেহ ডাকাতি করেন না। শরীফ লোকেরা চুরি করেন না। এমন কি আইনত অপরাধ বলিয়া ভয়ে কেহ রাস্তার ধারে পেশাব পর্যন্ত করে না। বলুন তো; কোন ডাকাত যদি বলে, আমার আয় কম, ব্যয় বেশী, ডাকাতি করা ব্যতীত আমি সংসার চালাইতে পারি না। এই আপত্তি শুনিয়া বিচারক কি তাহার ডাকাতির অপরাধ ক্ষমা করিবেন? তাহাকে কি ডাকাতির শাস্তি দিবেন না? অথচ চোর যদি অনুরূপ ওযর পেশ করে, তবে কি তাহাকে চুরির দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে? কখনই না। বিচারক সোজা বলিবেনঃ আমি এসব শুনিতে চাই না, তুমি আইনবিরোধী কার্য করিয়াছ, তোমাকে দণ্ড ভোগ করিতেই হইবে।

বন্ধুগণ! যে উত্তর বা ওযর দুনিয়ার বিচারকের সম্মুখে চলে না, তেমন উত্তর সমস্ত বিচারকের বিচারক আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে পেশ করিতে লজ্জা বোধ করা উচিত। আজকাল মানুষকে সুদ বা ঘুষ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে নিতান্ত বেপরোয়াভাবে উত্তর দেয়, ভাই কি করিব, বাধ্য হইয়া পড়িয়াছি। ইহাছাড়া পরিবারের খরচ চালাইতে পারি না। আবার আলেমদিগকে বিরক্ত করিয়া মারে—আমাদের মজবুরীর প্রতি চিন্তা করিয়া দেখুন, আদালতের ন্যায় এ সমস্ত বাজে ওযরের উত্তরে আলেমগণও বলিতে পারেন—খরচ চলুক বা না চলুক তাহা আমরা জানি না, শরীঅত ইহাকে হারাম করিয়া দিয়াছে, ইহা ত্যাগ করিতেই হইবে, অন্যথায় পাপী হইবে, ফাসেক ও জঘন্য পাপী নামে আখ্যায়িত হইবে। আজকাল সুদ ও ঘুষ জায়েয বলিয়া ফতওয়া দিবার জন্য লোক আলেমগণকে চাপ দিয়া থাকে। তাঁহারা ফতওয়া দিলে তাঁহারাও আপনাদের ন্যায় হইয়া যাই-বেন; বরং আপনাদের চেয়ে আলেমগণই অধিক শাস্তি ভোগ করিবেন। আচ্ছা, কোন মৌলবী জায়েয বলিলেই কি কোন হারাম কাজ হালাল হইয়া যাইবে? আমি সত্য বলিতেছিঃ সাধারণ মুসলমান, যাহাদের মধ্যে শরীঅতের এতটুকু টান আছে, তাহারা এই প্রকারের মৌলবীর সংস্রবই ত্যাগ করিবে।

বন্ধুগণ! প্রথমতঃ আপনার সংসার খরচ চলে কিনা, আলেমগণ তজ্জন্য যিম্মাদার নহেন। আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশ আপনাদিগকে মান্য করিতেই হইবে। দ্বিতীয়তঃ, আপনাদের সংসার খরচ চলে না, এই আপত্তিও ভুল। ব্যয়বাহুল্য কমাইয়া দিলেই সংসার খরচ অনায়াসে চলিতে পারে। গাড়ী বর্জন করুন, চাকর-নওকর কম করুন। অল্প মূল্যের কাপড় পরুন। মোটকথা, হালাল আয় অনুযায়ী ব্যয় করুন, তখন দেখুন সংসার খরচ চলে কিনা। বেহুদা খরচ ছাড়েন না, অথচ বলেন যে, খরচ চলে না; বরং বলিতে পারেন যে, সুদ ও ঘুষ খাওয়া ব্যতীত বিলাসিতা করা যায় না। ইহা আমিও মানি, কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, ভোগ-বিলাসের পরিচর্যা শরীঅত কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছে। সুতরাং আপনার ভোগ-বিলাসের উপকরণ যোগাইবার দায়িত্ব শরীঅত কেন গ্রহণ করিবে? ইচ্ছা করিলে হালাল রুযী দ্বারাই মানুষ স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্বাহ করিতে পারে। অবশ্য বাহ্যিক দৃষ্টিতে সমাজে একটু হেয় হইতে হয়। এই ধারণাও ভুল। প্রকৃত প্রস্তাবে ভোগ-বিলাসে বিমুখ মিতব্যয়ী লোককে সমাজ খুবই সম্মানের চোখে দেখিয়া থাকে। দেশের শাসক-শ্রেণীও এরূপ লোককে সম্মান প্রদর্শন করেন। যদি মানিয়া লওয়া হয় যে, মিতব্যয়িতার সহিত চলিলে লোক চক্ষে হেয় হইতে হয়। কিন্তু তাহা এই মনে করিয়া বরদাশ্‌ত করা উচিত—সুদ

ও ঘুষ গ্রহণ করিলে পরলোকে হেয় হইতে হইবে। হাশরের ময়দানের হেয়তার চিন্তা মনে থাকিলে দুনিয়ার হেয়তার প্রতি লক্ষ্যই থাকিবে না। ইহার পরোয়াও করিবেন না। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমরা পরকালের কথা একেবারে ভুলিয়া বসিয়াছি। অন্যথায় এই প্রকার ওযর-আপত্তি কখনও মুখে আসিত না।

বন্ধুগণ! "অবৈধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ ব্যতীত সংসার চলে না"—কিছুক্ষণের জন্য আপনাদের এই ওযর মানিয়া লইলেও ইহা তো শুধু সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই চলিতে পারে, যে পাপ কার্য বর্জনে অর্থ সমাগমে বিঘ্ন ঘটে। যেমন, সুদ, ঘুষ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যে পাপ কার্য পরিহার করিলে অর্থ সমাগমে কোন ক্ষতি হয় না, যেমন, মিথ্যা, গীবত, অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের প্রতি অত্যাচার, কু-দৃষ্টি প্রভৃতি পাপ কেন পরিত্যাগ করা হয় না? কু-দৃষ্টি দ্বারাও কি অর্থ সমাগম হয়? কু-দৃষ্টি পরিহার করিলে কোন্ আয় কমিয়া যাইবে? তবে এ সমস্ত পাপ কার্য পরিত্যাগ করেন না কেন? এস্থলে কি ওযর পেশ করিবেন? কোন্ অবস্থার চাপে এ সমস্ত পাপ করিতে বাধ্য হইতেছেন? বরং হাদীস শরীফে দেখা যায়, পাপের কারণে রেযেক সংকীর্ণ হইয়া যায়। ইব্‌নে মাজা শরীফে বর্ণিত আছেঃ إِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيَّةٍ يَعْمَلُهَا "বান্দা নিজের কৃত পাপের কারণে রেযেক হইতে বঞ্চিত হয়।" পাপী লোকের মনে শান্তি থাকে না। জীবন বিরক্তিময় হইয়া পড়ে। পোশাক-পরিচ্ছদের বাহার এবং পানাহারের প্রশস্ততার নাম শান্তি নহে। মনের আনন্দ এবং শান্তিই প্রকৃত শান্তি। পাপীর ভাগ্যে তাহা জোটে না, বিশেষত মুসলমানের। কাফেরের কথা স্বতন্ত্র, সে [illegible] পরকালই বিশ্বাস করে না। কাজেই নিশ্চিন্ত মনে পাপ কার্য করিয়া থাকে। বস্তুত পাপ কার্যে মুসলমান কোন স্বাদও পায় না। পুনঃ পুনঃ খোদার ভয় মনে জাগরিত হয়। তথাপি সে মনকে আল্লাহ্‌র দয়া ও ক্ষমার ভরসা প্রদান করিয়া ভয়-ভীতিকে দূরে সরাইয়া দেয়। (এই অনিশ্চিত ভরসায় তাহার মনে কোনই শান্তি আসে না।) তাহার অন্তর আশা ও নিরাশার এক নিদারুণ টানা-হেঁচড়ার মধ্যে পতিত হয়। এমতাবস্থায় এই পাপিষ্ঠ পাপের মধ্যে কি স্বাদ পাইবে? তাহার দৃষ্টান্ত হইল—পাপই পাপ, অথচ কোন স্বাদ নাই।

আজকাল লোকে 'আল্লাহ্ গাফুরুর রহীম' কথার অর্থ সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়া থাকে। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল এবং দয়ালু হওয়ার অর্থ এই নহে যে, পাপের পরিণামে যে ক্ষতি হয় তাহাও হইবে না। 'গাফুরুর রহীম' অর্থ এরূপ হইলে কেহ সাহস করিয়া বিষ পান করিয়া দেখুক। কেননা, 'গাফুরুর রহীম'-এর অর্থ যদি ইহাই হয় যে, আল্লাহ্ গাফুরুর রহীম বলিয়া অনিষ্টকারী পদার্থের অনিষ্টকারিতা গুণ লোপ পায়, তবে বিষপানে তাহার কোন ক্ষতি না হওয়াই উচিত। অথচ বিষ তাহার ক্রিয়া অবশ্যই করিয়া থাকে।

অতএব, বুঝা গেল যে, 'গাফুরুর রহীম'-এর অর্থ এরূপ নহে। আশ্চর্যের বিষয়, পাপ কার্য সম্বন্ধে মানুষ কেমন করিয়া এরূপ ধারণা করিল যে, উপরোক্ত ভরসা মনে স্থান দিলে পাপ কার্য তাহার কোন ক্ষতি করিবে না।

বন্ধুগণ! পাপ কার্যের দরুন অন্তরে মলিনতা পড়িবেই। এই মলিনতা বিদ্যমান থাকিতে বেহেশ্‌তে যাওয়া দুরূহ। গোনাহের মলিনতা দূর করার একমাত্র উপায় একনিষ্ঠ মনে 'তওবা' করা। বস্তুত এমন দুঃসাহসীদের 'তওবা' করার সৌভাগ্য খুব কমই হইয়া থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা মেহেরবানী করিয়া তাহাকে তওবার তওফীক না দিলে পরিশেষে এই মলিনতা দূর করিবে দোয-

খের আগুন। আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও ক্ষমাশীলতার ভরসা যখন দুনিয়াতে কোন অনিষ্টকর পদার্থের অনিষ্টকারিতা দূর করে না, এমতাবস্থায় উক্ত ভরসা পরকালে পাপের অনিষ্টকারিতা দূর করিবে বলিয়া বিশ্বাস করা বড় ভুল। আমি প্রথমে যে আয়াতটি পাঠ করিয়াছি, তাহাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে দুই প্রকারের ইচ্ছাশক্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। (১) প্রশংসনীয় ইচ্ছা, (২) নিন্দনীয় ইচ্ছা। উক্ত উভয়বিধ ইচ্ছার বিধানের এই আয়াতে উল্লেখ রহিয়াছে। এখন আমি তাহাই বর্ণনা করিব, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন।

নিয়তের গুরুত্ব ঃ আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন—

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ○ وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ○

"যে ব্যক্তি 'নগদের' অর্থাৎ, দুনিয়ার কামনা করে, আমি তাহাকে দুনিয়াতেই নগদ যাহা ইচ্ছা করি এবং যাহাকে ইচ্ছা করি প্রদান করিয়া থাকি। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষা-কারীকে দুনিয়া প্রদানের ওয়াদা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা নিশ্চিত নহে, কিরূপ লোককে দিবেন এবং কি পরিমাণ দিবেন তাহা নিজের মরযীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, দুনিয়াকামী প্রত্যেক ব্যক্তির কাম্যবস্তু লাভ করা অবধারিত অনিবার্য নহে। দুনিয়া এমন বস্তু যে, আল্লাহ্ তা'আলা দান করার পাকা ওয়াদা করিলেও তাহা গ্রহণযোগ্য নহে। আমি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রমাণ করিয়া দেখাইতেছি।

মনে করুন, যদি কোন ব্যক্তিকে একটি নিকৃষ্ট পুরাতন আর একটি উৎকৃষ্ট নূতন বাড়ী দেখাইয়া বলা হয় যে, ইহাদের মধ্যে পুরাতন ও নিকৃষ্ট বাড়ীটি তুমি এখনই পাইবে; কিন্তু একমাস পরে ফেরত লওয়া হইবে; আর উৎকৃষ্ট নূতন বাড়ীটি তোমাকে এখন দেওয়া হইবে না, একমাস পরে পাইবে, কিন্তু উহা আর ফেরত লওয়া হইবে না। দুইটি বাড়ী এক সঙ্গে দেওয়া হইবে না। বলুন দেখি, এমতাবস্থায় কি করা যাইবে? বলাবাহুল্য, নিরেট বোকা ব্যক্তিও নিকৃষ্ট, পুরাতন এবং ক্ষণ-স্থায়ী বাড়ীটি গ্রহণ করিবে না। সকলে এস্থলে ঐক্যমত প্রকাশ করিবেন যে, কিছুদিন পরে হইলেও উৎকৃষ্ট, নূতন এবং চিরস্থায়ী বাড়ীটিই গ্রহণ করা উচিত। বন্ধুগণ! আপনারা বিজ্ঞ বিচারকের ন্যায় রায় দিলেন, নিকৃষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী বাড়ীটি কখনই গ্রহণ করা উচিত নহে। কিন্তু নিজেরা যখন এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হইলেন তখন সেই বিবেচনাশক্তি হারাইয়া ফেলিলেন।

বন্ধুগণ! একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদের সম্মুখে দুইটি বাড়ী পেশ করিয়াছেন। (১) দুনিয়ার বাড়ী ও (২) আখেরাতের বাড়ী। দুনিয়া তো আপনারা এখনই পাইতে পারেন। কিন্তু কিছুকাল পরে ইহা আপনাদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লওয়া হইবে। এদিকে ইহা নিকৃষ্ট এবং ক্ষণস্থায়ীও বটে। আর আখেরাতের বাড়ী নিতান্ত উৎকৃষ্ট এবং স্থায়ী। এক্ষেত্রে আপনারা আখেরাতকে কেন পছন্দ করেন না? উপরোক্ত দৃষ্টান্তে নিকৃষ্ট বাড়ীটির মিয়াদ তো অন্তত একমাস ছিল। এখানে আপনার দুনিয়ার বাড়ীর একটুও মিয়াদ নাই। কেননা, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে এ দুনিয়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। জীবনের কি নিশ্চয়তা আছে? এক মিনিটের ভরসাও নাই, প্লেগ রোগের অবস্থা জানেন কি? কেমন করিয়া উহা এক নিমিষে

মানুষের প্রাণ বিনাশ করিয়া ফেলে। আগামীকল্য যাহার মৃত্যু ঘটিবে, সে কি আজ বলিতে পারে যে, তাহার মৃত্যু কখন হইবে? সে তো আজ মহানন্দে কত রঙ্গিন আশার স্বপ্ন দেখিতেছে। কিন্তু তাহার মাথার উপর যে মৃত্যু উপস্থিত সে তাহার কোনই খবর রাখে না। সুতরাং আপনার দুনিয়ার মিয়াদ একমাস কোথায়? এক সপ্তাহ বা একদিনও তো নহে। প্রতি সেকেণ্ডে নিঃশেষ হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। অতএব, কেমন আফসোসের কথা! যে বাসস্থান এত কম মিয়াদী ও ক্ষণস্থায়ী, যেখানে কষ্ট ছাড়া কোন শান্তি আসে না, তাহাই আপনারা পছন্দ করিলেন। আর আখেরাতের এমন উত্তম ও চিরস্থায়ী বাসস্থানের আশা ত্যাগ করিলেন, যাহা পাইতে একটিমাত্র নিঃশ্বাসের বিলম্ব, যাহা অনন্তকালের জন্য স্থায়ী, যাহাতে শুধু শান্তিই শান্তি। কষ্ট বা অশান্তির নাম-গন্ধও নাই। অথচ, এরূপ অবস্থায় কোন্‌টি গ্রহণীয়? আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে আপনি নিশ্চয়ই পরামর্শ দিবেন যে, নিকৃষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী বস্তু কখনই গ্রহণযোগ্য নহে। আমি বলি না যে, আপনি দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করুন, আমার অভিযোগ এবং আফসোস কেবল এই যে, আপনারা দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিয়া রাখিয়াছেন।

ফলকথা, ইহা ভালরূপে প্রমাণিত হইল যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে দুনিয়া প্রদান করার পাকা ওয়াদা করিলেও নিকৃষ্টতাবশত তাহা গ্রহণযোগ্য হইত না। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে দুনিয়া প্রদানের ওয়াদাও পুরাপুরিভাবে করেন নাই। তদুপরি ব্যাপার এই যে, অস্থায়ী দুনিয়াকে অবলম্বন করিলে কোন কোন ক্ষেত্রে আখেরাতের অংশ হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইতে হয়। যেমন, কাফেরদের অবস্থা। পক্ষান্তরে আখেরাত অবলম্বন করিলে কেহ দুনিয়ার অংশ হইতে বঞ্চিত হয় না, বরং আখেরাত অবলম্বনকারী দুনিয়াও পাইয়া থাকে। প্রভেদ শুধু এইটুকু যে, আখেরাত অবলম্বনকারীরা দুনিয়ার অংশ কম এবং অন্যান্য লোকেরা অধিক পায়। এই প্রভেদও কেবল বাহ্যদৃষ্টিতেই দেখা যায়। নতুবা গরীব লোক দুনিয়ার শান্তি যতটুকু ভোগ করে, ধনী লোকের ভাগ্যে তাহা জোটে না। গরীবেরা ধনীদের চেয়ে অধিক পরিমাণে আহার করিয়া তাহা সমস্তই হজম করিতে পারে। তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, খুশী ও আনন্দে বাস করে। মাথা ব্যথা এবং সর্দি-কাশি কাহাকে বলে জানেও না। ধনী লোকদের প্রায়ই জোলাব গ্রহণ করিতে হয়।

কোন একজন ধনী লোকের সহিত এক দরিদ্র লোকের বন্ধুত্ব ছিল। গরীব লোকটি খুব স্বাস্থ্যবান ও সবল ছিল। ধনী লোকটি হালকা-পাতলা এবং রুগ্ন ছিল। একদা ধনী ব্যক্তি তাহার দরিদ্র বন্ধুকে বলিলঃ বন্ধু! তুমি গরীব হইলেও স্বাস্থ্যের দিক দিয়া আমার চেয়ে বেশ মোটা-তাজা, বল তো তুমি এমন কি পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাক? সে ব্যক্তি উত্তর করিল, আমি তোমা অপেক্ষা অধিকতর সুস্বাদু খাদ্য খাইয়া থাকি, প্রত্যেক মাসে নূতন নূতন বিবাহ করি। ধনী লোকটি তাহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। সে বলিল, হাসির কি কথা আছে, কাল আমার বাড়ীতে তোমার দাওয়াত রহিল, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ। ধনী লোকটি বিস্ময় সহকারে তাহার দাওয়াত কবূল করিল এবং পরবর্তী দিন আহারের সময় তাহার বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। দরিদ্র গৃহস্বামী ধনী বন্ধুর সহিত আলাপ জুড়িয়া দিল। কথায় কথায় অনেক সময় অতিবাহিত হইয়া গেলে ধনী লোকটি খাওয়ার তাকীদ জানাইল। গৃহস্বামী টালবাহানা করিয়া বলিল, খাদ্য প্রস্তুত হইতে কিছু দেরী হইবে। একটু অপেক্ষা করুন, পুনরায় আলাপ জুড়িয়া দিল। অবশেষে যখন ধনী লোকটি ক্ষুধায় কাতর হইয়া পুনঃ পুনঃ খাদ্যের তাকীদ করিতে লাগিল, তখন গরীব লোকটি তাহার কাতর অবস্থা দেখিয়া বলিল, টাট্‌কা খাদ্য এখনও প্রস্তুত হয় নাই; ঘরে বাসী

রুটি ও শাক আছে। বল তো নিয়া আসি, সে বলিলঃ যাহাকিছু থাকে তাড়াতাড়ি আন, কথার প্রয়োজন নাই। অগত্যা গৃহস্বামী বাসী রুটি ও শাক আনিয়া অতিথির সামনে উপস্থিত করিল। ধনী লোকটির আর দেরী সহিল না, অন্ধ পাগলের ন্যায় বাসী রুটি খাওয়া আরম্ভ করিল। এই বাসী রুটি ও শাক তাহার রসনায় এত সুস্বাদু বোধ হইতে লাগিল যে, সে প্রত্যেক লোকমায় 'সোব্‌হানাল্লাহ্' বলিতে লাগিল। তৃপ্তি সহকারে আহার শেষ করিলে গৃহস্বামী সদ্যপক্ক সুস্বাদু এবং উৎকৃষ্ট খাদ্যও আনিয়া হাজির করিল। কিন্তু যেহেতু সে খুব তৃপ্তির সহিত আহার করিয়াছিল, সুতরাং অপারকতা প্রকাশ করিল। গৃহস্বামী বলিলঃ সামান্য কিছু আহার কর, ইহা অতি সুস্বাদু খাদ্য। ধনী লোকটি বলিলঃ না, যে খাদ্য আমি গ্রহণ করিলাম ইহা তাহা অপেক্ষা অধিক সুস্বাদু হইবে না। গরীব বন্ধু বলিলঃ বন্ধু! আমি যে বলিয়াছিলাম, "আমি তোমাদের চেয়ে অধিক সুস্বাদু খাদ্য আহার করিয়া থাকি।" এই বাসী রুটিই সেই সুস্বাদু খাদ্য। উপযুক্ত ও পূর্ণ ক্ষুধার সময় আমরা যে বাসী খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা তোমাদের পোলাও-কোরমা অপেক্ষা উত্তম বোধ করি। তোমরা প্রত্যেক সময়ই কিছু না কিছু আহার করিয়া থাক। যাহা আহার কর, কখনও পূর্ণ ক্ষুধার সহিত আহার কর না। আমার কথার উদ্দেশ্য ইহাই ছিল। ধনী লোকটি স্বীকার করিল, বাস্তবিকই তোমরা আমাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট খাদ্য আহার কর। আচ্ছা, তোমার সুস্বাদু খাদ্যের মর্ম তো বুঝিতে পারিলাম। এখন বল তো, প্রত্যেক মাসে নূতন নূতন বিবাহ করার অর্থ কি? সে উত্তর করিলঃ একমাস অন্তর যখন স্বভাবত স্ত্রী-সহবাসের জন্য পূর্ণমাত্রায় আকাঙ্ক্ষা এবং উত্তেজনা জন্মে এবং কামভাব তীব্রভাবে জাগরিত হয়, তখন আমি স্ত্রী সহবাসে প্রবৃত্ত হই। তোমাদের ন্যায় প্রতিদিন কিংবা দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন কৃত্রিম কামস্পৃহা লইয়া স্ত্রী-সহবাস করি না। সুতরাং দীর্ঘ বিরতির পর প্রতিমাসে স্ত্রী-সহবাসে তেমনই আনন্দ পাইয়া থাকি—যেমন আনন্দ নূতন বিবাহে পাওয়া যায়। আর তোমাদের তো কল্পনার সাহায্যে কামস্পৃহাকে উত্তেজিত করিয়া লইতে হয়। ইহাতে তোমরা স্ত্রী-সহবাসে কোনই আনন্দ পাও না। ধনী ব্যক্তি স্বীকার করিলঃ 'তোমার উভয় কথাই সত্য। তোমরা যথার্থই আমাদের চেয়ে অধিক আনন্দ উপভোগ করিতেছ।' দরিদ্র লোকের ভাগ্যে যাহা জোটে সে উহার স্বাদ পূর্ণরূপে উপভোগ করিয়া থাকে। অবশ্য এই প্রার্থনা করিঃ আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে অনশন করার মত খাদ্যাভাব হইতে রক্ষা করুন। ইহা ধ্রুব সত্য যে, দরিদ্র লোক প্রয়োজনানুযায়ী যাহাকিছু পায় তাহার পূর্ণ স্বাদ উপভোগ করিয়া থাকে। কাজ-কর্ম হইতে অবসরলাভের পর ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত অবস্থায় একান্ত আগ্রহ ও স্পৃহার সহিত খাদ্য গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে ধনী লোকেরা কমিটি, মিটিং কিংবা পরামর্শ সভায় যোগদান করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর আহার করে। প্রথমতঃ, পরিচারক আসিয়া বলে, হুযূর! খাদ্য প্রস্তুত আছে, প্রভু উত্তর করেনঃ 'ক্ষুধা নাই।' কিছুক্ষণ পরে অপর চাকর আসিয়া বলে, হুযূর! অভুক্ত থাকা ভাল নহে, সামান্য কিছু আহার করুন। এভাবে বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধ-উপরোধের পর অগত্যা যৎ-কিঞ্চিৎ বিষপানের ন্যায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও গলাধঃকরণ করিয়া থাকেন। বস্তুত ক্ষুধাবিহীন অবস্থায় যাহাকিছু খাওয়া হয় তাহা উদরে যাইয়া বিষের ন্যায়ই ক্রিয়া করে।

বন্ধুগণ! আপনারা আমীর লোকের আভ্যন্তরীণ কষ্ট ও অশান্তির অবস্থা জানিতে পারিলে আমিরী হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন। কখনও আমীর হওয়া পছন্দ করিতেন না। পক্ষান্তরে আমীর লোকেরা গরীবদের সুখ-শান্তি উপলব্ধি করিতে পারিলে গরিবী অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য মনে-প্রাণে কামনা করিবেন। কিন্তু প্রথমে নিজেদের মধ্যে এমন অবস্থা উৎপন্ন করুন,

যাহাতে দরিদ্রাবস্থার প্রকৃত আনন্দ ও শান্তি উপভোগ করিতে পারেন। অর্থাৎ, আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় না করা। লৌকিকতা আর ফ্যাশন ও বাহ্যিক রীতি-নীতি আপনাদিগকে বিনাশ করিয়া দিল, ইহার কারণেই তো আপনাদিগকে অযথা ঋণ-জালে আবদ্ধ হইতে হয় এবং নানা অশান্তির মধ্যে কাল কাটাইতে হয়। যদি আপনারা ফ্যাশন ও লৌকিকতার ফিকিরে না পড়িয়া নিজের আর্থিক সঙ্গতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারেন, তবে দুঃখ-কষ্ট এবং অশান্তি আপনাদের কাছেও ঘেঁষিতে পারে না। লৌকিকতা বর্জন সম্পর্কে আমি একটি বিস্ময়কর ঘটনা বলিতেছি—শুনুন। আমাদের পার্শ্ববর্তী এক ক্ষুদ্র নগরীতে একজন 'হাকীম' বাস করেন। তিনি আমাদেরই বুযুর্গদের সন্তান। একদা হযরত মাওলানা (রশীদ আহমদ) গঙ্গোহী (রঃ) তাঁহার মেহ্‌মান হইলেন। হাকীম ছাহেব মাওলানা ছাহেবের নিকট চুপে চুপে আরয করিলেনঃ "এখানে হুযূরের অনেক ভক্ত আছে, কোন এক জায়গায় দাওয়াতের ব্যবস্থা করিতে পারি। আমার এখানে আজ উপবাস চলিতেছে।" দেখুন, এত বড় মেহ্‌মানের আগমনেও লোকটি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না এবং কোথাও হইতে ধার করিয়া মেহ্‌মানদারী করার কল্পনাও মনে আসিল না। পরিষ্কার বলিয়া দিলেনঃ "আমার এখানে আজ উপবাস চলিতেছে"। হযরত মাওলানা ছাহেবও মামুলি মেহমান ছিলেন না। বলিলেন, ভাই! আমি তোমার মেহ্‌মান, তোমার ঘরে যখন উপবাস চলিতেছে, তখন আমিও উপবাস থাকিব। সাবধান, কাহারও নিকট দাওয়াতের কথা উল্লেখ করিও না। ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত গোটা পরিবারটি নিশ্চিন্ত মনে উপবাসে কাটা-ইয়া দিল। মাগরেবের নামাযের সময় একজন রোগী আসিয়া হাকীম ছাহেবকে এগার টাকা দিয়া গেল। তখন হাকীম ছাহেব আসিয়া হযরত মাওলানা ছাহেবকে জানাইলেন, হুযূর! আপনার মেহ্‌মানদারীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এগার টাকা পাঠাইয়া দিলেন। হযরত মাওলানা বলিলেনঃ ভাই! খাদ্যের আয়োজনে বাড়াবাড়ি করিবেন না। হাকীম ছাহেব বলিলেনঃ "হুযূর! তাহা কখনও হইতে পারে না। যখন আমার ঘরে কিছুই ছিল না, আমি আপনাকে উপবাস রাখিয়াছি। এখন আল্লাহ্ তা'আলা যখন আপনার বরকতে আমাকে এত টাকা দিলেন, আমি উত্তম খাদ্যের আয়োজন করিবই। অতঃপর পোলাও-কোরমা প্রভৃতি সুস্বাদু খাদ্য পাক করাইয়া সকলে তৃপ্তির সহিত আহার করিলেন।

এক ব্যক্তি ইহা অপেক্ষা আরও অধিক বিস্ময়কর একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি এলাহা-বাদে তাঁহার এক বন্ধুর গৃহে মেহ্‌মান হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে একদিন বন্ধুর ছেলেমেয়েরা আনন্দে নাচিতে নাচিতে বলিতে লাগিলঃ "ওহো! আমাদের বাড়ীতে 'শেখ্‌জী' আসিয়াছেন।" লোকটি মনে করিয়াছিলঃ "হয়তো 'শেখজী' নামক কোন বুযুর্গ লোক আসিয়াছিলেন।" বহুক্ষণ যাবৎ সে উক্ত বুযুর্গ লোকের দর্শনলাভের অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু যখন দেখিল, কেহ আসিল না এবং খাওয়ার সময়ও অতীত হইয়া গেল, তখন সে কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে, আজ এই গৃহে উপবাস চলিতেছে। ইহারা উপবাসের নাম রাখিয়াছে 'শেখ্‌জী'। যখন ঘরে ডাল-চাল থাকে না, তখন ছেলেমেয়েদিগকে বলিয়া দেওয়া হয়, "আজ 'শেখ্‌জী' আসিয়াছেন, রুটি পাওয়া যাইবে না।" ইহা শুনার পর হইতে শিশুরা এমন আনন্দের সহিত দিন কাটাইয়া দেয় যে, উপবাসের দরুন কোন কষ্টই অনুভব করে না। সোবহানাল্লাহ্। কি আশ্চর্য ছবর এবং সহিষ্ণুতা, বয়স্করা তো দূরের কথা, ছোট শিশুরা পর্যন্ত দুঃখ-কষ্টে অধৈর্য হয় না!

ফলকথা, এখন আপনারা পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আখেরাতের জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম-কারী আখেরাতের সাথে অধিক না হইলেও প্রয়োজন এবং আরামের পরিমাণ দুনিয়া পাইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা এই সামান্য পার্থিব উপকরণে এমন শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন, যাহা দুনিয়াদার লোকেরা অগাধ ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়াও লাভ করিতে পারে না। কিন্তু দুনিয়া অন্বেষণের সাথে এইরূপে আখেরাত পাওয়া যাইতে পারে না। (নিছক দুনিয়ার প্রত্যাশী আখেরাতের গন্ধও পায় না।) এখন আপনারা বিচার করুন, দুনিয়ার প্রত্যাশী হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ, না আখেরাতের প্রত্যাশী হওয়া। আপনারা এইমাত্র জানিতে পারিয়াছেন, আখেরাতের মোকাবিলায় দুনিয়া এত তুচ্ছ যে, দুনিয়া অন্বেষণকারীরা আখেরাতের অংশ কিছুই পায় না। এদিকে দুনিয়ালাভের পূর্ণ ভরসাও নাই। পূর্ণ ভরসা থাকিলেও দুনিয়া গ্রহণযোগ্য নহে। কেননা, আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার কোনই মূল্য নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন—

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ الاية অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নগদ দুনিয়ার কামনা করে, আমি তাহাকে দুনিয়াতেই যে পরিমাণ ইচ্ছা করি এবং যাহাকে ইচ্ছা করি দান করিয়া থাকি। পরিশেষে তাহার জন্য 'জাহান্নাম' অবধারিত করিয়া দেই। তাহাতে সে লাঞ্ছনা এবং অপমানের সহিত প্রবেশ করিবে। আর যাহারা আখেরাতের কামনা করে এবং মু'মিন থাকিয়া তজ্জন্য যথারীতি চেষ্টা করে, তাহাদের চেষ্টাকে মর্যাদা দেওয়া হইবে।

দুনিয়া ও আখেরাতঃ এখন উভয় বিষয়ের প্রতি একটু গভীর দৃষ্টিপাত করুন। দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং আখেরাতের আকাঙ্ক্ষা, এই উভয় বিষয়ের ফল বা পরিণাম আল্লাহ্ তা'আলা কেমনভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। দুনিয়া-আকাঙ্ক্ষীর সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَانَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ অর্থাৎ, আমি দুনিয়াকামীকে দুনিয়াতেই যে পরিমাণ ইচ্ছা করি এবং যাহাকে ইচ্ছা করি দিয়া দেই। ইহাতে বুঝা যায়, দুনিয়াকামীদের মধ্যে সকলেরই সফলতা লাভ করা জরুরী নহে এবং ইহাও জরুরী নহে যে, যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে। আল্লাহ্ তা'আলার যাহা ইচ্ছা তাহাই দান করিবেন। পক্ষান্তরে আখেরাতকামীদের সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ أُولٰـئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا "যাহারা ঈমান ও আমলের সহিত আখেরাতের কামনা করিবে, তাহাদেরই পরিশ্রমের মূল্য দেওয়া হইবে।" এখানে ঈমান এবং আমলকে কামেল মু'মিন -এর জন্য শর্ত করা হইয়াছে। ইহা প্রকৃতপক্ষে مَنْ أَرَادَ الْاٰخِرَةَ অর্থাৎ, "যাহারা আখেরাতের কামনা করে" কথার পূর্ণ বিবরণ। অর্থাৎ, ঈমান এবং নেক আমলের চেষ্টা করার নামই আখেরাত -এর কামনা। কেননা, ইহা ব্যতীত আখেরাত কামনা হইতেই পারে না। এই শর্তদ্বয়ের দ্বারা ঐসমস্ত লোকের ধারণা অসার বলিয়া প্রমাণিত হইল, যাহারা নিজদিগকে আখেরাতকামী বলিয়া মনে করে, অথচ ঈমান এবং নেক আমলের কাছেও ঘেঁষে না। প্রকৃতপক্ষে এরূপ লোক আখেরাত -এর প্রত্যাশীই নহে, আকাঙ্ক্ষা এবং কামনার কিছু লক্ষণও থাকা আবশ্যক। বস্তুত ঈমান এবং নেক আমলই আখেরাত কামনা করার লক্ষণ। আমি وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ অর্থাৎ, "আখেরাতের জন্য চেষ্টা করে মু'মিন অবস্থায় থাকিয়া" কথাটি কামেল দ্বীনদার লোকের জন্য শর্ত

বলিয়া এই জন্য উল্লেখ করিয়াছি—যেন কেহ এরূপ সন্দেহ করিতে না পারে—আলোচ্য আয়াতে আখেরাত কামনার যে ফল বা পরিণামের উল্লেখ আছে, তাহা শুধু কামনার ফল হইল কিরূপে? বরং ইহা তো সমষ্টিগত চেষ্টা, ঈমান এবং কামনার ফল। অথচ উপরোক্ত বিবরণে শুধু আখেরাতের কামনার ফল বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। এই সন্দেহ দূরীকরণের জন্যই আমি পূর্বাহ্নে বলিয়া দিয়াছি যে, আখেরাতের কামনার সাথে ঈমান ও আমলের শর্তটি প্রকৃতধর্মী। অর্থাৎ, এই শর্তটি আখেরাত কামনার ব্যাখ্যাস্বরূপ। সুতরাং এখন এরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না যে, "তাহাদের চেষ্টার মর্যাদা দেওয়া হইবে" কথাটি কেবলমাত্র আখেরাত কামনার ফল; বরং সমষ্টিগতভাবে উক্ত তিন বস্তুর ফল বুঝিতে হইবে। এখানে আর একটি সন্দেহের অবকাশ থাকে যে, এস্থলে যেমন আখেরাত কামনার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তদ্রূপ দুনিয়া কামনার ব্যাখ্যা কেন করা হইল না? ইহার উত্তর এই যে, লোকে যেন বুঝিতে পারে, আখেরাত কামনার অর্থ—'ঈমান ও এবাদত-বন্দেগী'। তখন ইহাকে সহজসাধ্য মনে করিয়া উৎসাহের সহিত আখেরাতের আকাঙ্ক্ষা করিবে। এই উদ্দেশ্যেই এখানে ঈমান ও আমল দ্বারা আখেরাত কামনার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে দুনিয়ার কামনার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা আল্লাহ্ তা'আলার অভিপ্রেত নহে বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। এতদ্ভিন্ন ব্যাখ্যা করার আরও এক কারণ আছে। আখেরাত কামনার অর্থ ভুল বুঝিয়া বিভিন্ন লোক বিভিন্ন পন্থাকে 'আখেরাত কামনা' মনে করিতেছে। সুতরাং ইহার ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন ছিল। পক্ষান্তরে দুনিয়ার কামনা সহজেই সকলের বোধগম্য হয় বলিয়া উহার ব্যাখ্যা করা হয় নাই।

আখেরাত কামনা এবং দুনিয়া কামনার মধ্যে এক প্রভেদ তো এই দেখান হইয়াছে যে, দুনিয়াতে যত আকাঙ্ক্ষা করা হয়, সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না এবং যত লোকে আকাঙ্ক্ষা করে তাহাদের সকলের আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ হয় না। পক্ষান্তরে আখেরাতের কামনা বলিতে যে ঈমান ও আমলের চেষ্টা বুঝায়, তাহার বিন্দু-বিসর্গও বিনষ্ট হয় না। সবগুলিরই মূল্য দেওয়া হয়। আলোচ্য আয়াতে উক্ত কামনাদ্বয়ের মধ্যে আরও একটি বিশেষ ধরনের পার্থক্যের প্রতি অতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রহিয়াছে। তাহা এইমাত্র আমার কল্পনায় আসিয়াছে। এযাবৎ এরূপ ধরনের পার্থক্যের বিবরণ কোন তাফ্‌সীরের কিতাবেই আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। হয়তো কোন তফ্‌সীরকার লিখিয়া থাকিতে পারেন। উক্ত পার্থক্যটি এই যে, এখানে উভয় আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধীয় দুইটি বাক্যই শর্তযুক্ত বাক্য। প্রত্যেকটি বাক্যে বিনিময়ের সহিত শর্তের সম্পর্ক বিভিন্ন ভঙ্গিতে ব্যক্ত করা হইয়াছে। দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে বলা হইয়াছেঃ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَاۤءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ – এখানে مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ক্রিয়াটি নিত্যবৃত্তকালব্যঞ্জক। ইহার অর্থ হয়, যে ব্যক্তি দুনিয়ার কামনা করিতে থাকে এবং সদাসর্বদা দুনিয়ার অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকে, সে-ই কিছু পাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে আখেরাতের কামনা সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ مَنْ اَرَادَ এই ক্রিয়াটি নিত্যবৃত্তকাল-ব্যঞ্জক নহে। ইহাতেও বুঝা গেল, আখেরাতের ফললাভের জন্য উহার অন্বেষণে সদাসর্বদা খাটিয়া মরিতে হয় না; বরং কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই উক্ত ফল লাভ করা যায়। ইহার অর্থ এই নহে যে, আখেরাতকামীর কামনা ও আকাঙ্ক্ষা স্থায়ী হয় না। কিছুদিন পরেই কামনা ও আকাঙ্ক্ষা লোপ পাইয়া যায়, কখনই এরূপ অর্থ নহে। প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের কামনাও স্থায়ী হইয়া থাকে। তবে যতকিঞ্চিৎ কামনা ও চেষ্টার পরেই উহা স্থায়ী কামনার সমতুল্য হইয়া দাঁড়ায়। কেননা,

আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বত উৎপন্ন হওয়ার পর আখেরাতের কামনা এত সহজ হইয়া পড়ে যে, তাহা উৎপন্ন করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিতে হয় না। তখন আখেরাতের কামনা নিজে নিজেই উৎপন্ন হইতে থাকে। বস্তুত উক্ত কামনা মানুষের ইচ্ছায়ই হয়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে গায়েবী সাহায্য থাকার কারণে এমন মনে হয় যে, কামনা যেন ইচ্ছা ব্যতীত আপনা-আপনিই উৎপন্ন হইতেছে। গায়েবী সাহায্য হওয়ার কারণ এই যে, আখেরাতের কামনা আল্লাহ্ তা'আলার খুব পছন্দনীয়। কাজেই উহার জন্য চেষ্টাকারীকে তিনি সাহায্য করিয়া থাকেন। তাহাতেই উহা খুব সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। হাদীসে আছেঃ

مَنْ تَقَرَّبَ اِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَّ مَنْ تَقَرَّبَ اِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا وَّ مَنْ اَتَانِىْ يَمْشِىْ اَتَيْتُهٗ هَرْوَلَةً

"যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় আমি তাহার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় আমি তাহার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই। যে ব্যক্তি আমার দিকে হাঁটিয়া আসে আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া যাই।"

পক্ষান্তরে দুনিয়া আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে খুবই অপছন্দনীয়। অতএব, ইহার আকাঙ্ক্ষা-কারীকে আল্লাহ্ কখনও সাহায্য করেন না। সে অতিশয় কষ্ট ও ক্লান্তির ভিতর দিয়া দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষা করিতে থাকে। তজ্জন্য সর্বপ্রকারের চেষ্টা ও ব্যাপৃতি নিজেই করিতে হয় এবং দুনিয়ার কামনা ও আকাঙ্ক্ষা আগাগোড়া সর্বদা নিজের তরফ হইতে উৎপন্ন করিতে হয়। সুতরাং উভয় কামনাই স্থায়ী বটে; কিন্তু খোদায়ী মদদে সহজসাধ্য হইয়া পড়ায় আখেরাতের কামনা যেন স্থায়ী বা নিত্যবৃত্ত নহে; বরং এমন মনে হইয়া থাকে যে, নিজের ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া ব্যতীত অপর কোন গায়েবী হাত তাহার অন্তরে উক্ত কামনা উৎপন্ন করিয়া দিতেছে। পক্ষান্তরে দুনিয়ার কামনা সর্ব-দিক দিয়াই নিত্যবৃত্তকালব্যাপিয়া স্থায়ী। এই কারণেই দুনিয়ার কামনার বর্ণনায় নিত্যবৃত্তকালব্যঞ্জক ক্রিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। আখেরাতের কামনায় গায়েবী মদদও সহজ হওয়ার তাৎপর্য এই যে, আখেরাত অন্বেষণের চেষ্টায় যখন আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া যায়, তখন আখেরাত-কামীর অন্তরে এমন এমন এক ভাবের উদয় হয়, যাহার কারণে সমস্ত কঠিন কাজই সহজ হইয়া থাকে। এরাকী (রঃ) বলিয়াছেনঃ

صنما رہ قلندر سزاوار بمن نمائی ـ کہ دراز و دور دیدم رہ ورسم پارسائی

হে মুরশিদ্! আমাকে প্রেমের সহজ পথ দেখাইয়া দাও। কেননা, রিয়াযত ও মেহ্নতের পথ অতি দীর্ঘ ও দুর্গম মনে হইতেছে। رہ قلندر বলিতে এই প্রেমের পথ এবং আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক স্থাপনই উদ্দেশ্য। আর رسم پارسائی বলিতে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক এবং মহব্বত ব্যতীত জাহেরী এবাদত বুঝান হইয়াছে। প্রেম-ভালবাসাশূন্য এবাদতের স্বরূপ নিম্নে ব্যক্ত করিয়াছেনঃ

بطواف کعبہ رفتم بحرم رہم ندادند ـ تو بروں درچہ کردی کہ دروں خانہ آئی

بزمیں چوں سجدہ کردم ززمیں ندا برآمد ـ کہ مرا خراب کردی تو بسجدۂ ریائی

"কা'বা শরীফের তওয়াফ করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু হরমবাসীরা আমাকে তথায় ঢুকিতে দিল না। বলিল, তুমি কা'বার বাহিরে থাকিয়া কি কাজ করিয়াছ যে, এখন ভিতরে প্রবেশ করিতে আসিয়াছ? যমীনে যখন সজ্‌দা করিলাম, তখন যমীন হইতে আওয়াজ আসিলঃ তুমি লোক-দেখান সজ্‌দা করিয়া আমাকে অপবিত্র করিয়াছ।"

আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক এবং মহব্বত স্থাপিত হইলে আখেরাতের কামনায় এবাদত করা অপেক্ষা না করাই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। এবাদতে কোন কষ্ট হয় না। এবাদতের পথে অবশ্য কিছু আভ্যন্তরীণ কষ্টের সম্মুখীন হইতে হয়। কিন্তু ইহাতে সে বিরূপ হয় না; বরং সমস্ত দুঃখ-কষ্ট তাহার নিকট আনন্দদায়ক মনে হয়। কবি বলেনঃ از محبت تلخها شیریں بود 'মহব্বতের বদৌলতে তিক্ত বস্তুও সুমিষ্ট হয়।' আরও বলেনঃ

ناخـوش تو خوش بود بر جان من ـ دل فدائے یار دل رنـجـان من

"আমার অন্তর প্রিয়জনের জন্য কোরবান, তাঁহার প্রদত্ত দুঃখ-কষ্ট আমার জন্য মহাসুখ।" আরও বলা হইয়াছেঃ

نشود نصیب دشمن که شود هلاك تیغت ـ سر دوستاں سلامت که تو خنجر آزمائی

"তোমার তলোয়ারের আঘাতে প্রাণ দান করা শত্রুর ভাগ্যে কোথায় জুটিবে। এই সৌভাগ্য কেবল তোমার বন্ধুবর্গের জন্য, তোমার তরবারির ধার পরীক্ষার জন্য তাহাদের মস্তক ছহীহ্-ছালামত থাকুক।" আরও বলা হইয়াছেঃ

زنـده کنـی عطائے تو وربکشی فدائے تو ـ دل شده مبتلائے تو هرچه کنی رضائے تو

"প্রাণ রাখ, তোমার দান, আর যদি প্রাণে মার তোমার জন্য কোরবান, অন্তর তোমার প্রেমে আত্মহারা। তোমার যাহা খুশী কর।" ফলকথা, আল্লাহ্ তা'আলার সহিত আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপিত হইলে যাবতীয় কার্য তো সহজসাধ্য হয়ই, এমন কি যে মৃত্যুকে মানুষ সর্বাপেক্ষা অধিক ভয় করে, তাহাও খোদা-প্রেমিকদের জন্য অতি সহজ বরং কাম্য ও বাঞ্ছনীয় হইয়া যায়। এই মর্মে আরেফ শিরাযী (রঃ) বলিয়াছেনঃ

خرم آں روز كه زیں منـزل ویـراں بروم ـ راحـت جاں طلبـم وزپے جانـاں بروم
نظر کردم که گر آیـد بسر ایں غم روزے ـ تادر میـکـده شاداں و غزلخـواں بروم

"সেদিন কতই না আনন্দের হইবে, যেদিন আমি এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া ত্যাগ করিয়া প্রিয়জনের দিকে যাত্রা করিব এবং অন্তরের শান্তি কামনা করিব। আমি মানত করিয়াছি, যেদিন আমার এই চিন্তার অবসান ঘটিবে, সেদিন মহানন্দে মহব্বতের গজল গাহিতে গাহিতে শরাবখানার (প্রিয়-জনের) দ্বারে উপস্থিত হইব।"

কেহ মনে করিতে পারেন, মৃত্যুর পূর্বে অনেকেই এমন বড় বড় বুলি আওড়াইয়া মৃত্যুর কামনা প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু মৃত্যু আসিলে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া আর মৃত্যুর কামনা করে না। আমি বলি, এরূপ মনে করা ভুল। ইব্‌নে ফারেয (রঃ) ঠিক মৃত্যু মুহূর্তে দেখাইয়া দিয়াছেন যে, খোদার সহিত সম্পর্কযুক্ত লোক মৃত্যুকালেও কেমন প্রশান্ত ও নিশ্চিন্ত থাকেন, তাঁহার

মৃত্যুকালে যখন আট বেহেশ্‌ত তাঁহার সম্মুখে হাজির করা হইল, তখন তিনি বেহেশ্‌তের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া পাঠ করিলেনঃ اِنْ كَانَتْ مَنْزِلَتِىْ فِى الْحُبِّ عِنْدَكُمْ ○ مَاقَدْ رَاَيْتُ فَقَدْ ضَيَّعْتُ اَيَّامِىْ "যেসকল বেহেশ্‌ত আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে, যদি আপনার দর-বারে আমার মহব্বতের মূল্য শুধু ইহাই হয়, তবে আমি আমার জীবনের দিনগুলি বৃথাই নষ্ট করিয়াছি। অর্থাৎ, আমি তো এই বেহেশ্‌তলাভের উদ্দেশ্যে আপনাকে ভালবাসি নাই; আমার কাম্য তো অন্য কিছু ছিল। এই কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গেই আট বেহেশ্‌ত অদৃশ্য হইয়া গেল এবং আল্লাহ্‌র তরফ হইতে এক বিশেষ 'নূর' প্রতিফলিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এই বিষয়টি কলন্দর (রঃ) কবিতায় বলিয়াছেনঃ

غیرت از چشم برم روئے تو دیدن ندهم - گوش را نیز حدیث تو شنیدن ندهم
گر بیاید ملك الموت که جانم ببرد - تانه بینم رخ تو روح رمیدن ندهم

"আমি চক্ষু ও কর্ণের প্রতি ঈর্ষান্বিত রহিয়াছি। চক্ষুকে তোমার চেহারা দর্শন করিতে দিব না, কর্ণকেও তোমার কালাম শ্রবণ করিতে দিব না। মালাকুল মউত (আঃ) আমার প্রাণ নিতে আসিলে তোমার চেহারা না দেখা পর্যন্ত আমার প্রাণ বাহির করিতে দিব না।" অর্থাৎ, মালাকুল মউত আমার রূহ্ কব্য করিতে আসিলে তোমার বিশেষ 'নূরের তাজাল্লী' না দেখা পর্যন্ত প্রাণ-বায়ু বাহির হইতে দিব না। আল্লাহ্ তা'আলা ইব্‌নে ফারেযের প্রতি রহম করুন। তিনি কার্যক্ষেত্রে এই অবস্থা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মৃত্যুকালে আল্লাহ্ তা'আলার খাছ নূরের তাজাল্লী দর্শন করা ব্যতীত পরলোকের দিকে যাত্রা করিতে রাযী হন নাই।

এই জন্য আমি বলিতেছিলাম, আখেরাতকামীদের আকাঙ্ক্ষাও অবশ্যই স্থায়ী হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাদের প্রতি গায়েবী মদদ থাকার কারণে উক্ত আকাঙ্ক্ষা সহজসাধ্য হওয়ার ফলে মনে হয়, যেন তাঁহারা নিজের তরফ হইতে কোন আকাঙ্ক্ষাই করেন না। সবকিছু আপনাআপনি হইতেছে। আমার কথার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, আখেরাতকামীদের দ্বারা কোন পাপ কার্যই হয় না অথবা তাঁহারা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। কখনই নহে; বরং পাপ কার্যের স্পৃহা তাঁহাদের অন্তরেও হইয়া থাকে। কেননা, তাঁহাদের সঙ্গেও নফ্‌স আছে। তবে তাঁহাদের পাপ-স্পৃহা এবং অন্য লোকের পাপ-স্পৃহার মধ্যে প্রভেদ এইরূপ—যেমন শিক্ষিত ও অনুগত অশ্ব দুষ্টামি আরম্ভ করিলে সামান্য ইশারায় সোজা হইয়া যায়। পক্ষান্তরে অশিক্ষিত ঘোড়া দুষ্টামি আরম্ভ করিলে ইশারা বা কোড়া কিছুই মানে না; বরং জিন, বল্‌গা ও আরোহীকে পিঠের উপর হইতে ফেলিয়া দেয়। ইহা সত্য কথা যে, ঘোড়া শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং অনুগত হইলেও কোন কোন সময় দুষ্টামি আরম্ভ করে। কিন্তু সামান্য শাসনে সে আবার সোজা হইয়া যায়। খোদাপ্রেমিক আখেরাতকামীদের অবস্থা এইরূপ মনে করুন। ইঁহারা বিদ্যুতের মত পুলসেরাত অতিক্রম করিয়া যাইবেন। দর্পণতুল্য স্বচ্ছ অন্তরের অধিকারীরা বলিয়াছেনঃ পুলসেরাত শরীঅতেরই সদৃশ। দুনিয়াতে যাঁহারা শরীঅত পথের উপর সহজে চলিতেন, শরীঅতের বিধানসমূহ মানিয়া চলা অন্যান্য লোকের পানাহারের ন্যায় তাঁহাদের নিকট সহজসাধ্য ও শান্তিদায়ক ছিল, তাঁহারা 'পুলসেরাতও অতি সহজে পার হইয়া যাইবেন। আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। এখন এই আয়াতের অন্তর্নিহিত কতকগুলি সূক্ষ্ম কথা আমার মনে পড়িল। তাহা বর্ণনা করিয়া আজকার মত আমার ওয়ায শেষ করিব।

সূক্ষ্ম কথাঃ আলোচ্য আয়াতের অন্তর্নিহিত একটি সূক্ষ্ম কথা এই যে, প্রথমে দুনিয়াকামীদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেনঃ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَانَشَاۤءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ অর্থাৎ, দুনিয়াকামীদের মধ্য হইতে দুনিয়াতেই যাহাকে ইচ্ছা এবং যে পরিমাণ ইচ্ছা দান করিয়া থাকি। ইহার বিপরীতপক্ষে আখেরাতকামীদের সম্বন্ধে বলা উচিত ছিল اَعْطَيْنَاهُ مَا يَشَاۤءُ অর্থাৎ, আখেরাতকামীকে সে যাহা চাহিবে তাহার সবকিছুই দান করিব। তাহা হইলে দুনিয়াকামীদের উপর আখেরাতকামীদের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইত। তাহা না বলিয়া তিনি আখেরাতকামীদের সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ

اُولٰۤئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا "তাহাদের চেষ্টার মর্যাদা দান করা হইবে।" ইহার কারণ এই যে, তাহাদিগকে তাহাদের ইচ্ছানুরূপ সবকিছু দান করার কথা বলিলে মূলত তাহারা অতিরিক্ত লাভবান হইবে বলা যাইত না; বরং তাহাদের পুরস্কার সম্বন্ধে আল্লাহ্ পাক যাহাকিছু ওয়াদা করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা অনেক কম হইত। কেননা, আখেরাতের নেয়ামত সম্বন্ধে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ ○ مَالَا عَيْنٌ رَاَءَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ অর্থাৎ, (বেহেশ্‌তী-গণকে যেসব নেয়ামত দেওয়া হইবে,) তাহা কোন চক্ষু দেখে নাই, কোন কর্ণ শুনে নাই এবং কোন মানুষের অন্তর উহা কল্পনা করিতে পারে নাই। এখন বলুন, বেহেশ্‌তের নেয়ামতের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন আখেরাতকামীদের ইচ্ছানুযায়ী তাহাদিগকে দান করিলে তাহাদিগকে অধিক দেওয়া হইত, না কম দেওয়া হইত? অনেক কম দেওয়া হইত। কেননা, তথাকার নেয়ামত সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নাই। কাজেই আমাদের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী দান করিলে আমাদের প্রাপ্য খুবই কম হইত। দেখুন, আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার দয়া কত অপরিসীম, আমাদের জন্য পরলোকে এত নেয়ামত প্রস্তুত রাখিয়াছেন যাহা আমাদের কল্পনাতীত। আমাদের এবাদতের পুরস্কার আমাদের ইচ্ছার উপর রাখেন নাই; বরং দয়া করিয়া আমাদের আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা বহু পরিমাণে অধিক আমাদিগকে দান করিবেন। এ সম্বন্ধে মাওলানা রূমী (রঃ) বলিয়াছেনঃ

خود كه يابد ايں چنيں بازار را ـ كه بيك گل مى خرى گلزار را
نيم جاں ستاند وصد جاں دهد ـ آں چه درهمت نيايد آں دهد

"এমন বাজার কে পাইতে না চায়, যথায় একটি ফুলের বিনিময়ে গোটা ফুলের বাগান ক্রয় করা যায়? অর্ধ প্রাণের বিনিময় শত শত প্রাণ এবং যাহা কল্পনাতীত তাহা দান করা হয়।" এখন আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আখেরাতপ্রার্থীদের নেয়ামত তাঁহাদের ইচ্ছানুরূপ কেন করিয়াছেন? এই ইচ্ছানুরূপ নির্ধারণ করা আমাদের জন্য রহ্‌মত স্বরূপ হইয়াছে। এই কারণেই তিনি ইহাদের পরিণাম সম্বন্ধে অনির্দিষ্টভাবে বলিয়াছেনঃ اُولٰۤئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا 'তাঁহাদের চেষ্টার মর্যাদা দেওয়া হইবে।' ইহা হইতে বুঝিয়া লউন, যাহাদের চেষ্টা ও পরিশ্রমের মূল্য এমন মহামহিমান্বিত বাদশাহ্‌র দরবারে বাদশাহের ইচ্ছানুরূপ দেওয়া হইবে, তাহাদিগকে কি পরিমাণ নেয়ামত দান করা হইবে? দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ্‌দের দরবারের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করুন, বাদশাহ্‌র দরবারে যদি কাহারও কোন কাজের মর্যাদা প্রদান করা হয়, তবে তাহার সহিত কিরূপ

ব্যবহার করা হইয়া থাকে। বলাবাহুল্য, বাদশাহ্গণ এরূপ লোকের প্রতি তাঁহাদের নিজেদের দরবারের মর্যাদা অনুসারেই দান করিয়া থাকেন। লোকটির কাজের পরিপ্রেক্ষিতে কখনও দান করেন না। সুতরাং সমস্ত সৃষ্টজগতের প্রভু নিজের মহত্ত্বের অনুযায়ী যাহাকে দান করিবেন, অনুমান করিয়া দেখুন সে ব্যক্তি কি পরিমাণ পাইবে! এখন দুনিয়াতে উহার পরিমাণ বিশদভাবে অনুমান করা সম্ভব নহে।

দ্বিতীয় আর একটি সূক্ষ্ম কথা আয়াতের وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا বাক্যের মধ্যে রহিয়াছে। কেননা ইহার অর্থ—"যে ব্যক্তি আখেরাতের আকাঙ্ক্ষা করে এবং তজ্জন্য যে চেষ্টার প্রয়োজন তাহা করে।" ইহাতে বুঝা যায়, আখেরাতের কৃতকার্যতার জন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টা অতি সহজ। অনুরূপ কথা আপনাদের ভাষায়ও আপনারা বলিয়া থাকেনঃ "এ কাজের জন্য যেই তদবীরের আবশ্যক তাহা করা উচিত।" তদবীরের রকম উল্লেখ না করিয়া এজমালীভাবে বলিয়া দেওয়ায় বুঝা গেল, তদবীরটি সহজ এবং যাহাকে বলা হইয়াছে সে তাহা জানে। ফলকথা, আখেরাত-প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় চেষ্টা খুব সহজ ও সংক্ষিপ্ত এবং সর্ববিদিত। বর্ণনার মুখাপেক্ষী নহে।

তৃতীয় সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আয়াতের مشكورا শব্দের মধ্যে রহিয়াছে, তাহা এই যে, আখেরাতে যাহাকিছু পাইবে তাহা কেবলমাত্র পুরস্কারস্বরূপ, আমলের জন্য নহে। এই শব্দের মধ্যে আমলের উপর গর্ব অনুভবকারীদের প্রতি সতর্কবাণী রহিয়াছে যে, "নিজের আমল বা এবাদতের জন্য গর্ব অনুভব করা উচিত নহে। তোমরা আখেরাতে যাহাকিছু পাইবে তাহা কেবল পুরস্কারস্বরূপ। তোমরা আমল দ্বারা উহার উপযুক্ত হইতে পার না। কেননা, আল্লাহ্র হক আদায় করাই এবাদত। আল্লাহ্র হক অসীম, অসীম হক আদায়ের জন্য এবাদতও অসীম হওয়া আবশ্যক। আমরা সৃষ্ট এবং সীমাবদ্ধ, কাজেই অসীম হক আদায়ে অক্ষম। অতএব, বুঝিতে হইবে, বিনিময় পাওয়ার মত কোন হক্ আমাদের দ্বারা আদায় হয় নাই। সুতরাং আখেরাতে যাহাকিছু আল্লাহ্ দান করিবেন উহা তাঁহার দয়া এবং পুরস্কার ছাড়া আর কি হইতে পারে।

কোন কোন দয়ালু লোক সন্দেহ করিয়া থাকেন, কাফেররা তো পার্থিব জীবনের অল্প কয়েকটি দিন আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী করিয়া থাকে। তাহারা অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করিবে কেন? ইহা তো ন্যায়বিচারের পরিপন্থী বলিয়া মনে হয়। উপরোক্ত বিবরণ হইতে এ সন্দেহের উত্তর পাওয়া যায়। কাফেররা আল্লাহ্ তা'আলার সহিত কুফ্রী করিয়া এবং শরীক সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার অসীম হক্ নষ্ট করিয়াছে। অসীম হক্ বিনষ্ট করার দরুন অনন্ত শাস্তি ভোগ করাই যুক্তিসঙ্গত। নেক আমলকারীরা অসীম হক আদায় করিতে পারে না বটে, কিন্তু কাফেরেরা অসীম হক নষ্ট করিয়া থাকে। সুতরাং সসীম আমলের বিনিময়ে মু'মিনদিগকে অসীম প্রতিফল দান করা বিবেকের বহির্ভূত। বিবেক বলে, যখন আমল সসীম, তখন নেক আমলকারীকেও সীমাবদ্ধ সওয়াব দান করা সঙ্গত ছিল।

মানুষ আজকাল বিবেক ও যুক্তির ধুয়া তুলিয়াছে, কিন্তু বিবেক মানুষের হিতকামী নহে—শত্রু। কবি বলেনঃ

آزمودم عقل دور اندیش را ـ بعد ازیں دیوانه سازم خویش را

"আমি দূরদর্শী বিবেককে পরীক্ষা করার পর নিজকে পাগল সাজাইয়াছি।"

আজকালকার বক্রজ্ঞানী লোকেরা আমাদিগকে জ্ঞানহীন বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া থাকে। তাহারা যে জ্ঞান লইয়া নিজদিগকে জ্ঞানী মনে করে, আমাদের সে জ্ঞানের আবশ্যক নাই। তদপেক্ষা আমাদের জ্ঞানহীনতাই শ্রেয়। তাহারা জানে কি, আমরা কিসের কারণে জ্ঞানহীন হইয়াছি?

مَا اگـر قلاش وگـر ديـوانـه ايم ـ مست آں ساقى و آں پيمـانه ايم

আমরা যদিও দরিদ্র এবং পাগল বলিয়া আখ্যায়িত হই, (কিন্তু তাহাদের বুঝা উচিত আমরা সাধারণ পাগল নই, আমরা 'সাকী' ও 'পেয়ালার' অর্থাৎ, খোদার প্রেমে পাগল। "খোদার পাগল এ সমস্ত দুনিয়ার বুদ্ধিমান অপেক্ষা হাজার গুণে শ্রেষ্ঠ।" কবি বলেনঃ اوست ديوانه كه ديوانه نشد "তাহারাই পাগল, যাহারা পাগল হয় নাই।"

مشكورا শব্দে আল্লাহ্ তা'আলা এই ইঙ্গিতই করিয়াছেন যে, তোমাদের বিবেক তো বলে, তোমাদের বিনিময় কম হউক। কিন্তু তোমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার যে মর্যাদা আমি দান করিব, তাহা আমার অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নহে। এই মর্মে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, একদা হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তিই নিজের আমলের দ্বারা বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবে না, তবে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ হইলে তাহা স্বতন্ত্র কথা। ইহা শুনিয়া হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) বলিলেনঃ (এরূপ প্রশ্ন করার সাহস একমাত্র তাঁহার পক্ষেই শোভনীয় ছিল) ইয়া রাসূলাল্লাহ্! وَلَا اَنْتَ "আপনিও কি আমলের গুণে বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবেন না?" হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেনঃ আমার এই প্রশ্নে তিনি ভীত হইয়া স্বীয় পবিত্র মস্তকের উপর হাত রাখিয়া বলিলেনঃ وَلَا اَنَا اِلَّا اَنْ يَّتَغَمَّدَنِىَ اللهُ بِرَحْمَتِهٖ "না, আমিও না, তবে যদি আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করিয়া আমাকে রহ্‌মতের আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া লন।"

বন্ধুগণ! এখন চিন্তা করুন, কাহার এমন সাহস আছে যে, নিজের আমল ও এবাদতকে একটা কিছু মনে করিতে পারে? আমাদের অবস্থা তো ঠিক সেইরূপ, যাহা এক বুযুর্গ লোক বর্ণনা করিয়াছেনঃ چوں آں كرمے كه درسنگےنها نست ـ زمـيں وآسـمـاں وے همـانـست

"আমরা সেই কীটের মত, যাহা কোন এক প্রস্তরের গর্ভে আবদ্ধ রহিয়াছে। উহার আসমান-যমীন সেই প্রস্তরই বটে। এ সম্বন্ধে মাওলানা রূমী (রঃ) একটি গল্প বলিয়াছেনঃ

এক বেদুইন কখনও নিজের গ্রামস্থ কূপের পানি ব্যতীত কোন নদী বা সাগর দেখে নাই। সে মনে করিত, উক্ত কূপের পানি শুকাইয়া গেলে দুনিয়ার কোথাও পানি পাওয়া যাইবে না। এই মনে করিয়া এক দুর্ভিক্ষের সময় সে এক কলসী মিঠা পানি লইয়া বাগদাদের তৎকালীন খলীফার দরবারের দিকে যাত্রা করিল। বহু দূর-দারাযের পথ কলসী মাথায় অতিক্রম করিয়া বাগদাদে পৌঁছিলে দ্বাররক্ষকেরা তাহাকে খলীফার দরবারে নিয়া হাযির করিল। খলীফার প্রশ্নে সে উত্তর করিলঃ হে আমীরুল মু'মেনীন! এই দারুণ দুর্ভিক্ষের দিনে আমি আপনার জন্য বেহেশ্‌তের এক কলসী মিঠা পানি আনয়ন করিয়াছি। খলীফা তাহাকে খুব সম্মান করিলেন এবং পানির কলসটি গ্রহণ করিলেন, অতঃপর খাজাঞ্চীকে আদেশ করিলেন, এই কলসীটি স্বর্ণ মুদ্রায় পূর্ণ করিয়া লোকটিকে দজ্‌লা নদীর ধার দিয়া বাড়ী ফিরিবার পথ দেখাইয়া দাও, ইহাতে সে বুঝিতে পারিবে

যে, আমার এখানে মিঠা পানির অভাব নাই। তবে আমি তাহাকে যাহাকিছু দান করিয়াছি তাহা কেবল আমার প্রতি তাহার মহব্বতের পুরস্কার, আর কিছুই নহে।

অনুরূপভাবে আমরা কিয়ামতের দিন আমাদের আমলের বিনিময়ে অসংখ্য নেয়ামত দেখিয়া বুঝিতে পারিব, ইহা কেবল মহব্বতের মূল্য, এবাদতের ইহাতে কোন দখল নাই। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ "আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাগণের হিসাব-নিকাশ গোপনে গ্রহণ করিবেন এবং বলিবেনঃ আমি তোমাকে এমন এমন নেয়ামত প্রদান করিয়াছিলাম, তবুও তুমি আমার নাফরমানী করিয়াছ? তোমার অমুক পাপ কার্য স্মরণ কর। তুমি অমুক দিন অমুক কাজ করিয়াছ। আর একদিন এই কাজ করিয়াছ। মোটকথা, এক এক করিয়া তাহার সমস্ত পাপের তালিকা পেশ করা হইবে। এমন কি, মু'মিন বান্দা মনে করিতে পারিবে যে, আমার সর্বনাশ! সব দিকেই নিজকে দোযখের নিকটবর্তী দেখিতে পাইবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেনঃ যাও, দুনিয়াতেও আমি তোমার পাপ গোপন রাখিয়াছিলাম, এখানেও আমি তাহা গোপন রাখিতেছি, অতঃপর তাহার আমলনামা হইতে সমস্ত পাপ মুছিয়া ফেলিয়া ঐস্থানে নেক আমল লিখিয়া দেওয়া হইবে। এ সম্পর্কেই বলা হইয়াছে, أُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ "ইহারাই তাহারা, যাহাদের পাপ কার্যকে আল্লাহ্ তা'আলা নেক আমলে রূপান্তরিত করিবেন।" এই দয়ার কোন সীমা আছে যে, তিনি অনুগ্রহপূর্বক মুসলমানকে অপরের সম্মুখে হেয় করিবেন না? বরং তাহার সম্মান বাড়াইবার উদ্দেশ্যে লোকের সম্মুখে প্রকাশ করা হইবে যেন সে কোন গোনাহ্র কাজই করে নাই।

বন্ধুগণ! এমন দয়ালু খোদাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছেন? আপনাদের উপর তাঁহার কি কোনই হক নাই যে, তাঁহার নাফরমানী করার জন্য এমনভাবে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন? এমন দয়ালু ও মেহেরবান খোদার সহিত সম্পর্ক সৃষ্টি করুন এবং তাঁহার মহব্বত হাসিল করিতে চেষ্টা করুন। কিরূপে ও কোন্ পদ্ধতিতে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করা যায় তাহা বর্ণনা করিয়া এখন আমার বর্ণনা শেষ করিতে চাই।

সম্পর্ক স্থাপনের উপায়ঃ আল্লাহ্ পাকের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইলেঃ ১। আবশ্যক পরিমাণ দ্বীনী এল্ম শিক্ষা করুন। দ্বীনী এল্ম না শিখিলে আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দনীয় এবং অপছন্দনীয় বিষয়ের মধ্যে প্রভেদ করিতে পারিবেন না। ২। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার সহিত পাকা ওয়াদা করুন, ভবিষ্যতে কখনও কোন পাপ কার্য করিবেন না। ভবিষ্যতে গোনাহ্র কাজ না করার পাকা ওয়াদা করাই পূর্বকৃত গোনাহসমূহের প্রকৃত তওবা। তওবার সময়ে পাকা ওয়াদা করিয়া যদি ভুলক্রমে ওয়াদা ভঙ্গ করা হয়, তবে পুনরায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা আবশ্যক। ইহার পরেও যদি আবার ওয়াদা ভঙ্গ করা হয়, তবে 'ছালাতুত্ তওবা' অর্থাৎ, তওবার নামায পড়িয়া পাকা তওবা করিতে হইবে। শুধু মৌখিক তওবা করিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। এরূপ পাকা তওবা করা নফ্সে আম্মারাকে বশে রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায়। এ যুগে ইহার প্রয়োজন অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছে। কিছুকাল এই উপায় অবলম্বন করিয়া দেখুন, পাপ কার্যের প্রতি ঘৃণা জন্মে কিনা। ইহা বড়ই পরীক্ষিত উপায় এবং অতি সহজও বটে। কোন পাপ কার্য হঠাৎ করিয়া ফেলিলে ওযূ করিয়া দুই রাক'আত নফল নামায পড়িয়া তওবা করিবেন। প্রতিবার গোনাহ্র পর এইরূপে তওবা করিলে শেষ পর্যন্ত গোনাহের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা এবং নেক আমলের প্রতি আগ্রহ উৎপন্ন হইবেই। ৩। সঙ্গে সঙ্গে কোন কামেল বুযুর্গ লোকের সাহচর্য অবলম্বন করুন। আল্লাহ্ওয়ালা

লোকদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে থাকুন। তাঁহাদের নিকট নিজের অবস্থা বর্ণনা করিয়া দ্বীনী কার্যে তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করুন। কামেল লোকের সঙ্গ অমোঘ ঔষধ। বিদ্যুতের ন্যায় ক্রিয়া করিয়া থাকে। এই সৎসঙ্গের ফলে অচিরেই দুনিয়া হইতে মন ফিরিয়া আখেরাতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে। ৪। রাত্রে শয্যা গ্রহণ করিয়া সারাদিনের যাবতীয় কার্যের হিসাব-নিকাশ করিয়া দেখুন, যতগুলি গোনাহের কার্য হইয়াছে, তাহা হইতে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ভবিষ্যতের জন্য তওবা করুন। ৫। প্রতিদিন কিছু সময় নির্জনে বসিয়া আল্লাহ্‌র স্মরণে ও ধ্যানে কাটাইবেন। এই পাঁচটি কথার উপর আমল করিয়া দেখুন, ইন্‌শাআল্লাহ্, তাঁহার সহিত আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া যাইবে। এত সহজ উপায়েও যদি কেহ হেদায়তপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা না করে, তবে তাহাকে আল্লাহ্ তা'আলাই হেদায়ত করুন। এখন দো'আ করুন—আল্লাহ্ তা'আলা আমা-দিগকে নেক আমলের তাওফীক দান করুন।

وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ن النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ
وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ ○

—■—

মুরাদাবাদ জামে মসজিদ
১৩২৪ হিজরী, ৫ই জুমাদাল-উলা

আদ্‌দুনিয়া

■

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ نَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَّا دَارَ لَهٗ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَّا عَقْلَ لَهٗ — الحديث

দুনিয়ার মায়া

একটি দীর্ঘ হাদীসের মাত্র দুইটি বাক্য প্রয়োজন মনে করিয়া এখন পাঠ করিলাম। আমার বক্তব্য পেশ করার জন্য উক্ত হাদীসের এই দুইটি বাক্যই যথেষ্ট। ইহা বিশ্বের গৌরব হযরত নবী আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী। ইহাতে এমন একটি অতি প্রয়োজনীয় ও শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে, যাহা প্রত্যেক মুহূর্তে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেক অবস্থায় স্মরণ রাখা এবং তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। বিশেষ করিয়া স্ত্রী-জাতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। কেননা, যাহার রোগ যত কঠিন, তাহার চিকিৎসার প্রতি তত অধিক গুরুত্ব প্রদান করিতে হয়। বিশেষত এই হাদীসে যে রোগের উল্লেখ আছে তাহা স্ত্রী-জাতির মধ্যে অধিক মাত্রায় দেখা যায়। সেই রোগটি দুনিয়ার মায়া।

পুরুষ-জাতির তুলনায় স্ত্রী-জাতি দুনিয়ার প্রতি অধিকতর অনুরক্ত। তাহাদের মধ্যে এই দুনিয়ার মায়া কয়েক প্রকারে পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মধ্যে মুক্ত ও প্রকাশ্যভাবে দেখা যায়। যাহাদের সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পোষ্যবর্গ, ধন-সম্পত্তি এবং মান-সম্মান আছে, তাহারা তো বেপরোয়াভাবে দুনিয়ার প্রতি অনুরক্ত। তাহারা ইহা হইতে কোন অবস্থায়ই মুক্ত হইতে পারে না।

তাহাদের অবস্থা এইরূপ— چوں میرد مبتلا میرد - چوں خیزد مبتلا خیزد "রুগ্নাবস্থায় মরে এবং রুগ্নাবস্থায় জীবিত হয়।" মোটকথা, দুনিয়াই তাহাদের জীবন-মরণ। তাহাদের বাহ্যিক অবস্থাই বলিয়া দেয়ঃ "আমরা পাক্কা দুনিয়াদার।" আবার কতক লোক আছে নিঃসন্তান, তাহাদের মধ্যে এই রোগ অন্য আকারে দৃষ্ট হয়। তাহাদের ধারণা, সন্তান-সন্ততিই দুনিয়া; বস্তুত তাহারা বলিয়াও থাকে—দুনিয়াতে আমাদের কি প্রয়োজন? আমাদের তো বাল-বাচ্চাই নাই। প্রকৃত

প্রস্তাবে এই খেদোক্তির মধ্যেই সত্যিকারের দুনিয়াদারী বিদ্যমান। একটু পরেই তাহা আপনারা পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন।

বাস্তবিকপক্ষে স্ত্রী-জাতির মধ্যে দুনিয়ার অনুরাগ পুরুষ-জাতির তুলনায় অনেক বেশী। পুরুষ-দের মধ্যে অতি অল্প লোক এমন আছে, যাহাদের নিজের ধন-সম্পদ নাই, অথচ অন্যের ধন-সম্পত্তির আলোচনায় সময় নষ্ট করে। কিন্তু স্ত্রী-জাতির মধ্যে এমন অনেক আছে, যাহারা এক-দিকে নিঃসন্তান, তদুপরি অর্থ-সম্পদে কপর্দকহীন, অথচ প্রত্যেকের কথায়, প্রত্যেকের ব্যাপারে এমন কি দুনিয়ার সমস্ত গল্প-গুজবে নিজে অংশগ্রহণে ব্যস্ত। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে দুনিয়ার সমস্ত ঝামেলা হইতে মুক্ত রাখিয়াছিলেন। উচিত ছিল এই অবসর সময়কে আখেরাতের কাজে লাগান। পুরুষ-জাতির মধ্যেও এরূপ লোকের সংখ্যা অল্প নহে, যাহারা দুনিয়ার চিন্তা হইতে মুক্ত রহিয়াছেন। তাহাদেরও এই অবসর সময়ের মূল্য বুঝিয়া নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহ্ তা'আলার যেক্‌রে মশ্‌গুল থাকা উচিত ছিল। এই মর্মে মাওলানা রূমী কেমন সুন্দর বলিয়াছেনঃ

خوشا روز گارے که دارد کسے ـ که بازار حرصش نباشد بسے
بقدر ضرورت یساری بود ـ کند کارے از مرد کارے بود

অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তি অধিক সৌভাগ্যশালী, যাহার অতিরিক্ত লোভ-লালসা নাই। প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যের সংস্থান আছে এবং দুনিয়ার ঝামেলায় লিপ্ত না হইয়া আল্লাহ্ তা'আলার এবাদতে মশ্‌গুল থাকে। ইহার অর্থ এই নহে যে, চিন্তা-ভাবনা মোটেই থাকিবে না। চিন্তা হইতে কেহই মুক্ত নহে। বস্তুত দুই শ্রেণীর মানুষ আছে। এক শ্রেণীর লোক আটানা পিষিলে, সেলাই না করিলে কিংবা অন্য কোন পরিশ্রম না করিলে তাহাদের অন্নের সংস্থান হয় না। আর এক শ্রেণীর লোকের ঘরে খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা আছে কিংবা কোন আত্মীয়-বন্ধু সেবা ও সাহায্য করে। কিংবা উপযুক্ত ছেলে আছে উপার্জন করে। যাহারা গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের চিন্তা-ভাবনায় মশগুল থাকে, বিনা পরিশ্রমে বিনা ভাবনায় খাদ্যের সংস্থান হয় না, আখেরাত ভুলিয়া থাকার কোন ওযর তাহাদেরও নাই। কেননা, তাহারাও কাজের ফাঁকে ফাঁকে যথেষ্ট অবসর পাইয়া থাকে। কিন্তু অবসর সময়টুকু তাহারা বৃথা নষ্ট করে, কোন কাজে লাগায় না। অবশ্য অধিক আফসোস ঐসমস্ত লোকের জন্য, যাহাদের বিনা পরিশ্রমে আহার্যের সংস্থান আছে, অথচ তাহারাও এই নেয়ামতের কদর করে না। বহু আল্লাহ্‌র বান্দা এমনও আছে, যাহাদের অন্ন সংস্থানের চিন্তা করিতে হয় না। তাহারাই অধিকাংশ সময় অন্যের আর্থিক বা পারিবারিক অবস্থার আলোচনা-সমালোচনা করিয়া কাটায়। খাওয়া-পরার জন্য যাহাদিগকে দিবারাত্র পরিশ্রম করিতে হয়, তাহারা তো কখনও কখনও দুনিয়া-দারীর কষ্ট সহিতে সহিতে ঘাবড়াইয়া দুনিয়ার প্রতি বিরক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু পোষ্যবর্গ ও সন্তান-সন্ততি নাই; কিংবা খাদ্যের চিন্তা নাই বলিয়া যাহাদের পরিশ্রম বা চিন্তা-ভাবনা করিতে হয় না, তাহারা দুনিয়ার আলোচনা বা গল্প-গুজবে মোটেই বিরক্ত হয় না। ইহার কারণ এই যে, তাহাদের কেহ নাই বলিয়া লোকে তাহাদের খাতির করে। তাহারাও গর্বভরে মানুষকে ধমক দিয়া বলেঃ "সংসারের সহিত আমাদের কি সম্পর্ক আছে? তোমরা আমাদের কি করিবে।" এদিকে বিনা পরিশ্রমে খাওয়া-পরার ব্যবস্থা আছে; সুতরাং দুনিয়ার প্রতি তাহাদের মন বিরক্ত হওয়ার কোন কারণ নাই। এই কারণে দুনিয়া তাহাদের যথা-সর্বস্ব, দুনিয়াই তাহাদের অভীষ্ট বস্তু। তাহাদের দুনিয়ানুরাগ রোগ কঠিন হওয়ার ইহাও একটি কারণ। তাহারা রোগী হইয়াও নিজকে সুস্থ এবং

নীরোগ মনে করে। আর যাহাদের সন্তান-সন্ততি আছে এবং নানা উপায়ে দুনিয়ার সহিত জড়িত আছে, তাহাদিগকে প্রায়ই বলিতে শুনা যায়ঃ ছেলেটির বিবাহ হইয়া গেলে আমি সংসার হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া যাইব। দুনিয়ার চিন্তা-ভাবনার সহিত কোন সম্পর্ক রাখিব না। নিরিবিলি বসিয়া আল্লাহ্ আল্লাহ্ করিব। পক্ষান্তরে যাহাদের সন্তান-সন্ততি নাই, তাহাদের এই অপেক্ষাও নাই। তবে কি তাহারা মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আছে? এমন দুঃসাহসীও কেহ কেহ আছে যাহারা বলিয়া থাকে, দুনিয়ার সংস্রব আমাদের প্রাণের সঙ্গে জড়িত। মৃত্যুর পর এ সমস্ত ঝামেলা কমিয়া যাইবে। বন্ধুগণ! স্মরণ রাখিবেন, মৃত্যু দ্বারা দুনিয়া হইতে মুক্তিপ্রাপ্তির কোনই ফল নাই। জীবিত অবস্থায় দুনিয়ার ঝামেলা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই লাভ।

যাহা হউক, সাধারণত পুরুষ এবং বিশেষত নারী-জাতি বিভিন্ন উপায়ে এই দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত রহিয়াছে। স্ত্রী-জাতির মধ্যে দুনিয়ানুরাগ অধিক পরিমাণে আছে বলিয়া এমন নহে যে, তাহাতে পুরুষদের উপকার হইবে না। এই রোগে যখন উভয় জাতিই আক্রান্ত, তখন পুরুষগণও উপকৃত হইবেন। কিন্তু স্ত্রী-জাতির মধ্যে এই রোগ বেশী। সুতরাং তাহাদের সুবিধা ও হিতের প্রতি লক্ষ্য রাখা অধিক সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য। কিন্তু যেহেতু হুযূর (দঃ)-এর বাণীও অবিকল আল্লাহ্‌রই বাণী, সুতরাং দুনিয়ার সকল বাণী হইতে হুযূর (দঃ)-এর বাণীকে শ্রেষ্ঠ এবং অগ্রগণ্য বলা যাইতে পারে। অতএব, আমার উদ্দেশ্য বর্ণনার জন্য হুযূর (দঃ)-এর বাণী উদ্ধৃত করিয়া উহার তরজমা করিয়া দেওয়াই যথেষ্ট মনে করি। এখানে আমার শ্রোতৃবৃন্দ হইল স্ত্রীলোকগণ। এতক্ষণ আমি তাহাদের অনেক নিন্দা করিয়াছি, এখন তাঁহাদের কিছু প্রশংসাও করিতেছি। যেমন, কবি বলিয়াছেনঃ عیب مے جملہ بگفتی ھنرش نیز بگو "শরাবের দোষ তো সবই বর্ণনা করিলে, এখন ইহার কিছু গুণও বর্ণনা কর।"

স্ত্রীলোকের গুণঃ স্ত্রীলোকের প্রধান গুণ এই যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ-নিষেধে তাহাদের কোন সন্দেহ থাকে না। আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ বলিয়া শ্রবণ করামাত্র আমলের তাওফীক না হইলেও অবনত মস্তকে তাহা মানিয়া লয়। স্ত্রী-জাতির তরফ হইতে শরীঅতের কোন বিধানে সন্দেহ বা প্রশ্নের অবতারণা হয় না। পুরুষদের মধ্যে এই বিশেষ গুণের অভাব রহিয়াছে। বিশেষত আজকাল পুরুষ-জাতি বিবেক ও যুক্তিবাদের এত ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রত্যেক কথারই কারণ জিজ্ঞাসা করে এবং প্রত্যেকটি মাসআলাকে যুক্তির পাল্লায় ওজন দিয়া মত প্রকাশ করে যে, বিবেকসম্মত হইল কিনা। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকেরা কোন বিষয় বোধগম্য না হইলেও মানিয়া লয়। অল্প দিন হইল, কোন ব্যাপার লইয়া জনৈক স্ত্রীলোক অতিমাত্রায় উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিল। আমি বলিয়া পাঠাইলাম, এ বিষয়ে শরীঅতের বিধান এইরূপ। শরীঅতের বিধান শ্রবণ করামাত্র ভদ্র মহিলা অবনত মস্তকে তাহা মানিয়া লইলেন, উহার বিপরীত একটি শব্দও মুখে আনিলেন না এবং যে বিষয়ে তাঁহার অমত ছিল, তৎক্ষণাৎ তাহাতে রাযী হইয়া গেলেন। অতএব, বলিতেছিলাম, স্ত্রীলোকের গুণও আছে। এই কারণেও যুক্তির সাহায্যে আমার বক্তব্য-বিষয় প্রমাণ না করিয়া (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) "রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন" বলাই অধিক সঙ্গত হইবে। অবশ্য যদি হাদীসের অর্থ সহজবোধ্য করিবার উদ্দেশ্যে বা

বিষয়টি জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরার উদ্দেশ্যে কিংবা এই হাদীসের মর্মার্থ গভীরভাবে অনুধাবন করাইবার প্রয়োজনে যুক্তিগত প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করি, তাহা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু আমার বক্তব্যের দলিল ও প্রমাণের জন্য এই হাদীসের তরজমা বলিয়া দেওয়াই যথেষ্ট মনে করি।

আপনারা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন। এই হাদীসে দুনিয়ার নিন্দা করা হইয়াছে। বস্তুত দুনিয়ার নিন্দনীয়তা সর্ববাদিসম্মত। সমস্ত বিজ্ঞ ও জ্ঞানী লোকেরা আবহমানকাল হইতে বিভিন্ন ভঙ্গিতে ও বিভিন্ন এবারতে দুনিয়ার নানা প্রকারের নিন্দা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা প্রত্যেকে দুনিয়ার এক একটি নির্দিষ্ট দিক লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তবে যিনি যেদিক অবলম্বনে নিন্দনীয়তা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহার লক্ষ্য হইতে অন্যদিক বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসে দুনিয়ার যে নিন্দাবাদ করা হইয়াছে, তাহা উহার সর্ববিধ নিন্দনীয়তাকে ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। এমন কোন নিন্দীয়তা বাকী নাই যাহা এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

বাসগৃহের গুরুত্বঃ এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের বিশদ বর্ণনা এই যে, হুযূর (দঃ) বলিয়াছেনঃ "দুনিয়া ঐ ব্যক্তির ঘর যাহার ঘর নাই।" অর্থাৎ, দুনিয়া বাসগৃহ হওয়ার যোগ্য স্থানই নহে। বাসগৃহের প্রতি সকলেরই আন্তরিক আকর্ষণ আছে এবং এই আকর্ষণের কারণ বিভিন্ন। বাসস্থানের সহিত কাহারও কাহারও সম্পর্ক প্রকৃতিগত। বিশেষত মেয়েলোকেরা দিবারাত্রি অন্তঃপুরে বাস করে বলিয়া বাসগৃহের সহিত তাহাদের অন্তরের সম্পর্ক অতি দৃঢ় হইয়া থাকে। আমাদের মুরুব্বী-দের মধ্যে এক অতি বৃদ্ধা ভদ্র মহিলা ছিলেন। তাঁহাকে কেহ কোথাও যাইবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বলিতেন, না ভাই, আমার তো ইহাই ইচ্ছা যে, যে গৃহে ডুলিতে চড়িয়া আমি দুল্‌-হানরূপে প্রবেশ করিয়াছি, সে গৃহ হইতেই আমার জানাযা বাহির হইবে। অর্থাৎ, মৃত্যুর পূর্বে এই গৃহ হইতে আমি কোথাও যাইব না। নিজের বসতবাড়ীতে সর্বপ্রকারের সুযোগ-সুবিধা ও সুখ-শান্তি আছে। কাহারও বল প্রয়োগ নাই, এই কারণেই ইহার মায়া অত্যধিক। নিজের ঘরে নিশ্চিন্ত মনে পড়িয়া থাকুন, কেহ কিছু বলিতে পারে না। নিজের ঘরে সর্ববিধ সুখ-শান্তির উপকরণ যখন ইচ্ছা প্রস্তুত পাওয়া যায়। কোন স্থানে যাইয়া মনে অস্থিরতা বা অশান্তি আসামাত্র বাড়ী ফিরিয়া গেলেই শান্তি পাওয়া যায় এবং মন স্থির হয়। নিজের ঘরে ক্ষুধা অনুভূত হওয়ামাত্র বাসী-টাট্‌কা যাহাকিছু পাওয়া যায় আহার করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্ত করা যায়। ঘরের বাহিরে পরের বাড়ীতে এই শান্তি-সুযোগ কোথায়? বিদেশে দূরের কথা, দেশে থাকিয়াই যদি কোথাও নিমন্ত্রিত হন এবং আপনার তখন বাসী রুটি খাইতে ইচ্ছা হয়, খাইতে পারিবেন না; টাটকাই খাইতে হইবে কিংবা এমন খাদ্য আপনার সম্মুখে আনা হইবে, যাহা আপনি জীবনে কখনও খান নাই বলিয়া খাইতে রুচি হইতেছে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও শালীনতার খাতিরে তাহাই গিলিতে হইবে। কিংবা আপনার ক্ষুধা হয় নাই, এত অল্প ক্ষুধায় বাড়ীতে থাকিলে আপনি খাদ্য গ্রহণ করিতেন না, কিন্তু এখানে মজলিস রক্ষার্থে সামান্য হইলেও খাইতেই হয়। মোটকথা, দুনিয়ার অন্যান্য জনপদের তুলনায় নিজের বাসগৃহ সর্বাপেক্ষা শান্তিদায়ক।

সারকথা, মানুষের বাঞ্ছিত ও ঈপ্সিত যাবতীয় বস্তুর সেরা নিজের বাসগৃহ। ইহাই মানুষের সর্বপ্রকারের সুযোগ-সুবিধা ও সুখ-শান্তির কেন্দ্রস্থল। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, সন্তান-সন্ততি পানাহারের সামগ্রী এবং আমোদ-আহ্লাদের উপকরণ যাহা-কিছু নেয়ামত দান করিয়াছেন, সবকিছু এই বাসগৃহেরই অন্তর্ভুক্ত। অতএব, হুযূর (দঃ)-এর এই

বাণী اَلدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَّا دَارَ لَهٗ "দুনিয়া তাহার ঘর—যাহার ঘর নাই" হাজার দফতরের এক দফতর। দুনিয়ার উপভোগ্য ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, সন্তান-সন্ততি, পানাহারের সামগ্রী ইত্যাদি যাবতীয় পদার্থের পৃথক পৃথক নিন্দা করিয়া উহাদের মায়া অন্তর হইতে দূরীভূত করার চেষ্টা করা হইলে এত সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর হইত না। যেমন সংক্ষেপে মাত্র দুইটি শব্দে সুন্দরভাবে তিনি দুনিয়ার যাবতীয় উপভোগ্য বস্তুর প্রতি বীতশ্রদ্ধা জাগাইয়া দিয়াছেন।

মালিকানার হাকীকত ঃ হুযূর (দঃ)-এর এই সংক্ষিপ্ত বাণীর বিস্তারিত বিবরণ এই যে, দুনিয়াতে আপনারা যতকিছু নেয়ামত উপভোগ করিতেছেন, ইহার একটিও আপনাদের নিজের নহে। নিজের বাসগৃহ, নিজের ধন-দৌলত, নিজের ছেলেমেয়ে, নিজের অন্তরঙ্গ স্ত্রী প্রভৃতি যত পদার্থের সহিত আপনাদের অন্তরের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া থাকে—ইহার কোনকিছুকেই আপনারা নিজের মনে করিবেন না। হুযূর (দঃ) যেন ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, দুনিয়ার সর্ববিধ বস্তুর তালিকা এক একটি করিয়া তোমাদিগকে কত বলিব? এক কথায় বুঝিয়া লও—দুনিয়ার কোন একটি পদার্থও তোমাদের নিজের নহে। হুযূর (দঃ) কেমন সুন্দরভাবে মূল কথাটি বলিয়া দিয়াছেন, সরাসরি বলেন নাই যে, "দুনিয়া বাসস্থান নহে।" কেননা, এরূপ বলিলে হয়তো এক শ্রেণীর লোক; যাহারা দুনিয়াকে বাসস্থান মনে করিয়া থাকে, তাহারা হুযূরের এই বাণীটিকে অস্বীকার করিয়া বসিত। অতএব, তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হওয়ার জন্য বলিয়াছেন, দুনিয়া বাসগৃহ তো বটে, কিন্তু ঐ ব্যক্তির জন্য, যে বাসগৃহ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। অথচ সেও চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, বাস্তবিকপক্ষে দুনিয়া বাসস্থান নহে।

কিছুক্ষণের জন্য দুনিয়াকে বাসগৃহ ধরিয়া চিন্তা করুন—ঘর কাহাকে বলে? বাসগৃহ বলিতে আমরা উহাকেই বুঝি যাহাতে আমরা স্বাধীনভাবে বাস করি। উহা হইতে কেহ আমাদিগকে বাহির করিতে পারে না। কলিকাতা গিয়া কাহারও গৃহে প্রবাসী হইয়া যদি বল, 'ইহা আমার গৃহ।' গৃহের মালিক তৎক্ষণাৎ তোমাকে কানে ধরিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিবে। এইরূপে যে ধন-সম্পদ কেহ তোমার নিকট হইতে নিতে পারে না, অর্থাৎ, তোমার নিকট কেহ তাহা আমানত রাখে নাই, তাহাই তোমার সম্পত্তি। অতএব, তুমি যে দুনিয়াকে এবং এখানকার ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, স্ত্রী-পুত্র এবং চাকর-নওকর প্রভৃতিকে নিজের বলিয়া মনে করিতেছ, একবার ভাবিয়া দেখ তো মালিকানাস্বত্বের উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী এ সমস্ত পদার্থকে নিজের বলা যায় কিনা? আমি যদি দেখাইয়া দিতে পারি যে, এ সমস্ত পদার্থে তোমার মালিকানা স্বত্বের কোন নিদর্শন নাই, তবে কেমন করিয়া এগুলিকে নিজের মনে করিবে?

নিজের ঘর তো উহাই, যাহা হইতে কেহ তোমাকে বলপূর্বক বাহির করিয়া দিতে পারে না। অথচ আমাদের অবস্থা এই যে, মহাসরকারের নির্দেশ আসামাত্র এক নির্দিষ্ট দিনে সকলে মিলিয়া শূন্য করিয়া তোমাকে এক অন্ধকার গর্তের মধ্যে ফেলিয়া আসিবে। এই তো তোমাদের ঘর, ইহার পরেও যদি বাসগৃহকে নিজের ঘর বলিয়া তোমরা মনে কর, তবে দুনিয়ার সমস্ত ঘরকেই নিজের বলিতে পার। কেননা, অপরের ঘরের উপর যেমন তোমার কোন অধিকার নাই, নিজের বলিতেই মালিক তোমাকে কানে ধরিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিবে। তোমার নিজের বাসগৃহের অবস্থাও তো তদ্রূপ। যখন প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে বাসগৃহ হইতে বাহির করিয়া দিবেন, তখন সেই গৃহে তোমার কোন অধিকার থাকে না—স্ত্রী-পুত্রের উপরও না, ধন-দৌলতের উপরও

না। এ সমস্ত পদার্থ নিজের হওয়ার জন্য যে মাপকাঠি, নিদর্শন এবং সংজ্ঞা নির্ধারিত হইয়াছে, কোনটিই এস্থলে পাওয়া যায় না। তথাপি এ সমস্তকে নিজের কেমন করিয়া বলিতেছ?

কেহ কেহ গর্বভরে বলিতে পারে, মৃত্যুর সাথে যাবতীয় বস্তু হইতে মানুষের মালিকানা স্বত্ব এবং অধিকার লোপ পাইবে সত্য, কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত তো নিজেরই থাকিবে। বন্ধুগণ! ভাবিয়া দেখুন, মৃত্যুর পূর্বেও কোন পদার্থের উপর আপনাদের অধিকার নাই। খাদ্যবস্তুই ধরুন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইচ্ছা আপনাদিগকে উহা হইতে বঞ্চিত করিয়া দিতে পারেন। ভাঁড়ারে নানা প্রকার সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত; হঠাৎ আপনার পেট মোচ্‌ড়াইতে কিংবা দাস্ত হইতে আরম্ভ করিল, আপনি কিছুই খাইতে পারিলেন না, তবে কেমন করিয়া ইহা আপনার হইল? খাদ্য তো আলাদা জিনিস, মানুষের অভ্যন্তরে শান্তি, আরাম, আনন্দ প্রভৃতি যেসমস্ত অবস্থা আছে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইচ্ছা তাহা হইতে মানুষকে বঞ্চিত করিতে পারেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে, ধন-দৌলত, মান-সম্মান, মোটকথা আমাদের যাবতীয় অবস্থা এমন কি নিজের সত্তা ইত্যাদি কিছুই আমাদের নিজের নহে। যখন ইচ্ছা তিনি কাড়িয়া নিতে পারেন।

মানুষের অসহায়তাঃ যেমন দেখা যায়, আজ কাহারও দুই চক্ষু ছিনাইয়া লওয়া হইতেছে। কাহারও বা বাক্‌শক্তি রহিত করা হইতেছে, কাহারও বা জ্ঞানশক্তি লোপ পাইতেছে। কাল যিনি স্বীয় প্রখর বুদ্ধির জন্য গর্বিত ছিলেন, জ্ঞানশক্তি বিকল হইয়া আজ তিনি বদ্ধ পাগল। কোথায় গেল সেই প্রখর বুদ্ধি। কোথায় গেল সেই ইন্দ্রিয় শক্তি-অনুভূতি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোন কোন পাগল মল-মূত্র খাইতে দ্বিধাবোধ করে না; বরং তাহার কার্য সঙ্গত হওয়ার পক্ষে এই প্রমাণ দিয়া থাকে যে, "মানুষ আমার মলমূত্র ভক্ষণকে নিন্দা করিবে কেন? ইহা তো আমার পেটেই ছিল। আবার আমারই পেটের মধ্যে দিতেছি। ইহাতে দোষের কি আছে?" আমি যুক্তির পূজারীদিগকে বলিতেছিঃ "তোমাদের যুক্তি এই পাগলের যুক্তির সমতুল্য বটে। কেননা, শরীঅত এবং সুস্থ প্রকৃতি তো তোমাদের নিকট কিছুই নহে। যুক্তিই তোমাদের সর্বস্ব। আমি বলি, জ্ঞান-বুদ্ধিই যদি ভাল মন্দ এবং কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করার মাপকাঠি হইয়া থাকে, তবে এই পাগলের যুক্তি খণ্ডন করুন। শরীঅত এবং সুস্থ প্রকৃতির দোহাই দিবেন না, শুধু যুক্তি দ্বারা উত্তর দিন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাহার যুক্তি তো সঙ্গত বলিয়াই মনে হইতেছে। যদি বলেন, মলমূত্র খাইতে ঘৃণা হয়, সুতরাং ইহা গর্হিত। আমি বলি, যাহাদের ঘৃণা হয় না তাহাদের জন্য কি মলমূত্র খাওয়া সঙ্গত হইবে? উক্ত পাগল লোকটি তো বলে তাহার ঘৃণা হয় না। তবে কি তাহার এই কার্য প্রশংসনীয় হইবে? আসলে ইহা গাঁজাখোরী ব্যতীত আর কিছুই নহে। তোমরা যেরূপ এই পাগলের কাণ্ড দেখিয়া হাসিতেছ, তদ্রূপ সত্যিকারের জ্ঞানীরাও তোমাদের কাণ্ড দেখিয়া হাসিতেছেন।" সারকথা এই যে, যে জ্ঞানশক্তির আজ তোমরা গর্ব করিতেছ, সামান্য অসুস্থতায় তাহা লোপ পাইতে পারে।

একদিন এশার নামাযের পর আমি মাদ্রাসা হইতে গৃহাভিমুখে গমন করিতেছিলাম। রাত্রি গভীর অন্ধকার থাকায় পথ ভুলিয়া দিশাহারা হইয়া পড়িলাম। একবার ভাইয়ের বাড়ীতে আবার উহার সম্মুখস্থ লাতাফত আলীর বাড়ীতে, আবার নিকটস্থ মিঞা মোহাম্মদ আখ্‌তারের বাড়ীতে যাইতে লাগিলাম। অবশেষে বিশেষ অস্থিরতার পর নিজের বাড়ী খুঁজিয়া পাইলাম। অথচ দিবারাত্র এই পথ দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকি। চক্ষু বন্ধ করিয়া এপথে চলিতে ইচ্ছা করিলেও চলিতে পারি; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তখন আমাকে দেখাইয়া দিলেন, তোমার বাহ্যেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় এমন ভঙ্গুর পদার্থ যে, আমি যখন ইচ্ছা ইহাকে অকর্মণ্য করিয়া দিতে পারি। তুমি কিছুই করিতে পার

না। এখন ভাবিয়া দেখুন, কোন্ মুখে আমরা বলিতে পারি?—আমার বস্তু, আমার ধন-দৌলত, আমার ঘর। হাঁ, যে গৃহকে আমার বলিয়া দাবী করি, তাহা হইতে তো এইরূপে নির্দিষ্ট মিয়াদ ফুরাইয়া গেলে আমার হাত-পা ধরিয়া অন্য লোকেরা যেখানে ইচ্ছা আমাকে ফেলিয়া দিবে। তখন আমি যাইতে না চাহিলেও বলপূর্বক আমাকে ফেলিয়া দেওয়া হইবে।

সিম্‌লা শহরে কোন এক কালেক্টরের মৃত্যু হইলে ডুলিতে করিয়া তাঁহার মৃত দেহ অন্যত্র লইয়া যাওয়া হইতেছিল। কোন একজন দর্শক স্বচক্ষে দেখিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, বহন করিয়া নেওয়ার সময় উক্ত কালেক্টরের মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়া রাস্তার পাথরের সহিত ধাক্কা খাইতেছিল। ভাবিয়া দেখুন, এমন একজন প্রতাপশালী কালেক্টর, পূর্ণ একটি জিলার উপর যাহার ক্ষমতা অপ্রতিহত ছিল। আজ নিজের মস্তককে প্রস্তরের আঘাত হইতে রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই।

کل پاؤں ایک کاسۂ سر پر جو آگیا ـ یکسروہ استخواں شکستہ سے چورتھا
بولا سنبھل کے چل تو ذرا راہ بےخبر ـ میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا

"গতকল্য পথিমধ্যে একটি মস্তকের খুলির উপর আমার পা পড়িয়া উহার হাড় ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। বলিলঃ হে অসতর্ক! পথে একটু সাবধান হইয়া চল। আমিও কোন সময়ে কোন এক গর্বিত লোকের মস্তক ছিলাম।"

এমন অসহায় হইয়াও মানুষের অহংকার সীমালঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছে। কেহ কেহ তো অহংকারে খোদায়িত্বের দাবী করিয়াছিল। যেমন, ফেরআউন বলিয়াছিল, اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى 'আমি তোমাদের বড় খোদা'। আজকালও মানুষের মধ্যে যেরূপ অহংকার দেখা যায়, তাহা খোদায়ী দাবী অপেক্ষা কম নহে।

মানুষের বিভিন্ন অবস্থাঃ কোন কোন সময় অহংকারে মানুষ বলিয়া থাকেঃ "তুমি চেন না আমি কে?" কোন একজন বুযুর্গ লোক এরূপ কথার বড় উপযুক্ত উত্তর দিয়াছিলেন। কোন অহংকারী ব্যক্তি বুক ফুলাইয়া পথ চলিতেছিল। উক্ত বুযুর্গ লোক তাহাকে উপদেশ দিলেনঃ "মিঞা! এভাবে বুক ফুলাইয়া চলা অন্যায়। বিনয় ও নম্রতার সহিত চলা উচিত।" সে বলিল, আপনি জানেন না আমি কে? তিনি বলিলেন, জানিঃ

اَوَّلُكَ نُطْفَةٌ قَذِرَةٌ وَاٰخِرُكَ جِيْفَةٌ مَذِرَةٌ وَاَنْتَ بَيْنَ ذٰلِكَ تَحْمِلُ الْعَذِرَةَ

"তুমি প্রথমে একবিন্দু অপবিত্র শুক্র ছিলে, পরিশেষে তুমি একটি গলিত মৃতদেহে পরিণত হইবে। এখন তুমি উক্ত উভয় অবস্থার মধ্যবর্তীকালে পেটের মধ্যে পায়খানা বহন করিয়া বেড়াইতেছ।"

আল্লাহ্ তা'আলার কি বিচিত্র ক্ষমতা! তিনি মানবদেহকে নানা প্রকারের অপবিত্র ও দুর্গন্ধময় পদার্থে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং পাকস্থলী ও দেহাভ্যন্তর হইতে বহির্ভাগের দিকে এ সমস্ত দুর্গন্ধ বাহির হওয়ার মত কতকগুলি ছিদ্রপথও রহিয়াছে। তথাপি উক্ত ছিদ্রপথসমূহ দিয়া বাহিরে কোন দুর্গন্ধ অনুভূত হয় না। যদি দুর্গন্ধ বাহির হইত, তবে মানুষ বড় বিপদে পড়িত। কোন মজলিসে বসিবার উপযুক্ত থাকিত না। কোন স্থানে যাওয়ামাত্র গলা ধাক্কা মারিয়া বাহির করিয়া দিত। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার নমুনাও দেখাইয়া দেওয়া হয়। 'বাখ্‌র' নামক এক প্রকার রোগে

মানুষের মুখে দুর্বিষহ দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। এরূপ লোকের সম্মুখে বা কাছে দাঁড়াইয়া থাকা সঙ্গীর জন্য মৃত্যু সমতুল্য। দেওবন্দ-দারুল উলুমে আমার ছাত্রজীবনে মুখে দুর্গন্ধযুক্ত জনৈক লোক কোন সময় নামাযে আমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইত, তখন আমার পক্ষে নামায পূর্ণ করাই মুশ্‌কিল হইয়া পড়িত। ফেকাহ্-শাস্ত্রবিদগণ 'সোবহানাল্লাহ্' কেমন জ্ঞানী ছিলেন! বলিয়াছেন ঃ রোগের কারণে যাহার মুখে এমন দুর্বিষহ দুর্গন্ধ হয়, তাহার উচিত জামাতে নামায না পড়া। সে ব্যক্তি একাকী নামায পড়িলে জামাতের সওয়াব পাইবে। পাকস্থলী নিঃসৃত দুর্গন্ধময় রস মুখে উঠিয়া আসা হইতেই এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং মানুষের এই উক্তি, "চেন না আমি কে?" বড় অহংকার এবং মূর্খতার পরিচায়ক। আমাদের অবস্থা যখন চতুর্দিক হইতে এমন সহায়-হীন, তখন কোন বস্তুকে আমাদের নিজের বলিয়া দাবী করা কেমন করিয়া শুদ্ধ ও সঙ্গত হইবে? এই মর্মে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ

يَقُوْلُ ابْنُ اٰدَمَ مَالِىْ مَالِىْ ـ مَالَكَ اِلَّا مَاأَكَلْتَ فَاَفْنَيْتَ اَوْ لَبِسْتَ فَاَبْلَيْتَ اَوْ تَصَدَّقْتَ فَاَمْضَيْتَ

"মানুষ বলিয়া থাকে, আমার মাল, আমার মাল, বস্তুত তোমার কি আছে? যাহা খাইয়াছ, নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছ। যাহা পরিয়াছ, পুরাতন করিয়া ফেলিয়াছ। যাহা দান করিয়াছ, অগ্রিম প্রেরণ করিয়াছ। ইহা একদিন কাজে আসিবে, ইহা অবশ্যই তোমার।"

বন্ধুগণ! মালও আমাদের নহে, স্ত্রী-পুত্রও আমাদের নহে, আমরা তো শুধু শ্রমিক, গাড়ী টানিতেছি। ইহাতে স্ত্রী-পুত্র, ধন-দৌলত ইত্যাদি দুনিয়ার যাবতীয় উপকরণ বোঝাই রহিয়াছে। গন্তব্য স্থানে পৌঁছামাত্র আমাদিগকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইবে। বন্ধুগণ! শ্রমিক, চাকর, কুলি কখনও মালিক হইতে পারে না। আমরা প্রকৃতপক্ষে চাকর, মনিব হইব কেমন করিয়া? মূলত আমরা সকলে প্রজা, মালিক কিরূপে হইতে পারি? আমরা গোলাম, প্রভু নহি। আমরা ক্ষুদ্র, বড় হওয়া আল্লাহ্ পাকের দাবী। আমরা পরাভূত ও করতলগত। শুধু তিনিই শক্তিশালী এবং প্রভাব-শালী। وَلَهُ الْكِبْرِيَاۤءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ "আসমানে এবং যমীনে তাঁহারই শ্রেষ্ঠত্ব।"

আমাদের যাবতীয় বস্তুই আমানতঃ উপরোক্ত আলোচনা হইতে আপনারা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সংসারের কোন বস্তুর উপরই আমাদের মালিকানা স্বত্ব নাই। সবকিছুই আমাদের নিকট অপরের রক্ষিত আমানত। এখন আপনারা হাদীসের দ্বিতীয় অংশের অর্থও পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন। وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَّا عَقْلَ لَهٗ "দুনিয়ার সম্পদ সে ব্যক্তিই জমা করিয়া থাকে যাহার বুদ্ধি নাই।" বস্তুত কোন জ্ঞানী লোক পরের দ্রব্যকে আপন মনে করিয়া জমা করে না। কেহ এরূপ করিলে লোকে তাহাকে বোকা বলে এবং কানে ধরিয়া বাহির করিয়া দেয়। যেমন, কাহারও খেতে সারি সারি শস্যের আঁটি পড়িয়া আছে। অপর কেহ আসিয়া উহা আপন স্বত্ব মনে করিয়া বোঝা বাঁধিতে আরম্ভ করিল। তখন ইহা পরিষ্কার কথা যে, খেতের মালিক আসিয়া তাহাকে তিরস্কার করিবে এবং বাহির করিয়া দিবে। ঐ লোকটির যাচাই করা উচিত ছিল, এই শস্য কাহার; উহা তাহার সাব্যস্ত হইলে বোঝা বাঁধিত। এই ব্যক্তি যেমন পরের ফসল জমা করিয়া বোকা বনিয়াছে, তদ্রূপ যে ব্যক্তি দুনিয়ার সম্পদ সঞ্চয় করে সেও বোকা। ইহা হইল দুনিয়ার অবস্থা। এখন বুঝিয়া লউন যে, ধন-সম্পদের নাম দুনিয়া নহে। বেচারা ধন-সম্পদ মাঝখানে বৃথাই দুর্নাম-

গ্রস্ত হইয়াছে। কেননা, যে ধন মানুষ হালাল উপায়ে উপার্জন করিয়া আখেরাতের কাজে ব্যয় করে তাহা ভাল। আর সুদ, ঘুষ ইত্যাদি হারাম উপায়ে যাহা অর্জন করা হয় তাহা মন্দ। যদি ধন-সম্পদই দুনিয়া হইত, তবে উহা দুই প্রকারে বিভক্ত হইল কেমন করিয়া। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ ভিন্ন অপর কোন বস্তুর সহিত সম্পর্ক স্থাপনপূর্বক নানাবিধ কাজ-কারবারের ঝামেলায় মগ্ন হইয়া আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া যাওয়াকেই দুনিয়া বলে। এই গায়রুল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্ক স্থাপন সকলের জন্য মন্দ। পক্ষান্তরে ধন-সম্পদ কাহারও জন্য ভাল কাহারও জন্য মন্দ। এইরূপে সন্তান-সন্ততিও দুনিয়া নহে। অবশ্য সন্তানের এমন প্রগাঢ় সম্পর্ক স্থাপনকে দুনিয়া বলা হইবে—যদ্দরুন মানুষ খোদাকে ভুলিয়া যায়। আমাদের মুরুব্বীদের মধ্যে এক স্নেহময়ী-মহিলা আমার জন্য দো'আ করিতেনঃ "ইয়া আল্লাহ্! সংসারে আমার আশরাফের অংশী দান কর, (অর্থাৎ, তাহাকে সন্তান দাও)।" আমি ইহা শুনিয়া বলিতাম, যে সন্তান কেবল দুনিয়ারই অংশীদার এবং সাথী হইবে, আমি তেমন সন্তান চাই না।

সন্তান-সন্ততি বিপদঃ বন্ধুগণ! এই যুগের সন্তান-সন্ততি অধিকাংশই পিতা-মাতাকে আল্লাহ্ তা'আলা হইতে ভুলাইয়া রাখে। অতএব, নিঃসন্তান ব্যক্তি যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা হইতে মুক্ত রহিয়াছে বলিয়া আল্লাহ্‌র শোকরগুযারী করা এবং নিশ্চিন্ত মনে সদাসর্বদা তাঁহার যেকের-ফেকেরে মশগুল থাকা উচিত। কোন স্ত্রীলোক মুরীদ হওয়ার উদ্দেশ্যে আমার নিকট আসিলে আমি শর্ত আরোপ করিলামঃ "কুসংস্কারমূলক সামাজিক প্রথাগুলি বর্জন করিতে হইবে।" সে বলিতে লাগিলঃ "আমার বাল-বাচ্চা কিছুই নাই। আমি কিসের 'রসুমাত' করিব?" আমি বলিলামঃ নিজে করিবে না বটে; কিন্তু অপর স্ত্রীলোকদিগকে অবশ্যই পরামর্শ দিবে। এই প্রাচীন বৃদ্ধাগণ শয়তানের খালা। নিজে কিছু না করিলেও অপরকে শিক্ষা এবং পরামর্শ দিয়া থাকে। কেহ যদি বলে, এই স্ত্রীলোকটি কত হতভাগিনী। বাল-বাচ্চা নাই; খাওয়া-পরার চিন্তা নাই। আল্লাহ্ তা'আলা সকল বিষয়ে তাহাকে নির্ঝঞ্ঝাট রাখিয়াছেন। তাহার উচিত ছিল, তস্‌বীহ্ হাতে নামাযের মোছাল্লায় বসিয়া আল্লাহ্‌র যেকের করা। অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করা। কিন্তু সে কখনও তাহা করিবে না; বরং কাহারও 'গীবত' (পশ্চাৎ নিন্দা) করিবে, কাহাকেও বুদ্ধি-পরামর্শ দিবে। তিনি যেন বুদ্ধির ঢিপি। প্রত্যেক কথায়ই নাক গলাইবার তালে থাকেন। স্মরণ রাখিবেনঃ বেশী বক বক করিলে সম্মান ও মর্যাদা হ্রাস পায়। যে স্ত্রীলোক অধিক কথা বলে না, কোন নির্জন স্থানে নীরবে বসিয়া নিরিবিলিভাবে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে, তাহাকে সকলে অতিশয় সম্মান এবং মর্যাদা দান করিয়া থাকে। কিন্তু যাহাদের কথার তামাক খাইবার অভ্যাস, তাহারা ইহা কি করিয়া ত্যাগ করিবে। অপমান হউক, লাঞ্ছনা হউক, কেহ তাহাদের কথার প্রতি কান না দিক, তাহাদের স্বভাব বক বক করা, তাহা করিবেই। যেমন, নমরূদ জুতার আঘাত খাইতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

নমরূদের পরিণামঃ নমরূদ নামক এক অতি প্রতাপশালী কাফের বাদশাহ্ 'খোদায়ী' দাবী করিয়াছিল। হযরত ইব্‌রাহীম নবী (আঃ) তাহাকে যত উপদেশ দিলেন ও বুঝাইলেন, সে কিছুই মানিল না। অবিরত আল্লাহ্‌র নাফরমানীই করিতে লাগিল এবং বলিলঃ তোমার খোদা সত্য হইয়া থাকিলে তাহাকে নিজের সৈন্যবাহিনী পাঠাইতে বল, আমি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিব। নমরূদ স্বীয় সৈন্যবলের জন্য গর্বিত ছিল, খোদার অস্তিত্বে তাহার আদৌ বিশ্বাস ছিল না। সে ইব্‌রাহীম আলাই-হিস্‌সালামকে নিতান্ত অসহায় বলিয়া মনে করিত। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) আল্লাহ্ পাকের নিকট হইতে ওহী প্রাপ্ত হইয়া নমরূদকে বলিলেনঃ প্রস্তুত হও, অমুক দিন আমার খোদার সৈন্য আসিয়া

পৌঁছিবে। নমরূদ নিজের সৈন্যবাহিনীকে যথাসময়ে প্রস্তুত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করিল এবং মনে করিতে লাগিল, বাস্তবিক কোন খোদাও নাই, কোন সৈন্যবাহিনীও আসিবে না। ইহা ইব্‌রাহীমের (আঃ) কল্পনামাত্র। অবশেষে কিছুক্ষণ পরেই একদিক হইতে এক ঝাঁক মশা আসিয়া এক এক সৈন্যের মস্তিষ্কের ভিতর এক একটি ঢুকিল এবং গোটা সৈন্যবাহিনী ধ্বংস করিয়া ফেলিল। এই দৃশ্য দেখিয়া নমরূদ প্রাণভয়ে দৌড়াইয়া রাজপ্রাসাদে ঢুকিল। একটি খোঁড়া মশা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহার নাকের ছিদ্র দিয়া মস্তিষ্কের ভিতর প্রবেশ করিল এবং তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন দংশনে তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। মস্তিষ্কের ব্যথা সহ্য করিতে না পারিয়া মস্তকে জুতার আঘাত করার জন্য এক চাকর নিযুক্ত করিল। যতক্ষণ জুতার আঘাত চলিত, ততক্ষণ সে কিঞ্চিৎ শান্তি বোধ করিত। তাহার দরবারে আগন্তুক প্রত্যেক লোক তাহাকে সালাম করিবার পরিবর্তে তাহার মস্তকে চারিটি জুতার ঘা মারিত। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে দেখাইয়া দিলেনঃ "তোর ক্ষমতা ও আড়ম্বরের বাহাদুরী এ পর্যন্তই। একটি মশক, তাও খোঁড়া, তোকে এমন অস্থির করিয়া তুলিল।"

এইরূপে যে পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক ধর্মের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রবৃত্তির কামনায় অযথা কার্যে বৃথা সময় নষ্ট করিয়া সন্তুষ্ট থাকে, খোদার শপথ করিয়া বলিতেছি—তাহা এই জুতা খাওয়ার সমতুল্য। কোন কোন পুরুষ লোককেও আমি দেখিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে যথেষ্ট অবসর দান করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা উহার সদ্ব্যবহার করে না। দিবারাত্র কেবল আড্ডা মারিয়া কিংবা কোন দোকানে বসিয়া পরের কুৎসা গাহিতেছে। কাহারও বংশ মর্যাদায় কলঙ্ক লেপন করিতেছে। কাহাকেও অযথা পরামর্শ দিতেছে, কাহারও প্রশংসা করিতেছে, কাহারও নিন্দা করিতেছে। যদি তাহাদিগকে কেহ বলে, "এ সমস্ত চর্চা না করিলে তোমাদের কিসের ঠেকা? ইহাতে তোমরা কাহারও কোন ক্ষতিও করিতে পার না। অযথা নিজের রসনা ও অন্তর অপবিত্র করিতেছ।" পক্ষান্তরে কোন কোন স্ত্রীলোক নিজে তো শয়তানী শিখিতেছে; আবার অপরকেও শিখাইতেছে। বউ-বেটিকে বলে, "দেখ বেটি! চোখের শক্তি অপরিসীম। চক্ষু হইতেই সকল কাজ উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেখিয়া-শুনিয়া শিক্ষা কর। তোমাকে সংসারধর্ম নির্বাহ করিতে হইবে।" ইহাদের উচিত ছিল এই অবসর সময়ে একান্তভাবে আল্লাহ্‌র শোকরগুযারী করা।

শেখ সাদী (রঃ) কোন একজন আবিল্যমুক্ত লোকের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। সে নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করিতে করিতে হজ্জে গমন করিতেছিলঃ

نـه بر اشتـر سوارم نه چوں اشتـر زیر بارم ـ نه خداونـد رعـیـت نه غلام شهـر یارم

"আমি উষ্ট্রারোহীও নই, উষ্ট্রের ন্যায় ভারবাহীও নই, প্রজাদের মালিকও নই, বাদশাহের আজ্ঞাবহও নই।" বিচিত্র ধরনের আযাদী বটে। সেই ব্যক্তি বড়ই সৌভাগ্যবান, যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তানের ঝামেলা হইতে মুক্ত রাখিয়াছেন। বিশেষত এই যুগের সন্তান। কেননা, ইহাদের দ্বারা সময় নষ্ট হওয়া ছাড়া ধর্ম-কর্মে কোন উপকারের আশা নাই। অবশ্য সন্তান যদি ধর্ম-কর্মের সহায় হইতে পারে, তবে সৌভাগ্যই বলিতে হইবে।

সুসন্তান নেয়ামতঃ কোন একজন বুযুর্গ লোক বিবাহবিমুখ ছিলেন। একদিন তিনি ঘুমাইতেছিলেন, হঠাৎ নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেনঃ এখানে কে আছ? শীঘ্র একটি কনে লইয়া আস। এক ভক্ত মুরীদ তথায় উপস্থিত ছিল, সে তাড়াতাড়ি তাহার বিবাহ-যোগ্যা মেয়ে

হাযির করিল, তৎক্ষণাৎ বিবাহ হইয়া গেল। কিছুদিন পর আল্লাহ্ পাক তাহাকে এক পুত্র-সন্তান দান করিলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই পুত্রটি মরিয়া গেল। তখন তিনি স্বীয় স্ত্রীকে বলিলেনঃ আমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। এখন তোমার দুনিয়া কাম্য হইলে আমি তোমাকে বিবাহ বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিতে পারি। তুমি কাহারও পাণি গ্রহণপূর্বক সুখে জীবন যাপন করিতে পার। যদি আল্লাহ্ তা'আলার এবাদতে ও যেকেরে জীবন কাটাইতে চাও, তবে এখানে থাক।

বুযুর্গ লোকের সংসর্গে থাকিয়া যেহেতু বিবির মধ্যে তাঁহার কিছু প্রভাব পড়িয়াছিল। অতএব, বিবি বলিলেনঃ আমি কোথাও যাইব না। অতঃপর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আল্লাহ্ তা'আলার যেকের ও এবাদত করিতে লাগিলেন। উক্ত বুযুর্গ লোকের জনৈক বিশিষ্ট মুরীদ জিজ্ঞাসা করিলেনঃ হুযূর, এরূপ করার তাৎপর্য কি? তিনি উত্তর করিলেনঃ আমি স্বপ্নে দেখিলাম, হাশর কায়েম হইয়াছে। পুল্‌সেরাতের উপর দিয়া মানুষ অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। এক ব্যক্তিকে দেখিলাম, পুলের উপর দিয়া চলিতে পারিতেছে না। কাঁপিতে কাঁপিতে চলিতেছে। তৎক্ষণাৎ এক শিশু আসিয়া তাহার হস্ত ধারণ করিল এবং নিমিষের মধ্যে তাহাকে পার করিয়া লইয়া গেল। আমি জিজ্ঞাসা করিলামঃ এই শিশুটি কে? উত্তর আসিল, তাহার ছেলে। শৈশবে ইহার মৃত্যু হইয়াছিল। আজ পুল্‌সেরাতে পিতার পথপ্রদর্শক হইয়াছে। অতঃপর আমার ঘুম ভাঙ্গিলে আমার ইচ্ছা হইল, আমি এমন নেয়ামত হইতে বঞ্চিত থাকিব না। হয়তো পুত্রই হাশরের দিন আমার নাজাতের উছিলা হইতে পারে। কাজেই আমি বিবাহ করিলাম। আল্লাহ্ তা'আলাও আমার মনস্কাম পূর্ণ করিলেন।

বলুন তো, পুত্রের মৃত্যুতে উদ্দেশ্য সফল হইল মনে করে এমন কোন আল্লাহ্র বান্দা কি আজও আছে? আজকাল কাহারও সন্তানের মৃত্যু হইলে তো বুক ফাটাইয়া কাঁদিয়া মরে। পুত্রের মৃত্যুতে উদ্দেশ্য সফল হইল বলিয়া মনে করার সাহস একমাত্র আল্লাহ্ওয়ালা লোকেরই হইতে পারে। মোটকথা, সন্তান মরিয়া কিংবা জীবিত থাকিয়া যদি পিতা-মাতার জন্য আখেরাতের সম্বল হইতে পারে, তবে সন্তান-সন্ততি অবশ্যই বড় নেয়ামত, অন্যথায় ভয়ঙ্কর বিপদ।

হযরত খিযির ও মূসা আলাইহিস্‌সালামের ঘটনা কোরআন শরীফে বর্ণিত আছে। হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম হযরত খিযির আলাইহিস্‌সালামের সহিত ভ্রমণ করিতেছিলেন। পথিমধ্যে খিযির আলাইহিস্‌সালাম ক্রীড়ারত ফুটফুটে শিশু ছেলেকে হত্যা করিয়া ফেলিলে মূসা আলাইহিস্‌সালাম বিস্মিত হইয়া বলিলেনঃ আপনি কি করিলেন? মূসা প্রথমে খিযির আলাইহিস্‌সালামের সাহচর্য প্রার্থনা করিলে তিনি এই শর্তে রাযী হইয়াছিলেন যে, মূসা আলাইহিস্‌সালাম তাঁহার কার্যের প্রতিবাদ করিতে পারিবেন না। অতএব, এস্থলে তিনি বলিলেনঃ আমি তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছিলাম, আমার কার্যকলাপ দেখিয়া তুমি ধৈর্য রক্ষা করিতে পারিবে না। অতঃপর তিনি শিশু হত্যার রহস্য বর্ণনা করিয়া বলিলেনঃ এই শিশুটির পিতা-মাতা পাকা ঈমানদার, শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কাফের হইত এবং তাহার মায়ার আকর্ষণে পিতা-মাতাও কাফের হইয়া যাইত। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছিল, পূর্বাহ্নেই ছেলেটিকে হত্যা করিয়া তৎপরিবর্তে তাহাদিগকে একটি নেককার ছেলে দান করা।

এই ঘটনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, যেসমস্ত শিশু শৈশবেই মরিয়া যায়, তাহাদের মৃত্যুতেই মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং খোদাভীরু লোক সন্তানের মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত হইলেও অধীর হয় না। আল্লাহ্ তা'আলার মহাজ্ঞানে বিশ্বাসী লোক কখনও কোন ব্যাপারে ধৈর্যচ্যুত হন না। পক্ষান্তরে তৎপ্রতি লক্ষ্যহীন লোক সন্তানের মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান হইয়া আক্ষেপ করিতে থাকে,

আহা! ছেলেটি বাঁচিলে বড় কাজের হইত। অন্তরে শোকের আগুন জ্বলিতে থাকে এবং আফসোস করিতে থাকে, ছেলেটির বড় অসাধারণ প্রতিভা ছিল ইত্যাদি।

বন্ধুগণ! আপনারা কেমন করিয়া জানেন, সে কি হইত বা না হইত? আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ মনে করুন, ইহাতেই মঙ্গল নিহিত বলিয়া বিশ্বাস রাখুন। হয়তো সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কাফের হইত এবং আপনাকেও কাফের করিয়া দিত। এ যুগে মানুষ একান্ত ব্যাকুল মনে সন্তান কামনা করে। স্মরণ রাখিবেন, সন্তান হওয়াও নেয়ামত, না হওয়াও নেয়ামত; বরং যাহার সন্তান জন্মে নাই কিংবা জন্মিয়া মরিয়া গিয়াছে, তাহাদের আরও অধিক শোকরগুযারী করা উচিত।

সন্তান মহাবিপদঃ কাহারও পক্ষে সন্তান মহাবিপদ হইয়া দাঁড়ায়। মোনাফেকদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ

لَاتُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآاَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ○

"হে মোহাম্মদ (দঃ)! মোনাফেকের ধন-সম্পত্তি এবং সন্তান-সন্ততি দেখিয়া আপনি বিস্মিত হইবেন না (ভাল মনে করিবেন না)! এই ছেলেপিলে ও ধন-সম্পদের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে পার্থিব জীবনেই শাস্তি প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন।"

বস্তুত কাহারও কাহারও জন্য সন্তান-সন্ততি আযাব হইয়া দাঁড়ায়। শৈশবে শিশুদের মল-মূত্রে মাতা-পিতার নামায বরবাদ হইয়া যায়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের জন্য নানা প্রকার চিন্তা-ভাবনা করিতে হয়। তাহাদের জীবিকানির্বাহে ভূমির প্রয়োজন, টাকা-পয়সার প্রয়োজন এবং বাসগৃহের প্রয়োজন, ধর্ম বজায় থাকুক বা না থাকুক তাহাদের জন্য দুনিয়া সঞ্চয় করিতেই হইবে। অহরহ এই চিন্তা-ভাবনার মধ্যেই থাকিতে হয়। হালাল-হারামের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। এমন সন্তান না হওয়াই নেয়ামত, নিঃসন্তান লোকের প্রতি আল্লাহ্‌র বড় নেয়ামত। সন্তান হইলে খোদা জানেন, তাহাদের কি অবস্থা ঘটিত, এরূপ লোকের উচিত কাহারও কোন ব্যাপার লইয়া মাথা না ঘামাইয়া নির্জনে বসিয়া আল্লাহ্ আল্লাহ্ করা।

এ কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকেরা বলিয়া থাকেঃ "কেহ শান্তিতে বসিতে দিলে তো বসিয়া থাকিব? আমি বলিঃ তুমি মুখ বন্ধ করিয়া বসিলে কাহার কি মাথা ব্যথা যে, তোমার শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাইবে? স্মরণ রাখিবেন, অধিকাংশ অনর্থ এবং পাপ এই কথা বলার কারণেই ঘটিয়া থাকে।

কথা কম বলার উপকারিতাঃ হাদীস শরীফে আছেঃ مَنْ سَكَتَ سَلِمَ "যে চুপ করিয়া থাকে, নিরাপদে থাকে।" কোন এক শাহ্‌যাদা হাদীসের কিতাব পড়িত, এই হাদীসটি পড়িয়া ওস্তাদকে জিজ্ঞাসা করিলঃ জনাব! আমি আর সম্মুখের দিকে এক বর্ণও পড়িব না। এই হাদীস মোতাবেক আমল করিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হইব। তখন হইতে সে কথা বলা বন্ধ করিয়া দিল, ইহাতে বাদশাহ্ অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। মনে করিলেনঃ সম্ভবত ছেলের উপর জ্বিনের আসর হইয়াছে। তাবীয-তুমারের তদবীরকারী খন্দকারগণ আসিয়া বহু চেষ্টা করিলেন। চিকিৎসকগণও বিভিন্ন প্রকারের চিকিৎসায় ত্রুটি করেন নাই। অবশেষে সিদ্ধান্ত হইল, তাহাকে শিকারে লইয়া গেলে আমোদ-আহ্লাদে থাকিয়া স্বাস্থ্য ঠিক হইয়া যাইবে।

সুতরাং এক নির্দিষ্ট সময়ে তাহাকে লইয়া সকলে শিকারী বাহির হইল। শিকারীগণ বিভিন্ন প্রাণীর প্রতি তীর-বন্দুক ছুঁড়িতে লাগিল। নিকটেই এক ঝোঁপের মধ্যে একটি তীতর পাখী

লুক্কায়িত ছিল। সে আওয়ায দিল, শব্দ পাইতেই শিকারীরা তাহাকে তীর ছুঁড়িয়া শিকার করিয়া ফেলিল। ইহা দেখিয়া শাহ্‌যাদা বলিলঃ হতভাগা শব্দ না করিলে মারা পড়িত না। শাহ্‌যাদার মুখে এতটুকু কথা শুনিতেই আনন্দের রোল পড়িয়া গেল। বাদশাহ্‌ সংবাদ পাইয়া পুনরায় শাহ্‌যাদার দ্বারা কথা বলাইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সে আর একটি শব্দও বলিল না। বাদশাহ্‌ আদেশ করিলেনঃ ইহাকে বাঁধিয়া প্রহার কর। মনে হয় সে ইচ্ছা করিয়া কথা বলিতেছে না। সকলে তাহাকে প্রহার আরম্ভ করিল! শাহ্‌যাদা মনে মনে বলিলঃ একবার কথা বলার ফলে আমার এই বিপদ। পুনরায় কথা বলিলে আল্লাহ্‌ জানেন, আমার কি হাশর হইবে। অতঃপর সে সারাজীবনে আর কথা বলে নাই।

বাস্তবিকপক্ষে এই রসনার দরুনই আমাদের দ্বারা অধিকাংশ পাপ কার্য সাধিত হইয়া থাকে। বিশেষত স্ত্রীলোকদের তো বক্‌ বক্‌ করার এত শখ যে, কোন স্থানে বসিয়া কথা জুড়িয়া দিলে উহা আর শেষ হয় না। আল্লাহ্‌ জানেন, তাহাদের কথার সূত্র এত দীর্ঘ হয় কেন? ইহারা কথায় মশগুল হইলে তাহাদিগকে দেখিয়া মনে হয়, ইহাদের আসল উদ্দেশ্যই হইল কথা বলা। তাহারা এমন রসিকতার সহিত কথা বলিতে থাকে যে, মনে হয় তাহারা বহু আকাঙ্ক্ষার পর এই মহাধন লাভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে পুরুষদের কথাবার্তা ও কার্যকলাপের ধরন দেখিলে বুঝা যায়, তাহারা এই কাজ তাড়াতাড়ি সমাধা করিয়া অপর কাজে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে নিজেদের বিবেক-বুদ্ধির সংশোধন করুন, وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَّا عَقْلَ لَهٗ কথার মর্ম ইহাই। শুধু মাল সঞ্চয় করা দুনিয়া নহে।

আমার এই বর্ণনা দ্বারা সন্তান-সন্ততির পিতা-মাতাগণ এবং সংসারের সহিত নানাবিধ সম্পর্কে জড়িত লোকগণ নিজদিগকে অপারক মনে করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া পড়িবেন না। স্মরণ রাখিবেন, আপনারাও অনেকগুলি অনর্থক সম্পর্ক বাড়াইয়া ফেলিয়াছেন। তাহাও এমন যে, যখন ইচ্ছা কমাইয়া ফেলিতে পারেন। অবশ্য একান্ত প্রয়োজনীয় কার্যগুলি কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত বটে। তাহাতে মশগুল হওয়াও এবাদত বলিয়া গণ্য হইবে। শুধু যেসমস্ত সম্পর্ক কেবলমাত্র দুনিয়ার সহিত, তাহাই আপনাদিগকে বর্জন করিতে বলা হইতেছে। আমার কথার উদ্দেশ্য এই নহে যে, আপনারা অপারক; আপনারা অপারক মোটেই নহেন। আমি কেবল ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সত্যিকারের ঝামেলাবিশিষ্ট লোকদের তো গ্রহণযোগ্য না হইলেও একটা ওযর আছে; কিন্তু যাহাদের কোন ঝামেলা নাই, তাহাদের তো এই ওযরও নাই। ফলকথা, দুনিয়ার ঝামেলায় জড়িত এবং ঝামেলামুক্ত সকলকেই দুনিয়ার সম্পর্ক বর্জন করিতে বলা হইতেছে।

এতটুকুই আজ আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই স্মরণ রাখিবেন এবং তদনুযায়ী আমল করিতে আরম্ভ করিবেন। আজকালের দস্তুর এই হইয়াছে যে, ওয়ায শুনিয়া অশ্রু বর্ষণ করিয়া থাকে, হা-হুতাশ করে এবং বলে, আমাদের গতি কি?

বন্ধুগণ! এ সকল কথায় ফল নাই। কাজ করিলে ফল পাওয়া যাইবে। কাজ করুন, কথায় বাহাদুরী দেখাইবেন না। আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করুন, তিনি কাজের তাওফীক দান করুন। আমীন!

—■—

থানাভুন্‌ শহর, হাফেয যরীফ আহ্‌মদ ছাহেবের গৃহ,
১৩৩২ হিজরী, ১৭ই রবিউস্‌সানী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَ سَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ ○

এই বিষয়টি অবলম্বনের কারণ

অদ্যকার মজলিসে আলোচনার নিমিত্ত যে বাক্যটি আমি পাঠ করিলাম, তাহা একটি হাদীস। অর্থাৎ, হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী। ইহার এবারত অতি মহৎ এবং বিষয়বস্তু একান্ত প্রয়োজনীয়। সর্বক্ষেত্রে প্রত্যেকটি মানুষেরই ইহা প্রয়োজন হয়। সুতরাং হাদীসটির ক্ষুদ্রতার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া ইহার অন্তর্নিহিত অর্থের গুরুত্ব ও মহত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করুন। বিষয়টি অতি প্রয়োজনীয়, বিশেষ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। ইহা যদিও নূতন বিষয় নহে; বরং এই হাদীসটির এবারত বা অর্থ হয়তো আপনারা বহুবার শুনিয়া থাকিবেন। এই কারণে আপনাদের এরূপ মনে করা বিচিত্র নহে যে, এই পুরাতন ও বহু বিশ্রুত বিষয়টি অদ্যকার ওয়াযের জন্য মনোনীত করা হইল? আমাদের অজানা কোন নূতন বিষয় অবলম্বন করা উচিত ছিল।।

বন্ধুগণ! এরূপ কল্পনা করা আপনাদের তরফ হইতে মূর্খতার পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নহে। আমি আপনাদিগকে মূর্খ বা অজ্ঞ মনে করিয়া এই বিষয়টি মনোনয়ন করি নাই। আমি আপনাদিগকে জ্ঞানীই মনে করি এবং জ্ঞানী মনে করিয়াই কোন নূতন বিষয় অবলম্বন করি নাই। যে ওয়ায়েয তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীকে অজ্ঞ মনে করেন, তিনি তাহাদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য এমন কোন নূতন বিষয় অবলম্বনে ওয়ায করিয়া থাকেন, যাহাতে তাহাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

আর যে বক্তা নিজের শ্রোতৃবৃন্দকে জ্ঞানী মনে করেন, বক্তৃতার বিষয়বস্তু অবলম্বনের প্রতি তেমন গুরুত্ব প্রদান করেন না। ইহা কেবলমাত্র আমার সু-ধারণা নহে; বরং বাস্তব সত্য। কেননা, শরীঅতের বিধান সীমাবদ্ধ, সীমাহীন নহে। মানুষ অতি অল্প সময়েও শরীঅতের যাবতীয় বিধান সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিতে পারে। অদ্যকার মজলিসের শ্রোতাগণ আজীবন শরীঅতের

আহ্‌কাম শুনিয়া আসিতেছেন, তাহাদের নিকট ধর্মীয় কোন বিষয়ই নূতন হইতে পারে না। সুতরাং কোন নূতন বিষয়ের কামনা করার অর্থ নিজেদের প্রতি অজ্ঞানতার সম্বন্ধ আরোপ করা। কাজেই নূতন বিষয় অবলম্বনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা উচিত নহে। যখন আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদিগকে জ্ঞানী করিয়াছেন, তখন মূর্খতার সম্বন্ধ নিজেদের প্রতি আরোপ করিবেন কেন?

এখন বিবেচ্য এই যে, অদ্যকার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আপনাদিগকে জ্ঞানী কল্পনা করিয়াও ইহা অবলম্বনের ফায়দা কি? ফায়দা কয়েকটি আছে। কোন অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞান দান করাতেই ফায়দা সীমাবদ্ধ নহে, জ্ঞাত বিষয় হইতে গাফেল হইয়া পড়িলে তাহা দূর করাও এক উপকারিতা বটে; বরং ইহার গুরুত্ব আরও অধিক। কেননা, অজ্ঞাত বিষয় জানাইয়া দেওয়ামাত্র তদনুযায়ী আমল করার আশা অতি সন্নিকটে, পক্ষান্তরে কোন বিষয়ের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তদনুযায়ী আমল না করা মারাত্মক। ইহাতেই রহিয়াছে সমধিক ত্রুটি। কেননা, জানিয়াও যখন আমল করা হয় না, তখন আর কিসের অপেক্ষা?

আরও একটি উপকারিতা এই যে, একটি বিষয় এক উপায়ে জানা আছে; কিন্তু বিষয়টির জ্ঞান লাভ করার আরও অধিকতর ফলপ্রসূ অন্য একটি উপায়ও আছে। সুতরাং অধিক জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে বিষয়টিকে উক্ত ফলপ্রসূ উপায়ে পুনরায় বর্ণনা করিলে নূতন উপকারিতা নিশ্চয়ই হইবে।

এতদ্ভিন্ন কখনও কখনও কোন বিষয় সম্বন্ধে পূর্বলব্ধ জ্ঞান মোটামুটি হয়। ইহাকে পুনরায় বিশদভাবে বর্ণনা করিলে তাহা অন্তরে দৃঢ়ভাবে বসিবে। ইহাও একটি নূতন ফায়দা।

একেবারে ফায়দা ব্যতীত নিছক দ্বিরুক্তিতেও উপকারিতা আছে। কেননা, কোন বিষয়কে বার বার বর্ণনা করিলে উহা জোরদার হয় এবং উহার শক্তি বৃদ্ধি পায়।

অদ্যকার বিষয়বস্তুটি বহুবার আপনাদের শ্রুতিগোচর হইয়া থাকিলেও আমি আজ যেই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বর্ণনা করিব, সেই ভঙ্গিতে আপনারা ইহা কখনও শ্রবণ করেন নাই। সুতরাং ইহাকে এক হিসাবে পুরাতন এবং অন্য হিসাবে নূতন বলিতে পারেন। বস্তুত ইহা একটি পুরাতন বিষয়। কিন্তু বর্ণনাভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ নূতন, আপনারা ইহাকে পুরাতন মনে করিয়া শ্রবণ করিলে আপনার রুচির অনুকূল হইবে। মোটকথা, আজিকার বিষয়টি সর্বদিক দিয়াই নিতান্ত হিতকর। বিষয়টির অবস্থা এইরূপঃ

بهار عالم حسنش دل وجاں تازه می دارد ـ برنگ اصحاب صورت را بهبو ارباب معانی را

"তাঁহার সৌন্দর্যের বাহার মন-প্রাণকে সতেজ রাখে, বাহ্যিক রূপ দর্শনকারীর অন্তরকে রং দ্বারা, অর্থ হৃদয়ঙ্গমকারীকে নিজের সুগন্ধ দ্বারা।

দুনিয়াবাসী মুসাফিরঃ আলোচ্য হাদীসটির অর্থ "রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ দুনিয়াতে এইরূপ অবস্থান কর যেন তুমি মুসাফির; বরং পথচারী মুসাফির।" মুসাফির দুই প্রকার। ১। কিছুদিন সফরের পর আবার কিছুদিনের জন্য কোন স্থানে অবস্থানকারী। ২। কোন স্থানে অবস্থান না করিয়া অবিরত পথ অতিক্রমকারী। ইহারা কোন স্থানে দুই-এক মিনিট বা এক-আধ ঘণ্টার জন্য বিশ্রাম করিলে তাহা ধর্তব্য নহে। প্রথম প্রকারের মুসাফিরকে মুকীমও বলা যায়। উভয় প্রকার মুসাফিরের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথম প্রকারের অবস্থা কতকটা স্থিতিশীল এবং দ্বিতীয় প্রকারের অবস্থায় কোন স্থায়িত্ব নাই। হুযূর (দঃ) প্রথম প্রকারকে غَرِيْبٌ (স্বল্প বিশ্রান্ত মুসাফির) এবং দ্বিতীয় প্রকারকে عَابِرُ سَبِيْلٍ (অবিশ্রান্ত পথচারী) বলিয়াছেন। দুনিয়ার

মানুষকে লক্ষ্য করিয়া হুযূর (দঃ) এই হাদীসে প্রথমতঃ বলিয়াছেনঃ "তুমি দুনিয়াতে এইরূপ বাস কর যেন ক্ষণস্থায়ী মুসাফির।" অতঃপর আরও বাড়াইয়া বলিয়াছেনঃ "বরং পথচারী মুসাফির, যাহারা কোথাও বিশ্রাম করে না।" এই হাদীসটি শ্রবণ করিয়া প্রত্যেকে বলিবে, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌! আমরা এই হাদীস অনুযায়ী আমল করিতেছি। আমরা তো নিজদিগকে সামান্য কয়েকদিনের জন্য ইহজগতের মুসাফির মনে করিতেছি। দুনিয়াতে আমরা চিরস্থায়ী হইয়া থাকিব, এমন কখনও মনে করি না।

সকলেই মৃত্যুতে বিশ্বাসীঃ মুসলমান তো দূরের কথা, কাফেরেরা এবং (স্রষ্টা ও কিয়ামতের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী) নাস্তিকগণও মৃত্যু বিশ্বাস করিয়া থাকে। বস্তুত ইহা এ কথারই সদৃশ—কেহ কেহ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে সন্দেহ করে বটে; কিন্তু মৃত্যু সম্বন্ধে তাহাদের কোন সন্দেহ নাই। দুনিয়া হইতে লোকান্তরিত হওয়া সর্ববাদিসম্মত। খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী লোকেরাও মৃত্যু বিশ্বাস করে; বরং মৃত্যু সম্বন্ধে তাহাদের বিশ্বাস মুসলমানদের চেয়েও বেশী। কেননা, মুসলমানগণ মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানে বিশ্বাসী। সুতরাং তাহাদের মতে মৃত্যু স্থায়ী নহে। পক্ষান্তরে খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী মুল্‌হেদ্‌রা সৃষ্টিকর্তা ও পুনরুত্থানে বিশ্বাসী নহে বলিয়া তাহাদের মতে মৃত্যু স্থায়ী, পূর্ণাঙ্গ। ফলকথা, মৃত্যুর প্রতি মুল্‌হেদগণের বিশ্বাস মুসলমানদের চেয়ে অধিক। বিচিত্র তামাশা বটে! এমন অনেক লোক আছে যাহারা খোদা, রাসূল, ফেরেশ্‌তা, কিয়ামত প্রভৃতি কোন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করে না; কিন্তু মৃত্যুতে অবিশ্বাসী কেহই নহে।

বন্ধুগণ! যে বস্তু কাফেরেরাও অবিশ্বাস করে না, আপনাদের মধ্যে সে বস্তুর প্রতি অবিশ্বাসের নিদর্শন দেখা গেলে তাহা কি আফসোসের বিষয় নহে? আপনারা হয়তো বলিতে পারেন, কিসে আমরা মৃত্যুর প্রতি অবিশ্বাসী হইলাম? তবে শুনুন, মুখে ইহা কেহই অবিশ্বাস করে না। আপনারা কেমন করিয়া ইহাকে অবিশ্বাস করিতে পারেন?

তবে জ্ঞান অনুযায়ী আ'মল নাইঃ আপনারা মুখে বলিতেছেন, মৃত্যু অবিশ্বাস করেন না; কিন্তু নিজেদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করুন, আপনাদের কার্যকলাপে উহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রমাণ পাওয়া যায়। আপনাদের মধ্যে মৃত্যুকে অবিশ্বাস করার নিদর্শন বা চিহ্ন বিরাজমান কিনা, নিম্নের দৃষ্টান্ত হইতে তাহা বুঝিয়া লউন। দেখুন, জ্বলন্ত আগুনের কয়লা কেহ হাতে লইলে ইহা বুঝা যাইবে যে, এই ব্যক্তি আগুনের দাহিকা শক্তিতে বিশ্বাসী নহে। বিষধর সাপ কেহ ধরিতে গেলে ইহাই বলা হইবে যে, এই ব্যক্তি সর্প চিনে না। কেহ সর্প ধরিতে উদ্যত লোককে দেখিলে বলিয়া থাকেঃ "দেখ, কি কর? এটা সাপ! সাপ!" তাহার সহিত এমনভাবে কথা হয়, যেন সে সর্প চিনে না।" চিনিলেও তাহার কার্য অজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় বলিয়া তাহার সহিত এমনভাবে কথা বলা হয়, যেরূপ অজ্ঞ ব্যক্তির সহিত বলা হইয়া থাকে। এইরূপে যদি কেহ বাপের সহিত ধৃষ্টতামূলক আচরণ করে, তখন দর্শক বলিয়া থাকে, ইনি তোমার পিতা। অথচ পুত্র অবশ্যই জানে যে, সে বাপের সহিত ধৃষ্টতাচরণ করিতেছে। কিন্তু জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করে নাই বলিয়া তাহাকে অজ্ঞানের স্থানে মনে করিয়া তাহার সহিত অজ্ঞ লোকের ন্যায় কথা বলা হইয়া থাকে।

এখন আমি দোষারোপ করিতে পারি—হে মুসলমান! খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী মুল্‌হেদ যে বস্তু অবিশ্বাস করে না, আফসোস, আপনারা তাহা অবিশ্বাস করিতেছেন, কেহ বা অবস্থায়, কেহ বা মুখে আর কেহ বা কাজে অবিশ্বাসের পরিচয় দিতেছেন। মুল্‌হেদরা মৃত্যুকে সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস করিলেও বিস্ময়ের কিছু ছিল না। কেননা, তাহাদের ধারণা—মৃত্যু বা মৃত্যুর পরবর্তী-

কালের যাবতীয় বিষয়ের প্রতি অবিশ্বাস দণ্ডনীয় নহে। আপনারা তো উহাকে দণ্ডনীয় বলিয়া বিশ্বাস করেন, আপনারা উহাকে সামান্য অবিশ্বাস করিলেও তাহা পরিতাপের বিষয় বটে। এইমাত্র আমি বলিয়াছি, জ্ঞান অনুযায়ী কাজ না করিলে অজ্ঞ বলিয়া গণ্য করা হয়। বাস্তবিকপক্ষে আমাদের কার্যকলাপে মৃত্যুতে আমাদের বিশ্বাস আছে বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায় না। কেননা, মৃত্যু আমরা যথার্থই বিশ্বাস করি বটে; কিন্তু তদনুযায়ী কার্য করি না। এখন মোটামুটি বুঝা গেল, আমাদের বিশ্বাসে ও কাজে ত্রুটি আছে। ইহাকে আরও বিশদভাবে বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুনঃ

আমাদের মধ্যে কাহাকেও যদি প্রশ্ন করা যায়, তুমি কি দুনিয়াতে চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে? তৎক্ষণাৎ উত্তর করিবেঃ দুনিয়াতে কেহ স্থায়ীভাবে থাকিতে পারে? একদিন মরিতে হইবেই।

কিন্তু অবস্থা এরূপ— اَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ "সামান-উপকরণ এমনিভাবে প্রস্তুত করিতেছ, যেন এখানে চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে?"

নিজের জন্যও এবং নিজের উত্তরাধিকারীদের জন্যও চিরস্থায়ী উপকরণের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। দেখিলে মনে হয়, খোদা তা'আলাকে অক্ষম মনে করিতেছি, তিনি যেন আমার ব্যবস্থার বিপরীত করিতে পারিবেন না। نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْهُ

দৃঢ় চিত্ত বুযুর্গ লোকের দৃষ্টান্তঃ একটি দৃষ্টান্ত হইতে একথাটি পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন। কিছুদিন পূর্বে দেশে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছিল। ভাবিয়া দেখুন, তখন মানুষের মনের অবস্থা কেমন ছিল? দুই কারণে তখনও কোন কোন লোকের চিত্ত খুব দৃঢ় ছিল—১। এক কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তাঁহাদের নির্ভর খুব দৃঢ় ছিল। যাহাকিছু ঘটে আল্লাহ্‌র হুকুমেই ঘটিয়া থাকে। খোদার হুকুম ব্যতীত মৃত্যু কখনও আসে না। সুতরাং মহামারীর সময়েও তাঁহারা শান্ত এবং রোগমুক্ত সময়ের ন্যায় নিশ্চিন্ত থাকেন, তাঁহারা মৃত্যুকে খোদার হুকুমের অধীন বলিয়া বিশ্বাস করেন। কাজেই সকল সময়কে সমান মনে করেন। ইহাকে বলে মনোবল। সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে যখন চতুর্দিকে সারি সারি সৈন্যদের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছিল, তখন হযরত আলী (রাঃ) যুদ্ধক্ষেত্রে স্বীয় অশ্বের উপরে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছিলেন। সময় সময় তাঁহার হস্ত হইতে তলোয়ারও পড়িয়া যাইত। কেহ আসিয়া বলিলঃ "আমীরুল মুমিনীন। এমন ভয়ঙ্কর অবস্থায় আপনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছেন? একটু সতর্ক থাকুন, শত্রুপক্ষের আক্রমণ বড় সাংঘাতিক। তিনি উত্তর করিলেনঃ

اَىُّ يَوْمَيْنِ مِنَ الْمَـوْتِ اَفِـرُّ ـ يَوْمَ لَايُــقَــدَّرُ اَوْ يَــوْمَ قُدِّرَ

يَوْمَ لَا يُقَـدَّرُ لَايَأْتِى الْقَضَا ـ يَوْمَ قَدْ قُدِّرَ لَايُغْنِى الْحَــذَرُ

যেদিন মৃত্যু নির্ধারিত আছে এবং যেদিন নির্ধারিত নাই, এই দুই দিনের কোন্ দিন মৃত্যু হইতে পালাইয়া থাকিব? যেদিন মৃত্যু নির্ধারিত নহে, সেদিন মৃত্যু আসিতেই পারে না। আর যেদিন নির্ধারিত আছে, সেদিন সতর্কতাও কোন কাজে আসিবে না।

আরও শুনুন, একদিন ইমাম মালেক (রঃ) হাদীস পড়াইতেছিলেন, একটি বিচ্ছু এক এক করিয়া তাঁহাকে ১১ বার দংশন করিল, কিন্তু তিনি একটু উঃ আঃ না করিয়া বরাবর হাদীস পড়াইতে থাকিলেন। তাঁহার মত লোকের চিত্তেই এমন দৃঢ়তা সম্ভব। ১১ বার বিচ্ছুর দংশনেও হাদীস পড়ান ত্যাগ করেন নাই। এরূপ কথা বলা খুবই সহজ, কিন্তু তেমন মনোবল কয়জনের আছে?

বলিতে তো এখন আমিও বলিলাম; কিন্তু এখনই যদি একটি বিচ্ছু বাহির হইয়া আসে, তবে সম্ভবত আমিই সকলের আগে পালাইব। ইমাম মালেক (রঃ) হাদীস পড়ান শেষ করিলে খাদেম জিজ্ঞাসা করিল, হাদীস পড়াইবার সময় আপনার চেহারার রং পরিবর্তিত হইতেছিল কেন? তিনি বলিলেনঃ ১১ বার আমাকে বিচ্ছু দংশন করিয়াছিল; কিন্তু আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের হাদীসের আদব রক্ষার্থে স্থান ত্যাগ করিয়া উঠি নাই। এখন উহাকে অনুসন্ধান করিয়া মারিয়া ফেল। তৎক্ষণাৎ তালাশ করিয়া উহাকে মারিয়া ফেলা হইল। ইহাও আল্লাহ্ তা'আলার সেই পবিত্রমনা বান্দার মন ছিল। ইহারই নাম মনোবল।

মহামারীর সময় আর একদল লোক এই কারণে নিশ্চিন্ত থাকে যে, তাহারা মনে করে, সংসা-রের নিয়মই এইরূপ, কেহ্ মরে কেহ্ বাঁচে। যাহার ভিতরে প্লেগের জীবাণু প্রবেশ করে সে মরিয়া যায়। আর যে ব্যক্তি নিজের দেহকে সতর্কতার সহিত রক্ষা করিয়া চলে সে রক্ষা পায়। অর্থাৎ, আমরা স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম পালন করিতেছি, প্লেগ রোগ আমাদিগকে আক্রমণ করিবে না। ইহাই হইল কঠিন অন্তর, যে সম্বন্ধে হাদীসে বর্ণিত আছেঃ اَبْعَدُ شَيْءٍ عِنْدَ اللهِ الْقَلْبُ الْقَاسِىْ ـ "কঠিন হৃদয় আল্লাহ্ তা'আলা হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক দূরবর্তী।" তাহাতে খোদার ভয়ও নাই, মহব্বতও নাই। ইহা হইল বলিষ্ঠ হৃদয় এবং কঠিন হৃদয় লোকের অবস্থা। কিন্তু যাহাদের অন্তর দুর্বল, আর এরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক, প্লেগের সময় তাহাদের চেহারায় নৈরাশ্যের ছায়া বিরাজমান ছিল। দোকানের কাজও চলিতেছিল, গৃহিণীরা যথারীতি পাক-শাকের কাজও করিতে-ছিল। জমিদারেরা খাজনার তাগাদা এবং নালিশও করিতেছিল। কিন্তু কাহারও মন কোন কাজে বসিতেছিল না। কেবল মৃত্যুর ছবি সকলেরই চোখের সামনে ভাসিয়া বেড়াইত। ভাবিত—কখন ডাক আসিয়া পড়ে। দুনিয়া হইতে প্রত্যেকেরই মন উঠিয়া গিয়াছিল। কোন বস্তুর সঙ্গে মনের আকর্ষণ বা সম্পর্ক ছিল না। এই কারণে বহুসংখ্যক বেনামাযী তৎকালে নামাযী এবং ধার্মিক হইয়া পড়িয়াছিল। এই অবস্থাটি যদি প্রত্যেক সময় আমাদের থাকিত, তবে ইহা 'দুনিয়াতে তোমরা ক্ষণ-স্থায়ী মুসাফিরের ন্যায় অবস্থান কর'-এর কিছু নমুনা হইত। তাহা না হইলে বুঝিতে হইবে, আমরা আখেরাত ভুলিয়া বসিয়াছি। কিন্তু মানুষের বিরূপ অবস্থার নিন্দাবাদে আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেনঃ

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖۤ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا ج فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَاۤ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ط كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

মানুষের উপর যখন কোন বিপদ আপতিত হয়, তখন তাহারা শুইয়াও বসিয়াও এবং দাঁড়াইয়া-ও আমাকে ডাকিতে আরম্ভ করে (যেমন, মহামারীর সময় বেনামাযীও নামায পড়িতে আরম্ভ করে।) অতঃপর যখন আমি তাহার সেই বিপদ মোচন করিয়া দেই, তখন সে পুনরায় পূর্ব অবস্থায় আসিয়া পড়ে। (পুনরায় ধান্দাবাজি ও ফালাফালি আরম্ভ করিয়া দেয়। অর্থাৎ, দুনিয়ার ঝামেলায় লিপ্ত হইয়া পড়ে। এখন আর নামাযও নাই, রোযাও নাই।) মনে হয়, তাহার উপর যে বিপদ আসিয়াছিল তাহা মোচনের জন্য কখনও আমাকে ডাকে নাই। এই সীমালঙ্ঘনকারীদের কাজ তাহাদের নিকট এইরূপে ভাল ও সুন্দর বলিয়া বোধ হয়।

বন্ধুগণ! মহামারীর সময় মানুষের মনের অবস্থা যেরূপ হইয়া থাকে, ভাগ্যক্রমে আমরা সে অবস্থা লাভ করিতে পারিলে উহার স্বাদ বুঝিতে পারিতাম। উপরোক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও ইচ্ছা করেন নাই যে, আপনারা সাংসারিক সর্বপ্রকারের কাজকর্ম ছাড়িয়া সংসারবিরাগী হইয়া পড়েন; বরং তাঁহার ইচ্ছা এই ছিল যে, আপনারা সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করুন, কিন্তু আপনাদের মনের অবস্থা হুবহু মহামারীর সময়ের অবস্থার ন্যায় হউক যে, কোন কাজের প্রতি মন আকৃষ্ট না থাকে এবং দুনিয়ার সঙ্গে মনের কোন সম্পর্ক স্থাপিত না হয়। বলুন তো মহামারীর সময় মানুষের কোন কাজ ছুটিয়াছিল? একটাও না। অবশ্য গোনাহ্‌র কাজ বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। বস্তুত হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাই চান যে, সারা-জীবন ব্যাপিয়া আপনারা এইরূপ থাকুন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ

يَا عَبْدَ اللهِ اِذَا اَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ وَاِذَا اَمْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ اَهْلِ الْقُبُوْرِ ○

"হে আবদুল্লাহ্ (ইব্‌নে-আম্‌র)! তুমি প্রাতঃকালে উপনীত হইলে সন্ধ্যাকালের কল্পনা মনে স্থান দিও না এবং সন্ধ্যাকালে উপনীত হইতে প্রাতঃকালের কল্পনা মনে আনিও না এবং নিজকে কবর-বাসী বলিয়া গণ্য কর।" অর্থাৎ, অনাবশ্যক ও অলীক কল্পনা করিও না যে, সন্ধ্যায় এটা করিব. ওটা করিব এবং ভোরে এরূপ করিব, ওরূপ করিব। এই হাদীসে এতটুকু কথা স্পষ্টরূপে উক্ত না থাকিলেও এক হাদীস অপর হাদীসের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। হুযূরে আকরাম (দঃ) অপর এক হাদীসে উহা স্পষ্টরূপে বলিয়া দিয়াছেনঃ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَايَعْنِيْهِ "মানু-ষের উত্তম ইসলাম অনাবশ্যক কার্য বর্জন করা।" এই হাদীসে তিনি মানুষকে অনাবশ্যক কার্য পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, প্রয়োজনীয় এবং হিতকর কার্য ত্যাগ করা জরুরী নহে। কাজেই প্রয়োজনীয় কল্পনা করার অনুমতি রহিয়াছে। যেমন, কাহারও কাহারও নিকট ঋণী থাকিলে উহা পরিশোধ ব্যবস্থার চিন্তা করা ওয়াজেব; ইহা নিষিদ্ধ নহে। অবশ্য শেখ চুল্লীর ন্যায় ভবিষ্যতের ভিত্তিহীন কল্পনার ইমারত গড়িয়া তোলা নিষিদ্ধ।

শেখ চুল্লীর ঘটনাঃ শেখ চুল্লী দুই পয়সা মজুরির বিনিময়ে কোন এক ব্যক্তির এক কলসী তৈল মাথায় বহন করিয়া যাইতে যাইতে কল্পনা করিতে লাগিল, এই দুই পয়সা দ্বারা দুইটি ডিম খরিদ করিয়া তাহা মুরগীর নীচে রাখিব, তাহাতে দুইটি বাচ্চা পাওয়া যাইবে, একটি মোরগ এবং একটি মুরগী। পয়সা না পাইতে মুরগীর বাচ্চা উৎপন্ন হইতে লাগিল। তাহাও নিজের হিসাব অনুযায়ী একটা মোরগ আর একটি মুরগী। অতঃপর উহাদের ডিম ও বাচ্চা হইতে থাকিবে। ফলে আমি অনেক মোরগ ও মুরগীর মালিক হইব। আমি সেগুলি বিক্রয় করিয়া একটি বকরী খরিদ করিব। উহার বংশ বৃদ্ধি পাইলে সেগুলি বিক্রয় করিয়া একটি গাভী খরিদ করিব। উহার বংশ বৃদ্ধি পাইলে সেগুলি বিক্রয় করিয়া একটি মহিষ ক্রয় করিব। বংশ বৃদ্ধি পাইয়া মহিষের সংখ্যা প্রচুর হইলে তাহা বিক্রয় করিয়া একটি বড় দোকান খুলিব এবং খুব লাভবান হইয়া অল্প দিনে ধনী হইতে পারিব। অতঃপর বিরাট একটি অট্টালিকা নির্মাণ করিব এবং উযীর তনয়ার সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইব। বিবাহ অবশ্যই হইয়া যাইবে এবং তাহার গর্ভে আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে। পুত্র একটু বয়স্ক হইলে আমার সঙ্গে থাকিবে এবং পয়সার জন্য বায়না ধরিবে। আমি বলিব, 'হট'। হট্ বলার সাথেই মাথা একটু নড়িল এবং তৎক্ষণাৎ তৈলের কলসীটি মাটিতে পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল। মালিক ধমক দিয়া বলিলঃ "আরে! কি করিলি?" সে বলিল, যাও

মিঞা, তোমার তো মাত্র চারি-পাঁচ সের তৈল নষ্ট হইয়াছে, "আমার তো গোটা পরিবারই ধ্বংস হইয়া গেল।" (কেননা, তাহার এই আকাশ-কুসুম চিন্তার মূলে ছিল ঐ মজুরির দুইটি পয়সা। কলসী ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ফলে মজুরি হাতছাড়া হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে কল্পিত গোটা সংসারটাই বিনষ্ট হইল।) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরূপ ভিত্তিহীন অলীক কল্পনাই নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

শেখ সা'দীর ঘটনাঃ শেখ সা'দী (রঃ) লিখিয়াছেনঃ "এক রাত্রে কোন এক ব্যবসায়ীর গৃহে আমার প্রবাস করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। তাহার ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্য, চাকর-নওকর ও দাস-দাসী প্রচুর ছিল। সে ব্যক্তি সারারাত্রি আমাকে বিরক্ত করিয়া মারিল। বলিতে লাগিলঃ "এখন আমার হাতে এই পরিমাণ মালপত্র রহিয়াছে। ব্যবসায়ের কিছু জিনিসপত্র ভারতবর্ষে আছে। ইহা আমার অমুক সম্পত্তির দলিল। অমুক ব্যক্তি আমার অমুক মালপত্রের জামিনদার। কখনও বলে, আলেকজান্দ্রিয়া যাওয়ার কল্পনা করিতেছি। তথাকার আবহাওয়া উত্তম। আবার বলে, না, তথাকার সমুদ্র বড় ভয়াবহ।"পুনরায় বলিতে লাগিলঃ "সা'দী! আমি আর একটি সফরের কল্পনা করিতেছি, আমার এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলে অবশিষ্ট জীবন সন্তুষ্টির সহিত নির্জনে থাকিয়া কাটাইয়া দিব।" আমি জিজ্ঞাসা করিলামঃ "কোন্ দিকে সফরের বাসনা রাখেন?" সে বলিল, "পারস্য দেশ হইতে গন্ধক খরিদ করিয়া চীন দেশে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি। শুনিয়াছি তথায় গন্ধক খুব চড়া মূল্যে বিক্রয় হইতেছে এবং চীন দেশীয় কাঁচের দ্রব্য রোমে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিব। রোম দেশীয় রেশম ভারতবর্ষে, ভারতবর্ষের ইস্পাত-লৌহ হলবে, হলব দেশীয় সীসা ইয়ামানে এবং ইয়ামানী চাদর পারস্যে নিয়া বিক্রয় করিবার আশা আছে। অতঃপর আর সফর করিব না। একটি বড় রকমের দোকান আরম্ভ করিয়া আরামে বসিয়া যাইব।" এখনও খোদার বান্দার দুনিয়া পরিত্যাগের ইচ্ছা নাই, দোকানেই বসিবার সঙ্কল্প। মোটকথা, সে এইরূপ আকাশ-কুসুম রচনা করিতে লাগিল। পরিশেষে শেখ সা'দীকে বলিলঃ "আপনিও আপনার অভিজ্ঞতার কথা কিছু বর্ণনা করুন।" শেখ সা'দী উত্তরে বলিলেনঃ

آں شنیدستی که در صحرائے غور ـ بار سالارےبیفتاد از ستور
گفت چشم تنگ دنیا دار را ـ یا قناعت پر کند یا خاك گور

"তুমি 'গাওর' প্রান্তরের কাহিনী হয়তো শুনিয়া থাকিবে, তথায় একদিন কোন এক ব্যবসায়ীর সমস্ত মালপত্র অশ্বের পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গেলে সে বলিতে লাগিল, লোভী দুনিয়াদারের সঙ্কীর্ণ চক্ষু হয়তো অল্পে সন্তুষ্টিতে তুষ্ট হইতে পারে অথবা কবরের মাটিতে।"

মৃত্যুকে নিকটবর্তী মনে করঃ বাস্তবিক দুনিয়াদার লোকের লোভ মৃত্যুর পূর্বে কখনও নিবৃত্ত হয় না। এই মর্মে হাদীস শরীফেও উল্লেখ আছে যে, মানুষের লোভী উদর কেবল মাটি দ্বারাই পূর্ণ হইতে পারেঃ وَلَا يَمْلَاءُ جَوْفَ اِبْنِ اٰدَمَ اِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ "আদম সন্তানের উদর মাটি ছাড়া আর কিছুতে পূর্ণ হয় না। অবশ্য যে ব্যক্তি তওবা করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার তওবা কবূল করিয়া থাকেন।" এই জাতীয় দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা এবং অনর্থক কল্পনা করিতেই রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রাতঃকাল আসিলে সন্ধ্যাকালের চিন্তা করিও না এবং সন্ধ্যাকাল আসিলে প্রাতঃকালের চিন্তা করিও না; বরং নিজকে নিজে কবরবাসীদের মধ্যে গণ্য কর। অর্থাৎ, মনে কর যে, তোমার আয়ুষ্কালের মধ্য হইতে কেবল আজিকার কয়েকটি

মুহূর্তই অবশিষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং জীবন হইতে নিরাশ ব্যক্তি শেষ সময় যেরূপ কাজ করে তুমিও সেইরূপ কাজ কর। বলাবাহুল্য, সংসারে একদিন বা এক ঘণ্টাকালের অতিথি বলিয়া যে ব্যক্তি নিজকে মনে করে, সে কখনও অনাবশ্যক কার্যে সময় নষ্ট করে না। সে এত দীর্ঘ সূত্র কল্পনার অবসর কোথায় পাইবে? আজীবন মানুষের এই অবস্থাই হওয়া উচিত। কিন্তু এই মহামারীর পরে এখন আমাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, আজকাল আমাদের সম্মুখে কেহ মরিয়া গেলেও আমাদের মনে এরূপ ভয় বা ধারণা আসে না যে, এই মৃত ব্যক্তি আজ যে স্থানে আসিয়াছে, কাল আমাকেও এখানে আসিতে হইবে।

ইহার প্রমাণ দেখুন, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করিবার সময় উপস্থিত লোকগণ কবরের উপরে দাঁড়াইয়া দুনিয়ার যত গল্প-গুজব আরম্ভ করিয়া দেয়। কবর সম্মুখে রহিয়াছে। মানুষ নানা প্রকার গল্প-গুজব এবং মামলা-মোকদ্দমার কথায় লিপ্ত আছে। তাহারা যেন মনে করে যে, সকল লোকের কাফ্‌ফারাস্বরূপ মৃত্যু কেবল এই ব্যক্তির জন্যই আসিয়াছে। আর কাহাকেও মরিতে হইবে না। খৃষ্টানগণও এইরূপ মনে করিয়া থাকে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম তাঁহার উম্মতমণ্ডলীর পক্ষ হইতে কাফ্‌ফারা হইয়া গিয়াছেন। এখন তাহারা যত বদমাইশিই করুক, কাহারও কোন হিসাব-নিকাশ হইবে না। ফলকথা, ভুলেও মৃত্যুর কথা স্মরণ করে না এবং এমনভাবে উপকরণ সংগ্রহে লিপ্ত থাকে যেন এই সংসারে চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে। আমরা মুসাফিরখানা, কিংবা ষ্টেশন ঘর সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা করি, নিজের বাসগৃহ সম্বন্ধেও যদি আমাদের তদ্রূপ ধারণা থাকিত, তবে আমরা বাসগৃহের দৃঢ়করণ ও সাজ-সজ্জার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করিতাম না। কেননা, মুসাফিরখানার কোন দেওয়াল কিংবা কোন কামরা যদি ভাঙ্গিয়া যায়, তবে কোন মুসাফির উহা সংস্কারের চেষ্টা করে না। কারণ, সে ইহাকে নিজের ঘর বলিয়া মনে করে না। এক রাত্রি কিংবা দুই একদিনের বিশ্রামাগার বলিয়াই মনে করিয়া থাকে, কাজেই উহার বিনষ্ট হওয়া সম্বন্ধে চিন্তা মোটেই করে না। আমরা যদি আমাদের আসল গন্তব্যস্থান ভুলিয়া থাকিতাম, তবে দুনিয়ার বাসগৃহকে নিজের ঘর কখনও মনে করিতাম না। এই কারণে হাদীসে আসিয়াছে— اَلدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَّا دَارَ لَهٗ

"দুনিয়া সেই ব্যক্তির ঘর যাহার কোন ঘর নাই।" এই হাদীসে দুনিয়াকে যদিও ঘর বলা হইয়াছে, তথাপি যখন উহার এই অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করা হয় যে, তাহা 'গৃহহীনের গৃহ', তখন সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, দুনিয়া প্রকৃতপক্ষে কোন গৃহই নহে। গৃহ হইলে কেমন গৃহ?

দুনিয়ার বাসগৃহের হাকীকত ঃ দুনিয়ার বাসগৃহ এইরূপ যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَّ لَعِبٌ وَّ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ ط لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

"এই পার্থিব জীবন কেবল খেলাধুলা ছাড়া আর কিছুই নহে; পক্ষান্তরে পরলোকের জীবনই প্রকৃত জীবন। আহা, যদি মানুষ তাহা বুঝিত!" এই আয়াতে একটি দৃষ্টান্তের প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। অর্থাৎ, দুনিয়ার বাসগৃহ ছেলেদের খেলাঘরের সদৃশ বটে। অবোধ শিশুরা নির্বুদ্ধিতা-বশত ইহাকেই তাহাদের প্রকৃত ঘর মনে করিয়া থাকে। কেহ তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে কান্নাকাটি জুড়িয়া বলিতে থাকে, "হায়! আমার ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।"

পুরাকালে দস্তুর ছিল, মেয়েরা 'পীর মাকড়শাহ্' নির্মাণ করিত। উহাতে মাকড়শাহ্‌র জন্য মিঠাই -মণ্ডা রাখা হইত। মধ্যস্থলে একটি কবরের আকৃতিও থাকিত, উহাতে যথারীতি দরজা-জানালা এবং কামরা থাকিত। মোটকথা, উহাকে গোটা একটি শহরের রূপ দেওয়া হইত। রাত্রিকালে চেরাগ জ্বালান হইত। এই দস্তুর পীরযাদাদের আবিষ্কৃত ছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল, শৈশব হইতেই শিশুদের মধ্যে পীর পূজা ও কবর পূজার অভ্যাস জন্মাইয়া দেওয়া। অনুরূপভাবে জ্ঞানীগণ পুতুলখেলা এই উদ্দেশ্যে প্রবর্তন করিয়াছিলেন, যেন পুতুলের জন্য জামা-কাপড় সেলাই করিয়া এবং মালা গাঁথিয়া মেয়েদের সেলাই করা ও মালা গাঁথার অভ্যাস জন্মে। স্মরণ রাখিবেন, আমরা যেরূপ অবোধ ছেলেপেলেদের কাণ্ড দেখিয়া হাসি এবং বলিঃ "ইহারা এমন নির্বোধ, কেমন বস্তুকে ঘর মনে করিতেছে?" তদ্রূপ আল্লাহওয়ালাগণ আমাদের কাণ্ড দেখিয়া হাসেন এবং বলেনঃ "ইহারা এমন নির্বোধ, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সহিত প্রাণের কেমন স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে?" আল্লাহ্ তা'আলা এই কথাটিই আলোচ্য আয়াতে ব্যক্ত করিয়াছেনঃ وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَّ لَعِبٌ ط

নির্বোধ শিশুরা যেমন তাহাদের খেলার ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলার কারণে তাহাদের পিতাকে বোকা মনে করে, তদ্রূপ আমরা দুনিয়াদার লোকেরা খোদার জ্ঞানে জ্ঞানী লোকদিগকে নির্বোধ মনে করিয়া থাকি। কেননা, তাঁহারা আমাদিগ হইতে দুনিয়া ছাড়াইয়া দিতেছেন। তাঁহারা দুনিয়ার প্রয়োজনের কোনই খবর রাখেন না। বন্ধুগণ! তাঁহারা সব বিষয়েরই খবর রাখেন। সর্বপ্রকারের অবস্থাই তাঁহারা ভোগ করিয়াছেন। তাঁহারা যদি প্রথমে দুনিয়াদার এবং পরে তওবা করিয়া দুনিয়াবিরাগী হইয়া থাকেন, তবে তো দুনিয়ার যাবতীয় অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের অবহিত থাকা স্পষ্ট কথা। পূর্বে তাঁহারা দুনিয়াদার না থাকিলেও দুনিয়ার অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে। কেননা, দুনিয়ার যেসমস্ত প্রয়োজনের কথা তোমরা অবগত আছ, তৎসম্বন্ধে তাঁহারাও অজ্ঞ নহেন। কিন্তু সেই জ্ঞানের সঙ্গে তাঁহাদের আর একটি বিষয়ের জ্ঞান আছে, যাহা তোমাদের নাই। এই কারণে তাঁহারা তোমাদের দেখিয়া হাসেন। এই মর্মে মাওলানা রূমী বলিতেছেন—

خلق اطفالند جز مست خدا ـ نیست بالغ جز رهیده از هوا "খোদাপ্রেমে মত্ত ফকীর ব্যতীত সমস্ত মানুষ অপরিণত বয়স্ক বালকের মত অপক্ক মস্তিষ্ক। সাবালক এবং পাকা মস্তিষ্ক তাঁহারাই, যাঁহারা লোভ ও প্রবৃত্তির বেড়ি হইতে মুক্ত হইয়াছেন। সমস্ত মানুষই নাবালক বাচ্চা, আবশ্য যাঁহারা কু-প্রবৃত্তির কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সাবালক।"

ফলকথা, আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ আমাদিগকে নির্বোধ মূর্খ মনে করিয়া থাকেন। কেননা, আমাদের অবস্থা সাক্ষ্য দিতেছে যে, আমরা দুনিয়াকে সফরের বিশ্রামাগার মনে করিতেছি না। যদিও ইহা দাবী করিয়া থাকি।

সংসারবিরাগের বিভিন্ন স্তরঃ সংসারবিরাগ সাধারণত তিনটি স্তরে বিভক্ত বলিয়াই প্রসিদ্ধ। কিন্তু এখন আমার মনে আরও একটি স্তরের কথা উদয় হইয়াছে। ইহা অবশ্য বুযুর্গানে দ্বীনের বাণীতে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ রহিয়াছে। স্তর বিভাগ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয় নাই। অতএব, সংসারবিরাগ চারি স্তরে বিভক্ত। জ্ঞান, কর্ম, অবস্থা, এই কয়টি স্তরই প্রসিদ্ধ। আমি এতদ্‌সঙ্গে আর একটি যোগ করিলাম। কেননা, অবস্থারও আবার দুইটি স্তর রহিয়াছে—স্থায়ী অবস্থা এবং অস্থায়ী অবস্থা। আয়ত্ত করার সুবিধার জন্য স্থায়ী অবস্থাকে মোকাম এবং অস্থায়ী অবস্থাকে শুধু অবস্থা বলিব।

অতএব, এখন সংসারবিরাগের চারিটি স্তর হইল। ১। জ্ঞানের স্তর, ২। কর্মের স্তর, ৩। অবস্থার স্তর, ৪। মোকামের স্তর। অবস্থাকে দুই ভাগে বিভক্ত করার প্রয়োজন এই হইয়াছে যে, ইহাতে মানুষ ধোঁকায় পতিত হইয়া থাকে। অনেকেই অস্থায়ী অবস্থাকে যথেষ্ট মনে করে। অথচ অস্থায়ী অবস্থা কোন পূর্ণ গুণ নহে। ইহা তো অনেক সাধারণ লোকের মধ্যেও কখনও কখনও দৃষ্ট হয়। সংসার বিরাগের স্তর বিভাগ যদি প্রসিদ্ধ তিন স্তরেই সমাপ্ত করিয়া দেওয়া হয়, তবে মানুষ অবস্থা বলিতে অস্থায়ী অবস্থা বুঝিয়াই ক্ষান্ত হইবে। অথচ অবস্থা স্থায়ী না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণ গুণ বলিয়াই গণ্য হয় না।

ইব্‌লীসের ভুলের রহস্যঃ অস্থায়ী অবস্থাকে শেষ সীমা মনে করিয়া অনেক লোক ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। 'বাল্‌আ'ম বাউর' এবং ইব্‌লীস এই ভুলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের কিছু ভাসা ভাসা কাইফিয়ত (অবস্থা) অনুভব হইতেই তাহারা উহাকে চরম অবস্থা মনে করিয়া লইয়াছিল। অতঃপর চেষ্টা এবং রিয়াযতের প্রয়োজন ফুরাইয়াছে মনে করিয়া নফ্‌সের সংশোধনে আর প্রবৃত্ত হয় নাই, উহা ভুলিয়াই গিয়াছে এবং পরিশেষে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কেননা, অস্থায়ী অবস্থার কারণে তাহাদের নফ্‌স তখনও জীবিত ছিল। রিয়াযত অর্থাৎ, চেষ্টার ফলে তাহাদের নফ্‌সের মধ্যে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা প্রাপ্ত হইয়া মোকামের স্তরে পৌঁছিতে পারে নাই। এই ভুলের কারণে আজও বহু লোক বরবাদ হইতেছে। মনে করুন, কাহারও মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয়ের কিছু লক্ষণ প্রকাশ পাইল। দুই-চারিবার কান্না আসিল, কিংবা আল্লাহ্‌র মহব্বত এবং মা'রেফাতের চিহ্ন দেখা গেল অথবা যেকের বা পীরের সাহচর্যের ফলে এক প্রকার মুশাহাদা হাসিল হইল অর্থাৎ, সাময়িকভাবে অন্তরচক্ষু খুলিয়া গেল। সে ইহাকে চরম অবস্থা মনে করিয়া রিয়াযত এবং চেষ্টা ত্যাগ করিল। ইহার পরিণতি এই হইল যে, কিছুদিনের মধ্যে পূর্ববৎ অন্ধ হইয়া পড়িল। কেননা, যে অবস্থাটির উদ্ভব হইয়াছিল তাহা ছিল অস্থায়ী। উহাকে স্থায়ী করার জন্য আরও চেষ্টা এবং রিয়াযতের প্রয়োজন ছিল। ইহার একটি বাহ্যিক উপমা গ্রহণ করুনঃ কোন ব্যক্তি একটি বৃক্ষ রোপণ করিল এবং যথারীতি উহার তদবীর ও প্রতিপালন করিল। সাধারণত বৃক্ষের চরম অবস্থা হইল ফল ধরা। লোকটি গাছে একবার দুই একটি ফল ধরিতেই উহার সেবা পরিত্যাগ করিল, অথচ একবার ফল ধরা যথেষ্ট নহে। কেননা, কোন কোন বৃক্ষে তাড়াতাড়ি ফল ধরিয়া থাকে। যেমন, আমের কোন কোন কলমের গাছে এক বৎসরেই ফল ধরে। অথচ উহা মোটেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই। আজকাল অপরিণত বয়সে কেহ কেহ সন্তানের পিতা হইয়া থাকে। দেখিতেও তাহাকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেই মনে হয়। মানুষ যে বলিয়া থাকে, "শেষ যুগে মানুষের দৈর্ঘ্য এক বিঘত হইবে।" ছেলে বয়সে যাহারা পিতা হয় তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় এই কথা বলা হইয়াছে। কেননা, পূর্বকালে মানুষ বিলম্বে সাবালক হইত। ৬০/৭০ বৎসর বয়সে বিবাহের চিন্তা করিত। তাই 'ষাটে পাঁঠা' প্রবাদ বাক্যটি এখনও প্রচলিত আছে। কিন্তু আজকাল ষাট বৎসর বয়সেই মানুষ কবরের পেঁড়া হইয়া যায়। সুতরাং মানুষের মধ্যে যেমন বিঘতি আছে, গাছের মধ্যেও তদ্রূপ বিঘতি আছে। মাটি হইতে মাথা একটু উঁচু করিতেই ফল ধরা আরম্ভ করে। বৃক্ষ রোপণকারী এই মনে করিয়া সন্তুষ্ট হয় যে, বৃক্ষ এখন চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই পানি সিঞ্চন বন্ধ করিয়া দেয়। ফল এই দাঁড়ায়, যে, কোন বলদ ইহার নিকট দিয়া অতিক্রম করাকালে এক লাথি মারিয়া উহাকে ভূমিসাৎ করিয়া ফেলে। অথবা গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া লাকড়িতে পরিণত হয়। অতএব, একবার ফল ধরার সাথে সাথে নিশ্চিন্ত মনে তদবীর বন্ধ করিয়া

দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নহে; বরং কাণ্ড পুষ্ট হওয়া এবং তৃণভোজী জন্তুর মুখ হইতে রক্ষা পাওয়ার উপযোগী উঁচু হওয়া পর্যন্ত আরও কিছুকাল তদবীর চালাইয়া যাওয়া উচিত। এখন আর বৃক্ষ তদবীরের মুখাপেক্ষী থাকে না। স্বাভাবিক বৃষ্টিই উহার জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট হয়। অনুরূপভাবে মা'রেফাতপন্থীদের হৃদয়ে কোন অবস্থার উদ্ভব হইতেই নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হওয়া উচিত নহে; বরং যথারীতি চেষ্টা এবং রিয়াযত চালাইয়া যাওয়া কর্তব্য। উক্ত অবস্থা স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইলে অবস্থার মালিক আর 'চিল্লা' পালনের ন্যায় কঠিন রিয়াযত বা চেষ্টার মুখাপেক্ষী থাকেন না। মাওলানা 'রূমী বলেনঃ خلوت وچله برولازم نماند "নির্জনতা অবলম্বন এবং চিল্লা পালনের প্রয়োজনীয়তা আর থাকে না।"

মানুষ স্বাধীন ও ইচ্ছাশক্তির অধিকারীঃ কিন্তু তথাপি আমলের প্রয়োজন থাকিবে, নফসের পর্যবেক্ষণ এবং আভ্যন্তরীণ যেকেরে মশগুল থাকা তাহার জন্য অবশ্য কর্তব্য থাকিবে। বৃক্ষ যেহেতু স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী নহে, সুতরাং পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার পর আর কোন তদবীরের প্রয়োজন থাকে না। স্বভাবত আল্লাহ্ তা'আলার করুণাবারি উহার উপর সিঞ্চিত হইতে থাকে। পক্ষান্তরে মানুষ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী বলিয়া প্রার্থনা ও ইচ্ছা করা ব্যতীত সে আল্লাহ্ তা'আলার ফয়েয বা রহমত পাইতে পারে না। সুতরাং আজীবন তাহাকে ইচ্ছা ও প্রার্থনা কায়েম রাখিতে হইবেঃ

يك چشم زدن غافل از آں شاه نباشى ـ شايـد كه نگـاهے كنـد آگـاه نبـاشى

"সত্যিকারের মাহবুব হইতে সামান্য সময়ের জন্যও অমনোযোগী থাকিও না। (কেননা,) এমনও হইতে পারে যে, তিনি রহমতের দৃষ্টি করিবেন, অথচ তুমি তাহা টেরও পাইবে না।"

হাদীস শরীফে আছে, اَلَا اِنَّ لِرَبِّكُمْ نَفَحَاتٍ فِى الدَّهْرِ اَلَا فَتَعَرَّضُوْا لَهَا "মনে রাখিও, যমানার মধ্যে তোমাদের প্রভুর দানের যথেষ্ট সময় রহিয়াছে। তোমরা উহার অন্বেষণে থাকিও।" বহু লোক এই ঘোর-চক্করে পৌঁছিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহারা অবস্থার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আমল পরিত্যাগ করিয়াছে এবং পূর্বে যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল আবার তেমনি অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়াছে; বরং পূর্বাপেক্ষা আরও অধিক অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছে। একবার প্রার্থনা করার পর উহা ত্যাগ করার ফল বড়ই ভয়ঙ্কর। কেননা, ইহাতে বিমুখতা প্রকাশ পায়। 'বাল্আম বাউর' এবং 'ইব্লীস' অস্থায়ী হালতের উদয় অনুভব করিতেই নিজদিগকে কামেল মনে করিয়া হতভাগারা চেষ্টা এবং রিয়াযত ত্যাগ করিয়াছিল। ওলীআল্লাহ্গণের মধ্যেও কেহ কেহ এ শ্রেণীর ধোঁকায় পতিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে 'ধ্বংসোন্মুখ আওলিয়া' বলা হয়। অতএব, খুব ভালরূপে স্মরণ রাখিবেনঃ পূর্ণতাপ্রাপ্তির পরেও চেষ্টা চালু রাখা অবশ্য কর্তব্য।

আরেফ শিরাযী বলেনঃ

در راه عشق وسوسهٔ اهرمن بسےست ـ هشيار و گوش را به پيام سروش دار

"প্রেমের পথে শয়তানের ধোঁকা যথেষ্ট রহিয়াছে, সতর্কতার সহিত অগ্রসর হও এবং তোমার কানকে ওহীর আওয়াযের প্রতি নিবদ্ধ রাখ।"

ওহীর হুকুম হইলঃ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ "মৃত্যু-মুহূর্ত পর্যন্ত তোমার প্রভুর এবাদত করিতে থাক।" অর্থাৎ, মৃত্যুকাল পর্যন্ত আমলে পরাঙ্মুখ হইও না। দৃঢ়ভাবে ইহাতে নিয়োজিত থাকিবে। পূর্ণতাপ্রাপ্তির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আমলের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমে পূর্ণতাপ্রাপ্তির চেষ্টা ও রিয়াযতস্বরূপ আমল করিতেছিলে, এখন এবাদতস্বরূপ আমল করিবে। প্রিয় আল্লাহ্ মোছাফাহার জন্য তোমার দিকে হাত বাড়াইলেন, তখন তুমিও হাত বাড়াইয়া দিলে। অতঃপর তোমাকে হাত বাড়াইয়াই রাখিতে হইবে, যাহাতে তোমার আকাঙ্ক্ষা এখনও বিদ্যমান আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিশেষত আল্লাহ্ তা'আলার অভ্যাস এই যে, তুমি তোমার হস্ত প্রসারিত রাখা পর্যন্ত তিনি নিজের হাত সঙ্কুচিত করেন না। এই অভ্যাস হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছিল। কেননা, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার অভ্যাস ও আদতের পূর্ণ প্রতীক ছিলেন। কেহ মোছাফাহার জন্য হাত বাড়াইলে সে লোকটি নিজের হাত টানিয়া না লওয়া পর্যন্ত হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও তাঁহার হাত সঙ্কুচিত করিতেন না। ইহজগতে যখন হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস এইরূপ, তখন পরলোকেও তদ্রূপই থাকিবে। তবে আর কিসের চিন্তাঃ نماند بعصیاں کسے در گرو ـ که دارد چنیں سید پیشرو "দুই জাহানের বাদশাহ্ হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহাদের অগ্রনায়ক, তাহাদের কেহই পাপের বন্দিখানায় আবদ্ধ থাকিবে না।"

এমন দাতা ও দয়ালু নবী যাহাদের ভাগ্যে জুটিয়াছে, তাহাদের আশা করিবার অনেক কিছুই আছে। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে এই অনুগ্রহ ও দয়াগুণটি আল্লাহ্ তা'আলার দয়াগুণের প্রতিবিম্ব বটে। এই ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা হইলেন মূলাধার। যে পর্যন্ত তুমি তাঁহার সমীপে প্রার্থনা জারি রাখিবে সে পর্যন্ত তোমার প্রতি তাঁহার দয়া ও দৃষ্টি বিন্দুমাত্র হ্রাস পাইবে না।

মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী (রঃ) বলিয়াছেনঃ যিনি ইহলোকের খোদা, তিনি পরলোকেরও খোদা। ইহজগতে তাঁহার অনুগ্রহ ও দয়া অপরিসীম, তাঁহার গুণাবলীর মধ্যে কোন পরিবর্তন নাই। তাঁহার যাবতীয় গুণ পূর্বে যেরূপ ছিল, এখনও সেরূপ আছে। তবে আর কিসের ভয়? ইন্‌শাআল্লাহ্, পরকালেও তাঁহার দয়া এরূপই থাকিবে; বরং ইহা অপেক্ষা আরও অধিক হইবে।

আশা ও নির্ভরের স্বরূপঃ শুধু আশার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিবেন না। কেননা, আশা দুই প্রকার। ১। আল্লাহ্ তা'আলার রহ্‌মতের আশা, ২। আত্ম-প্রবঞ্চনা। যথাকর্তব্য রিয়াযত এবং আমল করিলেই মানুষ রহমতের আশা করিতে পারে। আমল না করিয়া শুধু আশার উপর নির্ভর করা হইল গুরুতর আত্ম-প্রবঞ্চনা।

ইব্‌নে কাইয়্যেম (রঃ) বলিয়াছেনঃ "পাপী লোকের মনে রহ্‌মতের আশা জন্মিতেই পারে না।" অতএব, যেসমস্ত হাদীসে আল্লাহ্‌র রহ্‌মতের আশা এবং তাঁহার প্রতি ভাল ধারণা রাখার তা'লীম দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে আমল এবং এবাদতেরই তা'লীম। কেননা, ইহা হইতেই রহ্‌মত-এর আশা উৎপন্ন হইয়া থাকে, আমল এবং এবাদত ব্যতীত রহ্‌মতের আশা আত্ম-প্রবঞ্চনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার সম্বন্ধেই আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেনঃ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ "আল্লাহ্ তা'আলা সম্বন্ধে তোমাদেরে বড় ধোঁকাবাজ ধোঁকায় ফেলিয়া রাখিয়াছে।" ফলকথা,

আল্লাহ্ পাক বড় মেহেরবান এবং দয়ালু। দয়ার হাত প্রসারিত করিয়া নিজের তরফ হইতে তাহা সঙ্কুচিত করেন না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। কোন কবি বলিয়াছেনঃ

هرکـه خواهـد گوبیا و هر که خواهد گو برو-دار و گیـرو حاجب و درباں دریں درگه نیست

"যাহার ইচ্ছা আসুক, যাহার ইচ্ছা যাউক, এই দরবারে বাধা প্রদানকারী কেহ নাই।" তুমি যদি হাত টানিয়া লও, তবে তিনিও হাত টানিয়া নিবেন। কেননা, তিনি জবরদস্তি কাহারও মাথার উপর নেয়ামতের বোঝা চাপাইয়া দেন না। তাঁহার কোন ঠেকা নাই যে, তুমি চাও বা না চাও তোমাকে দিতেই থাকিবেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كَارِهُوْنَ

"তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ইচ্ছা না থাকিলেও আমি তোমাদিগকে জোরপূর্বক নেয়ামত দিতেই থাকিব?"

বহু হাদীসে উল্লেখ আছে যে, কোন এবাদত আরম্ভ করিয়া তাহা ত্যাগ করিলে বুঝা যায় যে, বান্দা আল্লাহ্র রহ্মতের প্রত্যাশা ত্যাগ করিয়াছে। কোন কোন স্থলে আমল আরম্ভ করিয়া ত্যাগ করা মাকরূহের স্তরে যাইয়া পৌঁছে। এই কারণে হাদীস শরীফে এ সম্বন্ধে নিষেধ আসিয়াছেঃ

يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ تَرَكَهٗ

"হে আবদুল্লাহ্! তুমি অমুক ব্যক্তির মত হইও না—যে ব্যক্তি নফল নামায পড়িতে অভ্যস্ত হইয়া পরে তাহা ত্যাগ করিয়াছে।" ইহাতে বুঝা যায়, হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তির অবস্থাকে নাপছন্দ করিয়াছেন। এই কারণেই উপদেশ দিতেন—"অমুক ব্যক্তির মত হইও না।" ফলকথা, কোন আমল আরম্ভ করিয়া পরে তাহা ত্যাগ করা মাক্রূহ্। এই কারণেই পূর্ণতা-প্রাপ্তির পরেও আমলে ঘাটতি হয়। ইহার রহস্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সঙ্গে অনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

যেমন, কোন ব্যক্তি যদি প্রত্যহ আমাদের নিকট আসিতে অভ্যস্ত হইয়া অকস্মাৎ আসা বন্ধ করিয়া দেয়, তবে তাহার প্রতি আমাদের মন অসন্তুষ্ট হয়। অনুরূপ ব্যবহার আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতেও হইয়া থাকে। এস্থলে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, আমরা অন্তর্যামী নহি, কাজেই বন্ধুর মনের অবস্থা জানি না। হয়তো তাহার মনে আমার প্রতি মহব্বত থাকিতেও পারে। কোন অনিবার্য কারণে আসিতে অক্ষম হইয়াছে, অথচ তাহার আগমন বন্ধ করাকে ভালবাসায় ভাটা পড়ার নিদর্শন মনে করিয়া আমরা অসন্তুষ্ট হইতেছি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ। তিনি খুব ভাল করিয়া অবগত আছেন যে, তাঁহার প্রতি আমাদের অন্তরে মহব্বত হ্রাস পায় নাই। যদিও আমলে ত্রুটি ঘটিয়াছে, তবে তিনি অসন্তুষ্ট হন কেন?

ইহার উত্তর এইঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইহাও অবগত আছেন যে, অবিরত এবাদতের ফলে এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের পর সেই ব্যক্তিই আমল পরিত্যাগ করিয়া থাকে, যাহার আন্তরিক সম্পর্কের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে। মূলে কোন প্রকার পরিবর্তন ব্যতীত পূর্ব ব্যবহারের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না। অবশ্য সফর কিংবা রোগের কারণে আমলে ত্রুটি হইলে তাহা মার্জনীয় হয়, যদি জরুরী এবাদতসমূহে কোন কসূরী না করা হয়। আন্তরিক সম্পর্ক বহাল রাখিয়া যদি রোগের কিংবা সফরের কারণে নফল এবাদতে ত্রুটি হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তখন এত দয়া করেন যে, আমল কম

হইলেও সুস্থ এবং মুকীম অবস্থার আমলের সওয়াব আমলনামায় লিখিয়া থাকেন। আন্তরিক অবস্থার পরিবর্তন ব্যতীত বিনা ওযরে কাহারও আমলে ত্রুটি হইতে পারে না।

মানুষ স্বভাবত লোভী ঃ প্রাধান্যের স্পৃহা আল্লাহ্ তা'আলার গুণ, আর মানুষ আল্লাহ্ পাকের যাবতীয় গুণাবলীর মূর্ত বিকাশ। সুতরাং প্রাধান্যের লোভ মানুষের স্বভাব। কাজেই মানুষ নিজের প্রত্যাশিত কার্যে প্রাধান্যলাভের জন্য লোভী হইয়া থাকে; এমন কি আল্লাহ্ তা'আলার মা'রেফাত এবং মহব্বতলাভের প্রত্যাশায়ও মানুষ প্রাধান্য-লোভী হয়। মানুষ স্বভাবত কোন উদ্দিষ্ট বিষয়ে ত্রুটি ও অবনতি সহ্য (পছন্দ) করে না। এতটুকু অবগত হওয়ার পর বুঝিয়া লউন, যদি মানুষের কোন উদ্দিষ্ট বিষয়ে প্রাধান্যলাভের পরিবর্তে ত্রুটি এবং অবনতি পরিলক্ষিত হয়, তবে মনে করিবেন, এই উদ্দিষ্ট বিষয়ের প্রত্যাশায় বা কামনায় তাহার ত্রুটি রহিয়াছে, নচেৎ সে কখনও ত্রুটি সহ্য করিত না। কেননা, সে আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর বিকাশ বলিয়া প্রাধান্য স্পৃহা তাহার স্বভাবগত বস্তু। কিন্তু কোন কোন সময় পূর্ণ প্রাধান্যলাভ না করিয়াও শুধু এতটুকুতেই সন্তুষ্ট হইয়া যায় যে, "আমি তো কাইফিয়তের উপর অবগতির প্রাধান্য লাভ করিয়াছি। শওক ও মহব্বত সৃষ্টির পদ্ধতিতে জ্ঞান লাভ করিয়াছি। আমার অন্তর হইতে বাজে কল্পনা দূর করার উপায় জানিয়া লইয়াছি। এরূপ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ঐ কৃপণ ব্যক্তির, যে ঘৃত সম্মুখে রাখিয়া প্রত্যেক লোক্মার সময় বলে ঃ "তোকে খাইব।" এইরূপে রুটি সমাপ্ত হইয়া যায় এবং ঘি যেমনটি তেমনই থাকিয়া যায়। তদুপরি আবার এই ভাবিয়া সন্তুষ্ট হয় যে, "আমার খাওয়ার শক্তি ঠিক আছে।" কিংবা তাহার দৃষ্টান্ত এরূপ মনে করিতে পারেন, যেমন এক্ জোলার মহিষ চোরে লইয়া গেল, তখন সে বলে, 'লইয়া যাও, দেখা যাইবে কিসের দ্বারা মহিষ বাঁধ। রশি তো আমার কাছেই রহিয়াছে।' অনুরূপ-ভাবে কাইফিয়ত বা মোকাম লাভের প্রণালী শিখিয়াই কোন কোন তরীকতপন্থী নিশ্চিন্ত হইয়া মনে করেন যে, "এখন আর চিন্তা কিসের? প্রণালী যখন শিখিয়া ফেলিয়াছি, এখন যখন ইচ্ছা কাইফি-য়ত লাভ করিতে পারিব। হয়তো আরম্ভ করিয়া কখনও উহা লাভের তাওফীকও হয় না। এইরূপে কেহ নামায আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দেয়। কেননা, সে নামাযী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া ফেলি-য়াছে। খ্যাতিতে প্রাধান্য লাভ হইয়া গিয়াছে। এখন হয়তো সে মাত্র ঈদেরই নামাযী, তাহাও তো নামাযীরই এক প্রকার বটে।

এক ওয়ায়েয কোন গ্রামে এক ওয়াযের মজলিসে বেনামাযীকে শূকর বলিয়াছিলেন। ইহাতে গ্রামবাসীরা চটিয়া গেল এবং লাঠি লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। বলিল, "আমাদিগকে শূকর বলিলে কেন?" তিনি উত্তর করিলেন, আমি কি তোমাদিগকে বলিয়াছি? তোমরা তো নামাযী। তোমরা কি ঈদের নামায পড় না। গ্রামবাসীরা বলিল ঃ হাঁ, আমরা ঈদের নামায পড়িয়া থাকি।" বলিলেন, তবে তোমরা বেনামাযী কেমন করিয়া হইলে? আমি তোমাদিগকে শূকর বলি নাই। ইহা শুনিয়া সকলে খুশী হইয়া গেল।

কোন কোন হাজী মক্কা শরীফ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর নাজায়েয কাজ আরম্ভ করিয়া দেয়। মনে করে হাজী বলিয়া তো প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছি। এখন আর আমলের কি প্রয়োজন করে? কেহ কোন এক কাফেরকে হত্যা করিয়া খুশী হয় যে, আমি তো গাজী হইয়া গিয়াছি কিংবা সমাজ -সেবক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছি। আ'মলে আর কি প্রয়োজন? কেহ বা কয়েকদিন খুব যেকের-ফেকের করিয়া পরে তাহা ত্যাগ করে। মনে করে, আবেদ এবং বুযুর্গ বলিয়া খ্যাতি লাভ

করিয়াছি। এখন মানুষকে এই প্রবঞ্চনা করিয়া বেড়াইতেছে যে, আমার ক্বল্‌ব্ জারি হইয়া গিয়াছে। এখন মৌখিক যেকেরের প্রয়োজন নাই।

মোটকথা, মানুষের মধ্যে প্রাধান্যলাভের স্পৃহাও আছে। কিন্তু কোন কোন সময় তাহারা দুর্বল এবং বাহ্যিক প্রাধান্যকেই যথেষ্ট মনে করে। বস্তুত ইহা তাহার প্রচেষ্টায় ত্রুটি থাকার প্রমাণ। কেননা, মানুষের প্রচেষ্টা ও প্রত্যাশা পূর্ণ হইলে তাহাতে পূর্ণ প্রাধান্য লাভ করা ব্যতীত সে ক্ষান্ত হইতে পারে না। অতএব, যখন মানুষ আমল আরম্ভ করিয়া পরিত্যাগ করে কিংবা কমাইয়া দেয়, তখন আল্লাহ্ পাকও তাহার প্রতি রহ্‌মতের দৃষ্টি কমাইয়া দেন। সুতরাং স্মরণ রাখিবেন, জ্ঞানের প্রাধান্যই যথেষ্ট হইবে না। সত্যিকারের প্রাধান্য লাভ করিতে হইবে। এই আত্ম-প্রবঞ্চনায় শতকরা আটান্নব্বই জন তরীকতপন্থী লিপ্ত আছে। কোন অবস্থা বা মোকামের সামান্য পরিমাণ আস্বাদ পাইয়া নিশ্চিত মনে আমল পরিত্যাগ করিয়া বসেন। এই আত্ম-প্রবঞ্চনা হইতে নিজকে রক্ষা করিতে হইবে। সত্যিকারের খোদা-প্রেমিক সেই ব্যক্তি, যিনি পূর্ণতাপ্রাপ্তির পরেও নিশ্চিত মনে আমল পরিত্যাগ করেন না।

পাথরের ক্রন্দন ঃ হযরত মূসা (আঃ) একদিন এক ক্রন্দনরত প্রস্তরের নিকট দিয়া পথ অতিক্রম করিতেছিলেন। খোদার কুদরতে যাহারা বিশ্বাসী তাহারা প্রস্তরের ক্রন্দন অবিশ্বাস করিবে না। মূসা (আঃ) ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রস্তর উত্তর করিল, যখন হইতে পাথর দোযখে যাইবে বলিয়া আমি শ্রবণ করিয়াছি ঃ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ তখন হইতে আমি আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দন করিতেছি। মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করিলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! এই প্রস্তরটিকে দোযখে নিক্ষেপ করিবেন না। আল্লাহ্ তাঁহার দো'আ কবূল করিলেন। তিনি পাথরকে সান্ত্বনা দিলে উহার কান্না সাময়িকভাবে থামিয়া গেল। মূসা (আঃ) স্বীয় গন্তব্য স্থানের দিকে চলিয়া গেলেন। ফিরিবার পথে প্রস্তরটিকে পুনরায় কাঁদিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার কেন কাঁদিতেছ? উত্তর করিল, কান্নার বদৌলতেই যখন এই সুসংবাদ লাভ করিয়াছি, তখন এমন উপকারী বন্ধুকে ত্যাগ করিব কেন?

অনুরূপভাবে হে তরীকতপন্থী বন্ধুগণ! আপনাদের যদি আমল এবং রিয়াযতের বদৌলতে কাইফিয়ত ও মুশাহাদা হাসিল হইয়া থাকে, তবে আপনাদের সেই আমল এবং চেষ্টা পরিত্যাগ করা উচিত নহে। কেননা, ইহারই সাহায্যে আপনারা এমন মহামূল্য রত্ন লাভ করিয়াছেন। এখন এমন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুকে ত্যাগ করিতেছেন? এই কারণেই আমি সংসারবিরাগের স্তর বিভাগে চতুর্থ স্তর বৃদ্ধি করিয়াছি, যাহাতে মানুষ বুঝিতে পারে যে, সংসারবিরাগ অস্থায়ী কাইফিয়ত প্রাপ্তিতেই সমাপ্ত হয় না; বরং কাইফিয়ত হইতে মোকামে অর্থাৎ, স্থায়ী অবস্থায় পৌঁছিতে পারিলেই সংসারবিরাগে পূর্ণতা লাভ করিবে।

সংসারবিরাগের বিস্তারিত বিবরণ ঃ এখন আমি সংসারবিরাগের চারিটি স্তরের পূর্ণ বিবরণ বর্ণনা করিতেছি। ইহার প্রথমটা হইল জ্ঞানের স্তর। অর্থাৎ, এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া হৃদয়ে জন্মাইয়া লওয়া যে, একদিন মরিতে হইবে এবং হিসাব-নিকাশও দিতে হইবে। কিন্তু অনেকে এই ক্ষেত্রে আসিয়া ধোঁকায় পতিত হয়। যেমন, কোন কোন লোক, যাহারা হকপন্থী বলিয়া খ্যাত, তাহারা সঠিক ও বিশুদ্ধ বিশ্বাসের অধিকারী বলিয়া গর্ববোধ করিয়া থাকে। অথচ তাহাদের বিশুদ্ধ বিশ্বাসের (?) স্বরূপ এই যে, (ইহুদীদের ন্যায়) তাহারা যেন نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ অর্থাৎ, 'আমরা

আল্লাহ্‌র সন্তান এবং বন্ধু'-এর অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় যে, তাহারা নিজদিগকে হকপন্থী বলিয়া মনে করিয়া থাকে। তাহাদের ধারণা, যাহা ইচ্ছা তাহা করিলেও তাহাদের কোন শাস্তি হইবে না।

আবার কতক লোকের ধারণা—বিশ্বাস দুরুস্ত হওয়ার পর আমলের ত্রুটি বেশী ক্ষতিকর নহে। এমন উদ্ভট ধারণার কারণ এই যে, তাহারা ইসলামের বিশ্বাস্য বিষয়সমূহের কেবলমাত্র জ্ঞান-লাভই মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করে। পূর্বে আমারও ধারণা ছিল, বিশ্বাস্য বিষয়ে শুধু জ্ঞান লাভই মুখ্য উদ্দেশ্য, আমলের সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু বহু বৎসর পরে আমি একটি আয়াত হইতে বুঝিতে পারিয়াছি যে, বিশ্বাস্য বিষয়সমূহে স্বয়ং বিশ্বাস স্থাপন যেমন উদ্দেশ্য, তেমনি আমলের জন্যও ইহা উদ্দেশ্য। আয়াতটি এইঃ

مَآاَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَافِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ ۝ لِكَيْلَاتَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتَاكُمْ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۝

এখানে প্রথম আয়াতটিতে অদৃষ্ট সম্পর্কে তা'লীম রহিয়াছে। পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজে-দের উপর যেকোন বিপদই আসে, তাহা লওহে-মাহফুয নামক দফতরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে—উহা উৎপন্ন হওয়ারও বহু পূর্বে। নিঃসন্দেহে ইহা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে অতি সহজ, (ইহা সেই ব্যক্তিই অবিশ্বাস করিতে পারে, আল্লাহ্ তা'আলার অসীম ক্ষমতার প্রতি যাহার বিশ্বাস নাই।) পরবর্তী আয়াতে উপরোক্ত বিষয়টি তা'লীম দেওয়ার কারণ বর্ণনা করিতেছেন। আমি তোমা-দিগকে এই কথাটি এই উদ্দেশ্যে বলিয়াছি, যেন কোনকিছু তোমাদের হস্তচ্যুত হওয়ায় তোমরা দুঃখিত না হও। (বরং এই ভাবিয়া সান্ত্বনা গ্রহণ কর যে, এই বিপদ বহু পূর্বেই নির্ধারিত এবং লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সুতরাং ইহার নিবারণ সম্ভব ছিল না।) আর কোন নেয়ামত লাভ করিয়া তোমরা গর্বিত হইও না। (বরং বিশ্বাস রাখিও যে, ইহাতে আমাদের কোনই কৃতিত্ব নাই। আল্লাহ্ তা'আলা এই নেয়ামত আমাদের জন্য পূর্ব হইতেই নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন।) আল্লাহ্ তা'আলা গর্বিত ও অহংকারী লোকদের ভালবাসেন না।

ইহাতে বুঝা গেল যে, অদৃষ্টের মাস্আলা তা'লীমের উদ্দেশ্য কেবল দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা নহে; বরং এই আমলও উদ্দেশ্য রহিয়াছে যে, "বিপদে ধীরস্থির থাকিবে" এবং প্রত্যেক বিপদকে অদৃষ্টের লিখন মনে করিয়া তাহাতে অধীর হইবে না। এই প্রকারে নেয়ামত পাইয়া কখনও গর্বিত হইবে না। উহাকে নিজের কৃতিত্ব মনে করিবে না। এই আয়াতটি হইতে যখন বুঝা গেল যে, বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত আমলগুলিও ইহার উদ্দেশ্য এবং ন্যায়শাস্ত্রের বিধান—

اَلشَّىْءُ اِذَا خَلَا عَنْ غَايَتِهٖ اِنْتَفٰى "কোন বস্তু স্বীয় উদ্দেশ্য হইতে শূন্য হইলে উহার অস্তিত্ব নাই বলিয়া গণ্য করা হয়।" অতএব, যে ব্যক্তি নেয়ামত বা বিপদের সময় উপরোক্ত অবস্থা অবলম্বন করে না, (অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে আগত বলিয়া মোটামুটি বিশ্বাস থাকিলেও নেয়ামতে গর্বিত এবং বিপদে অধীর হয়।) মনে করিতে হইবে, সে তাক্‌দীরের প্রতি বিশ্বাসী নহে। অর্থাৎ, পূর্ণ বিশ্বাসী নহে। পূর্ণ বিশ্বাসী হইলে বিশ্বাসের উদ্দেশ্যও সম্পন্ন হইতে দেখা যাইত।

এইরূপে যে আয়াতে 'তাওহীদের' মাসআলা তা'লীম দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে শুধু আল্লাহ্‌র একত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন উদ্দেশ্য নহে; বরং কোরআনের ঘোষণা-বাণীর প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এই নির্দেশও রহিয়াছে যে, আল্লাহ্ ভিন্ন অপর কাহারও ভয়ও করিবে না, অপর কাহারও নিকট কোন কিছুর প্রত্যাশাও করিবে না। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস করে, কিন্তু তৎসঙ্গে আল্লাহ্ ভিন্ন অপরকে ভয়ও করে এবং তাহা হইতে কোন কিছুর প্রত্যাশাও করে, সে ব্যক্তি তাওহীদে বিশ্বাসী নহে; বরং মুশ্‌রিক। সূফিয়ায়ে-কেরাম এরূপ অবস্থাকে সরাসরি শির্‌ক বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। শির্‌ক সম্বন্ধে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّ لاَيُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ○

"যে কেহ আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন কামনা করে, সে নেক আমল করিতে থাকুক এবং সে যেন তাহার প্রভুর এবাদতের সঙ্গে কাহাকেও শরীক না করে।"

হাদীস শরীফে لاَ يُشْرِكْ শব্দের তাফসীর করা হইয়াছে لاَ يُرَائِىْ অর্থাৎ, এবাদতে লোক দেখান নিয়ত রাখিবে না। ইহা হইতে বুঝা যায়, রিয়াকারী শির্‌ক বলিয়া গণ্য হয়। অথচ লোক দেখান এবাদত করিলে অপরকে মা'বুদ সাব্যস্ত করা হয় না। কিন্তু অপরের দৃষ্টিতে বড় হওয়ার উদ্দেশ্যে একটু কৃত্রিমতার সহিত এবাদত করা হয়। এই কারণে ইহাকে শির্‌ক বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহা সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসঙ্গতও বটে। কেননা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা গায়রুল্লাহ্‌র এবাদত যখন শির্‌ক বলিয়া গণ্য হয়, তখন অন্তরে অপরকে উদ্দেশ্য করিলে তাহা কেন শির্‌ক হইবে না? এই তাওহীদের সম্পর্ক তো অন্তরের সহিতই রহিয়াছে। সুতরাং আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে যদি অপরকে ভয় করা হয় এবং অপরের নিকট কিছু প্রত্যাশা করা হয়, তবে ইহাকে সূফি-য়ায়ে কেরামের 'শির্‌ক' আখ্যা দেওয়া ভুল হয় নাই। কেননা, এমতাবস্থায় তাওহীদের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। এইরূপে প্রত্যেক বিশ্বাস্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করুন, তৎসম্বন্ধীয় আয়াত হইতে বুঝা যাইবে যে, এস্থলে আমলের নির্দেশ রহিয়াছে, কেবলমাত্র নেড়া বিশ্বাস উদ্দেশ্য নহে। আমাদেরও অভ্যাস এবং রীতি-নীতি এইরূপ যে, বিশ্বাসের সঙ্গে আমলও উদ্দেশ্য করিয়া থাকি।

মনে করুন, এক ব্যক্তি বয়ঃপ্রাপ্ত এবং একটি দুগ্ধপোষ্য পুত্র রাখিয়া বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইল। দীর্ঘ দিনের পর সে বাড়ীতে ফিরিলে বড় ছেলেটি তাহাকে চিনিল এবং ছোটটি চিনিতে না পারিয়া বড় ভাইকে জিজ্ঞাসা করিলঃ ভাই, ইনি কে? সে বলিল, ইনি তোমার এবং আমার পিতা। অতঃপর ছোট ছেলেটি এই বলিয়া পিতাকে এক ঘুষি মারিল যে, "তুমি আমাদের ঘরে কেন ঢুকিলে?" তখন বড় ছেলেটি বলিলঃ আরে হতভাগা এখনই তো বলিলাম, ইনি তোর পিতা, এমন বে-আদবী কেন করিলে? আমি জিজ্ঞাসা করি, ছোট ছেলেটিকে বড় ছেলেটির ধমক দেওয়া সঙ্গত হইয়াছে কিনা? ছোট ছেলেটি হয়তো বলিতে পারে, "তুমি যখন বলিয়াছিলে ইনি আমার পিতা, আমি তাহা অস্বীকারও করি নাই? আমি তো কেবল একটা ঘুষিই মারিয়াছি।" সকলেই বলিবেন, বড় ছেলেটির ধমক দেওয়া সঙ্গতই হইয়াছে। কেননা, সে যখন বড় ভাইয়ের নিকট জানিতে পারিয়াছে লোকটি তাহার পিতা, তখন পিতার আদব রক্ষা করিলেই জ্ঞান অনুযায়ী কার্য হইত। কিন্তু যখন সে পিতা জানিয়াও ঘুষি মারিল, তখন সে জ্ঞান অনুযায়ী কার্য করে নাই।

সুতরাং তাহাকে পিতা সম্বন্ধে অজ্ঞ ধরিয়া লইয়া ধমক প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, প্রত্যেক ভাষাভাষীদেরই এই রীতি জ্ঞান বা বিশ্বাসের সহিত তদনুযায়ী কার্য করাও উদ্দেশ্য হয়। বিশ্বাসের বিপরীত কার্য হইলে বিশ্বাস নাই বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

বিশ্বাস ও জ্ঞানের জন্য গর্ব করিতে নাইঃ বন্ধুগণ! কোন বিষয়ে শুধু বিশ্বাস অর্জন করিয়াই গর্বিত হইবেন না; বরং বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আমলের প্রতিও গুরুত্ব প্রদান করুন। যাহারা বলিয়া বেড়ায়, "দুনিয়া অস্থায়ী বলিয়া আমরাও বিশ্বাস করি", কিন্তু তাহাদের কাজকর্ম সব চিরস্থায়ী মনে করার মত। তাহাদের এই বিশ্বাস যথেষ্ট নহে; বরং বিশ্বাস বলিয়াও গণ্য নহে।

সংসারবিরাগের দ্বিতীয় স্তর—দুনিয়াকে অস্থায়ী বলিয়া বিশ্বাস করিলে দুনিয়াতে কাজও এমন-ভাবে করিতে হইবে—যেমন কোন অস্থায়ী স্থানে অস্থায়ী অবস্থায় থাকিয়া করা হয়। কিন্তু দুনিয়া-বাসীর অবস্থা এইরূপ যে, প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার সম্পর্কের প্রতি আন্তরিক বিতৃষ্ণা নাই। মনের উপর বল প্রয়োগ করিয়া কেবল কৃত্রিমতার সহিত দুনিয়ার সম্পর্ক কমান হয়। ইহা যথেষ্ট নহে। কেননা, দুনিয়ার প্রতি স্থায়ীভাবে আন্তরিক ঘৃণা না জন্মিলে আশঙ্কা থাকে যে, দুনিয়ার সম্পর্ক কমাইবার জন্য কোন সময় চেষ্টার ত্রুটি হইলে, দুনিয়ার ঝামেলায় সাংঘাতিকরূপে জড়াইয়া পড়িতে পারে। উহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া পরে আর সম্ভব নাও হইতে পারে। এই কারণে দুনিয়ার অস্থায়িত্বের প্রতি বিশ্বাস এমন দৃঢ় ও স্থায়ী হইতে হইবে, যাহাতে দুনিয়ার অস্থায়িত্বকে মানসচক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় এবং স্থায়ীভাবে দুনিয়ার সম্পর্কের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা উৎপন্ন হয়। একবার ওয়ায শুনিয়া কিংবা যেকেরে মশগুল হইয়া ক্ষণকালের জন্য দুনিয়ার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হইলে যথেষ্ট হইবে না; বরং এই ঘৃণার অবস্থা এমন স্থায়ী ও দৃঢ় হইতে হইবে, যেন চিরতরে দুনিয়ার প্রতি মনে বিতৃষ্ণাভাব থাকে। ইহা 'মোকামের' বা স্থায়িত্বের স্তর বটে। ইহাই হাসিল করা চরম উদ্দেশ্য। এই মর্মেই হুযূর (দঃ) বলিয়াছেনঃ দুনিয়ার সাথে এমন ব্যবহার কর, যেমন মুসাফির মুসাফিরখানার সহিত করিয়া থাকে। অর্থাৎ, মুসাফির যেমন সফরের সময় কেবল অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যে সন্তুষ্ট থাকে, অতিরিক্ত আসবাবপত্র সঙ্গে রাখে না, এইরূপে তোমরাও সংসারে কেবল আবশ্যক পরিমাণে সন্তুষ্ট থাক। আবশ্যকের অতিরিক্ত আসবাবপত্র সংগ্রহের ফিকিরে থাকিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিও না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সফরের আড়ম্বরও স্থায়ী অবস্থার মতই হইয়া থাকে। অবশ্য তবুও স্থায়ী অবস্থার তুলনায় সফরে কিছু সংক্ষেপ নিশ্চয়ই হয়। সুতরাং আপনারা অন্তত এতটুকুই করুন যে, সফরে যেরূপ সংক্ষেপ করিয়া থাকেন, দুনিয়ায় অবস্থান-কালে তেমন সংক্ষেপই করুন। চিন্তা করিয়া দেখুন, হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে দুনিয়ার সহিত সম্পর্ক কমাইবার তা'লীম দিয়াছেন, একেবারে দুনিয়ার সম্পর্ক ত্যাগ করিতে বলেন নাই।

আমি কসম করিয়া বলিতে পারি, বিশ্বের সমস্ত আল্লাহ্‌ওয়ালা, জ্ঞানী এবং বৈজ্ঞানিকগণ একত্রিত হইয়াও যদি সংসারবিরাগের বিষয় বর্ণনা করিতেন, তবুও বিষয়টি এত সুন্দররূপে বর্ণনা করিতে পারিতেন না। তাঁহাদের সোজা বলিতে হইত, 'দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ কর।' সম্পূর্ণ -রূপে ত্যাগ করিবার তা'লীম না দিয়া সম্পর্ক কমানোর তা'লীম দিতে হইলে তাঁহারা ইহার কোন সীমা নির্ধারণ করিতে পারিতেন না যে, দুনিয়ার সহিত কি পরিমাণ এবং কিরূপ সম্পর্ক রাখা উচিত। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কোরবান হউন! কতবড় একটি বিষয়কে মাত্র দুইটি শব্দে তিনি কেমন সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেনঃ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ

যাহাতে তিনি ইহাও বলিয়া দিয়াছেন যে, দুনিয়াতে থাকিয়া দুনিয়া হইতে নিঃসম্পর্ক হওয়া কঠিন, তবে তোমরা দুনিয়াতে থাকিয়া আকাশে উড়িবার ফিকিরে লাগিও না; বরং দুনিয়াতেই থাক।

অতঃপর كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ বাক্যে থাকার সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ, মুসাফির তাহার সফরের পথ এবং বিশ্রামাগারের সহিত যতটুকু সম্পর্ক রাখে তোমরা দুনিয়ার সহিত এতটুকুই সম্পর্ক রাখ। অতএব, দেখা যায়, তিনি দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতেও বলেন নাই, সম্পূর্ণ-রূপে উহার প্রতি অনুরক্ত হইতেও অনুমতি দেন নাই; বরং কেবলমাত্র প্রয়োজনানুযায়ী দুনিয়ার সহিত সম্পর্ক সংক্ষেপ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। এই জন্যই জ্ঞানীগণ 'ইসলামী শরীঅত' বা ইসলামী জীবনব্যবস্থা দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছেনঃ "ইসলামী বিধানে এমন কোন বিষয় নাই, যাহা কার্যে পরিণত করা অসম্ভব। কাজেই তো কোরআন বজ্রগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছেঃ—

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ○ 'আল্লাহ্ তোমাদের জীবনব্যবস্থা সহজ করিতে ইচ্ছা করেন, কঠিন করিতে চান না।' مَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ 'তোমাদের ক্ষতি বা কষ্ট হইতে পারে, ধর্ম-কর্মে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য এমন কোন বিধান করেন নাই।' যাহারা বলিয়া থাকেঃ "ইসলাম বৈরাগ্য শিক্ষা দিতেছে।" তাহারা ইসলামী শরীঅত বুঝেও নাই, দেখেও নাই। আপনারা বিচার করুন, মানুষ দুনিয়ার মধ্যে মুসাফিরের ন্যায় জীবন যাপন করিলে তাহাতে কিসের বৈরাগ্য হয়। মুসাফির কি পানাহার ত্যাগ করে? কাপড় পরা বর্জন করে? মুসাফির সফরের অবস্থায় কি না করে? বরং আমরা দেখিতে পাই, কোন কোন মানুষ আজীবন সফরে কাটায়। তাহার কোন কাজেই ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে না। স্ত্রী-পুত্র সকলেই সঙ্গে থাকে, আহার, নিদ্রা, স্ত্রীসঙ্গম সমস্ত কাজই চলিতে থাকে। শুধু এতটুকু পার্থক্য হয় যে, কোন স্থান কিংবা শহরের সহিত তাহার সম্পর্ক হয় না! সর্বদা "চুলা-চাক্কি বন্ধ কর এবং গাঁঠরী বাঁধ" এই অবস্থায় থাকে।

দুনিয়ার সহিত প্রয়োজনানুরূপ সম্পর্ক রাখঃ হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাই তা'লীম দিয়াছেন যে, প্রয়োজনানুযায়ী দুনিয়ার সহিত সম্পর্ক রাখ। কিন্তু উহার সহিত মনকে আকৃষ্ট করিও না। উহাতে মজিয়া যাইও না। অতিরিক্ত ঝামেলা বাড়াইও না। যথাসম্ভব সংক্ষেপ করিবার চেষ্টা কর। ইহা বৈরাগ্যও নহে, ইহা কার্যে পরিণত করা কঠিনও নহে, কিন্তু আল্লাহ্ পাক হেদায়ত করুন, কোন কোন ওয়ায়েয সংসারবিরাগ এবং তাওয়াক্কুলের বর্ণনা আরম্ভ করিয়া এমন 'জুজুবুড়ী' বানাইয়া দেন যে, উক্ত ওয়ায়েয ছাহেবের বাপও তাহা সম্পন্ন করিতে পারিবে না। অথচ ইসলামী শরীঅতে অসম্ভব কার্য বলিতে কিছুই নাই। এ সমস্ত ওয়ায়েয যাহা বলিয়া থাকেন তাঁহাদের মনগড়া কথা, শরীঅতের তা'লীম নহে। শরীঅতে তাওয়াক্কুল এবং যুহ্‌দের অর্থ ইহা নহে যে, এক পয়সাও সঙ্গে রাখিতে পারিবে না; বরং টাকা-পয়সা সঞ্চয় করিয়াও সংসারবিরাগ এবং আল্লাহ্‌র প্রতি তাওয়াক্কুল হইতে পারে। তাহার উপায় এই যে, ধন-সম্পদের প্রতি মনকে আকৃষ্ট করিবেন না। আবশ্যকের অতিরিক্ত সঞ্চয়ের চেষ্টায় মাতিবেন না। ইহাই সংসারবিরাগ বা 'যুহ্‌দ'। যদি আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টায় মত্ত হওয়া ব্যতীত আবশ্যকের অতিরিক্ত আসবাবপত্র আল্লাহ্ তা'আলা দান করেন, তবে ইহাতেও 'যুহ্‌দ' নষ্ট হয় না।

আর 'তাওয়াক্কুল' বা নির্ভরের অর্থ এই যে, পার্থিব সম্পদ ও উপকরণকে ক্রিয়াশীল মনে করি-বেন না, উহার প্রতি নির্ভরও করিবেন না; বরং সর্ববিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন

এবং মনে করিবেন, সম্পদ বা উপকরণও আল্লাহ্র দান। উহার মধ্যে ক্রিয়া-শক্তিও আল্লাহ্র দান। এরূপ তাওয়াক্কুল লাভের জন্য দুনিয়ার আসবাবপত্র চাকুরী-নওকরী কিছুই বর্জন করার প্রয়োজন নাই।

ইহা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা যে, কেহ যদি দুনিয়ার সম্পদ অবলম্বন করিলে তাহার মনের স্থৈর্য ও শান্তি লোপ পায়, পক্ষান্তরে দুনিয়ার আসবাব বর্জন করিলে অন্তরে শান্তি পাইয়া থাকে ; আর তাহার হৃদয়ে এতটুকু বল আছে যে, পার্থিব উপকরণের সম্বল ত্যাগ করিলে কোন প্রকারে কষ্ট বা অস্থিরতা বোধ করিবে না, এমন ব্যক্তির জন্য পার্থিব উপকরণ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করারও অনুমতি রহিয়াছে। কিন্তু তাওয়াক্কুল ইহার মুখাপেক্ষী নহে। দুনিয়ার উপকরণ অবলম্বন করিয়াও তাওয়াক্কুল হইতে পারে ; বরং দুনিয়ার আসবাব ত্যাগ করিলে যাহার মনের শান্তি বিনষ্ট এবং মন অস্থির হওয়ার আশঙ্কা থাকে, এরূপ লোকের পক্ষে দুনিয়ার উপকরণ বর্জন করার অনুমতিই নাই।

বন্ধুগণ ! কোন কোন লোকের স্বভাব এমনও আছে যে, তাহাদের নিকট কিছু পরিমাণ ধন-সম্পদ না থাকিলে তাহাদের ঈমান বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হয়। তাহাদের পক্ষে দুনিয়ার আসবাব ত্যাগ করা হারাম। তাহাদের পক্ষে মাল-আসবাব সঞ্চয় করিয়া তাওয়াক্কুল করা উচিত। কেননা, বাস্তবিক-পক্ষে মাল-আসবাবের মধ্যে কোন ক্রিয়ার ক্ষমতা নাই। তথাপি উহাতে মনে কিছু সান্ত্বনা থাকে। দুনিয়ার আসবাব অবলম্বনের পক্ষে এই যুক্তিটি অবশ্যই আছে। যেমন, যদিও শৈশব হইতে আমরা দেখিয়া আসিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলাই আমাদিগকে ভাত-কাপড় দিয়া থাকেন এবং ভবিষ্যতেও সর্বদা দিতে থাকিবেন বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে, তথাপি কিছু টাকা-পয়সা হাতে থাকিলে মনে যে শান্তি ও আনন্দ থাকে, রিক্তহস্তে সেই শান্তি থাকে না। দুনিয়ার আসবাব প্রয়োজনমত প্রস্তুত থাকিলে তাহাতে একটি বড় উপকার এই পাওয়া যায় যে, তাহাতে মনে একাগ্রতা ও শান্তি থাকে।

মনে করুন, আপনি রেলগাড়ীতে আরোহণ করিলে যদি আপনার নিকট টিকেট থাকে, তবে আপনার মনে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিবে। কিন্তু টিকেট হারাইয়া গেলে উহার নম্বর প্রভৃতি স্মরণ থাকিলেও তখন দেখিবেন মনের অস্থিরতা এবং অশান্তি কতখানি।

ভুল তাওয়াক্কুলের দৃষ্টান্ত ঃ অনুরূপভাবে কোন কোন লোক চাকুরী ইত্যাদি ত্যাগ করিলে অস্থির হইয়া পড়েন। তিনি তাহা ত্যাগ করিবার অনুমতি পাইবেন না। ওয়ায়েযগণ তাওয়াক্কুল এবং যুহ্দ রক্ষার্থে মানুষকে চাকুরী পরিত্যাগ করিতে এবং টাকা-পয়সা সঞ্চয় না করিতে সাধারণকে উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের ভুল। ওয়ায়েযগণ মানুষকে এমন তাওয়াক্কুল শিক্ষা দেন—যেমন কোন এক মৌলবী ছাহেব জনৈক বাদশাহ্কে তা'লীম দিয়াছেন ঃ—"তুমি এত সৈন্য-সামন্ত কেন রাখিয়াছ ? সকলকে বিদায় করিয়া দাও।" কোন শত্রু তোমার রাজ্য আক্রমণ করিলে আমি ওয়ায-নসীহত দ্বারা তাহাকে মানাইয়া লইব। ইহাতে বাদশাহ্ সমস্ত সৈন্য-সামন্ত বিদায় করিয়া দিলেন। কিছুদিন পরেই এক শত্রু তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া বসিল। বাদশাহ্ মৌলবী ছাহেবকে ডাকিয়া বলিলেন ঃ নিন, এখন ওয়ায-নসীহত দ্বারা শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করুন ! মৌলবী ছাহেব শত্রু-দলকে যথেষ্ট বুঝাইলেন ঃ তাহারা কিছুই মানিল না। তিনি ক্ষুণ্ণ মনে বাদশাহের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ হুযূর ! ইহারা বড় বদমাইশ। কোন কথাই মানিল না। তাহাদের ঈমান বরবাদ হইয়াছে, আপনার রাজত্ব গিয়াছে। আর কি করিবেন, ছবর করুন। হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে তদ্রূপ তাওয়াক্কুলের তা'লীম দেন নাই। তিনি মহা-জ্ঞানী ছিলেন, দুনিয়ার সমস্ত জ্ঞানী তাঁহার সম্মুখে মক্তবের শিশু ছাত্রতুল্য। আল্লাহ্ তা'আলা

কাহারও মধ্যস্থতা ব্যতীত স্বয়ং তাঁহাকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে হুযূর নিজে বলিয়াছেনঃ عَلَّمَنِىْ رَبِّىْ فَاَحْسَنَ تَعْلِيْمِىْ وَاَدَّبَنِىْ رَبِّىْ فَاَحَسَنَ تَأْدِيْبِىْ "আমার প্রভু স্বয়ং আমাকে তা'লীম দিয়াছেন। অতএব, আমাকে উত্তম তা'লীম দিয়াছেন। আমার প্রভু স্বয়ং আমাকে আদব শিখাইয়াছেন; সুতরাং আমাকে উত্তম আদব শিক্ষা দিয়াছেন।"

হুযূরের তা'লীমে জিব্‌রাঈল (আঃ)-এর ভূমিকাঃ হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) হুযূরের তা'লীমের ব্যাপারে মধ্যস্থ ছিলেন না। তিনি পিয়নের ন্যায় শুধু বার্তাবাহী ছিলেন। বলাবাহুল্য, পিয়নের মধ্যস্থতা কোন মধ্যস্থতা নহে। যদি কোন শিক্ষক স্বীয় শাগরেদ কিংবা মুরীদের নিকট কোন শিক্ষণীয় বিষয় সম্বলিত চিঠি ডাকযোগে প্রেরণ করেন এবং ডাকপিয়ন সেই চিঠি উক্ত ছাত্র বা শিষ্যের হাতে বিলি করে, তবে কি কেহ বলিবেন যে, ডাকপিয়ন তাহাদিগকে উক্ত শিক্ষা প্রদান করিয়াছে? কখনই বলিবেন না; বরং চিঠি যাঁহার তরফ হইতে গিয়াছে তাঁহাকেই 'মুআল্লেম' বা শিক্ষক বলা হইবে। এইরূপে জিব্‌রাঈল আলাইহিস্‌সালাম পিয়নের ন্যায় কেবল শিক্ষণীয় বিষয়-গুলি আল্লাহ্‌র তরফ হইতে হুযূরের নিকট পৌঁছাইয়াছেন। তিনি নিজেই তা'লীম দেন নাই। মু'তাযেলা সম্প্রদায়ের বিবেক লোপ পাইয়াছে। কাজেই জিব্‌রাঈল (আঃ)-কে হুযূর (দঃ)-এর ওস্তাদের স্থান দিয়া তাঁহাকে হুযূর (দঃ) অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান মনে করিতেছে। এই বোকার দল এখন পর্যন্ত মুআল্লেম শব্দের অর্থই বুঝে নাই। জিব্‌রাঈল (আঃ)-কে ওস্তাদ অর্থে মুআল্লেম বলা হয় না; বরং বার্তাবাহী হিসাবে মুআল্লেম বলা হয়।

হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-এর দৃষ্টান্ত এইরূপ মনে করুন যে, কোন বাদশাহ্ যদি কাহাকেও মন্ত্রী নিয়োগ করিয়াছেন বলিয়া দ্বারবানের সাহায্যে নিযুক্তিপত্র পাঠাইয়া দেন, তবে বলুন তো, এই ব্যক্তিকে বাদশাহ্ মন্ত্রী পদ দিলেন, না দ্বারবান? আর যদি বাদশাহ্ রাজ্যে শৃঙ্খলা বিধানের নিমিত্ত কতকগুলি আইন লিখিয়া দ্বারবানের সাহায্যে উযীরের নিকট প্রেরণ করেন, তবে এই আইনগুলির শিক্ষাদাতা বাদশাহ্ হইলেন, না দ্বারবান? হযরত জিব্‌রাঈলের ব্যাপারও এইরূপ মনে করুন।

ফলকথা, হুযূরে আকরাম (দঃ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা মধ্যস্থতা ব্যতীতই তা'লীম দিয়াছেন। সুতরাং দুনিয়ার কোন মানুষই তাঁহার সমকক্ষ জ্ঞানী হইতে পারে না। বস্তুত তিনি দুনিয়াবাসীকে আসবাবে দুনিয়ার বা দুনিয়ার সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে নির্দেশ দেন নাই; বরং বলিয়াছেন, كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ ইহাতে দুনিয়ার উপকরণ অবলম্বনের অনুমতি রহিয়াছে, কিন্তু সংক্ষেপ করার তা'লীম দিয়াছেন। তিনি এরূপ বলেন নাই, كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ مَيِّتٌ "সংসারে মৃত ব্যক্তির ন্যায় সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক অবস্থায় বাস কর।" যদিও কোন কোন মারেফত পন্থী এইরূপ বলিয়া ফেলিয়াছেনঃ مُوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا 'তোমরা মৃতবৎ অবস্থান কর প্রকৃত মৃত্যু আসার পূর্বে', কিন্তু হুযূর (দঃ) তাহা বলেন নাই। কেননা, সকল মানুষের পক্ষে তাহা সহজও নহে, সম্ভবও নহে। তবে হুযূর (দঃ)-এর বাণী সূফিয়ায়ে কেরামের মন্তব্যের পোষকতা করে। সুতরাং মানুষ তাঁহাদের উপর এই প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিবে না যে,"সূফীগণ কোথা হইতে নূতন নূতন বেদআত আবিষ্কার করিতেছেন?" হুযূর (দঃ)-এর বাণী عُدَّ نَفْسَكَ مِنْ اَهْلِ الْقُبُوْرِ উক্ত-মন্তব্যের পোষকতা করিতেছে। যদিও তিনি مُوْتُوْا 'মৃতবৎ থাক' বলেন নাই, কিন্তু اهل قبور

'কবরবাসীর ন্যায়' তো বলিয়াছেন। সুতরাং সুফিয়ায়ে কেরামের তা'লীম একেবারে বেদআত বলিয়া গণ্য হইবে না। কেননা, হুযূরের বাণীতে উহার মূল বিদ্যমান রহিয়াছে। অবশ্য হুযূরের তা'লীম-বিশিষ্ট লোকের জন্য, সর্বসাধারণের জন্য নহে। উপরোক্ত হাদীসটির প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে, তিনি নির্দিষ্টরূপে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আমরকে সম্বোধন করিয়া এই নির্দেশ প্রদান করিয়া-ছেন। পক্ষান্তরে সর্বসাধারণের জন্য তাঁহার তা'লীম এইরূপঃ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ "দুনিয়াতে মুসাফিরের ন্যায় বাস কর।" সরাসরি كُنْ فِى الدُّنْيَا غَرِيْبًا "দুনিয়াতে একেবারে মুসাফির সাজিয়া বাস কর" বলেন নাই। ইহার কারণ এই যে, দুনিয়ার সমস্ত আসবাবপত্র দান-খয়রাত করিয়া মুসাফিরের ন্যায় মাত্র দুই বেলার খাদ্য সঙ্গে রাখিলে বিশেষ কষ্টে পতিত হইতে হইবে। পরবর্তী দিনই খাদ্যের অভাবে অস্থির হইবে, তখন হুযূর (দঃ)-এর হাদীসের প্রতি তোমার সন্দেহ হইবে, "হুযূর (দঃ) এমন নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন যাহা পালন করিতে কষ্ট হয়।" কিন্তু এখন আর সেই সুযোগ রহিল না। হুযূর তো একেবারে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া 'মুসাফির' সাজিতে বলেন নাই। তিনি তো শুধু মুসাফিরের ন্যায় দুনিয়ার আসবাবপত্রের সহিত নিঃসম্পর্ক হইয়া জীবন যাপন করিবার তা'লীম দিয়াছেন।

আল্লাহ্ওয়ালাগণ হুযূরের ভাষা বুঝিতেনঃ হুযুরের বাণীর মর্ম আল্লাহ্ওয়ালাগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারাই নবীর ভাষা যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। নিজেরা হুযূরের বাণীর ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত না হইয়া আল্লাহ্ওয়ালাদের নিকট উহাঁর অর্থ জিজ্ঞাসা করুন। আপনারা নবীর ভাষা বুঝিতে পারিবেন নাঃ تو ندیدی گھے سلیمان را ـ چه شناسی زبان مرغاں را "তুমি যখন সুলায়মান (আঃ)-কে দেখই নাই, তখন পক্ষীর ভাষা কেমন করিয়া বুঝিবে?"— كن فى الدنيا كانك غريب -এর ভাবার্থ শেখ ফরিদউদ্দীন আত্তার কবিতায় প্রকাশ করিতেছেনঃ

هر که او را معرفت بخشد خدائے ـ غیر حق را در دل او نیست جائے
نزد عارف نیست دنیا را خطر ـ بلکه بر خود نیستش هرگز نظر
عارف از دنیا و عقبٰے فارغ ست ـ زانچه باشد غیر قولی فارغ ست

"আল্লাহ্ পাক দয়া করিয়া যাঁহাকে নিজের পরিচয় দান করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে গায়রুল্লাহ্র জন্য কোন স্থান নাই, আল্লাহ্কে যিনি চিনিতে পারিয়াছেন তাঁহার নিকট দুনিয়া সম্পর্কে কোন ভাবনা নাই। এমন কি, তাঁহার নিজের প্রতিই কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। আল্লাহ্ওয়ালা লোক দুনিয়া এবং আখেরাতের চিন্তা হইতে মুক্ত। কেননা, আল্লাহ্র নির্দেশ ছাড়া আর যতকিছু আছে, সবকিছু হইতেই তিনি নিঃসম্পর্ক রহিয়াছেন।"

কবিতাগুলিতে ফরিদউদ্দীন আত্তার (রঃ) বলিতেছেনঃ অন্তরে দুনিয়ার প্রতি কোন মর্যাদা না থাকা এবং দুনিয়ার চিন্তা হইতে অন্তর মুক্ত থাকার নামই মা'রেফাত। ইহা বলেন নাই যে, হাতকেও শূন্য রাখ, অর্থাৎ, দুনিয়ার আসবাব সঞ্চয় করিও না, এমন বলেন নাই। শেখ ফরিদ (রঃ) অন্যত্র বলিয়াছেনঃ

ائے پسر از اٰخرت غافل مباش ـ با متاع ایں جہاں خوش دل مباش
در بلیات جہاں صبار باش ـ گاہ نعمت شاکر جبار باش

"বৎস! আখেরাতের চিন্তা হইতে অমনোযোগী থাকিও না। এই দুনিয়ার আসবাবের সহিত আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করিও না। দুনিয়ার বিপদ-আপদে ধৈর্য অবলম্বন কর। তাক্‌দীরের উপর সন্তুষ্ট থাক এবং সর্বদা আল্লাহ্‌ তা'আলার নেয়ামতের শোক্‌রগুযারী কর।"

ফলকথা, كانك غريب -এর অর্থ এই যে, দুনিয়ার সহিত মনকে আকৃষ্ট করিও না এবং যথা-সম্ভব দুনিয়ার ঝামেলা বাড়াইও না। অর্থাৎ, অনাবশ্যক ঝামেলা কমাইয়া দাও। 'পান্দেনামায়ে আত্তার' একটি চমৎকার কিতাব, ইহাতে কেবল আমলের কথাই রহিয়াছে। ইহা পাঠ না করিয়া মানুষ মসনবী পড়িতে অধিক আগ্রহশীল। কেননা, উহাতে আমলের কথা কম, বেশীর ভাগই তরীকতের মাসায়েল এবং তরীকতপন্থীর বিভিন্ন হাল-কাইফিয়তের বিবরণ রহিয়াছে। যাহা শেষ পর্যায়ের তরীকতপন্থীদের কাজ। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পক্ষে কাজের বা আমলের প্রতি সর্বা-পেক্ষা অধিক গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। মা'রেফাত শিক্ষায়ও প্রথমে আলিফ, বা, তা পড়ার প্রয়োজন আছে। 'পান্দেনামায়ে আত্তার' মা'রেফাত শিক্ষা ক্ষেত্রে তাহাই বটে। যে ব্যক্তি এই কিতাবটি আমলে রাখিবে, ইন্‌শাআল্লাহ্‌, সে অতি সহজে মা'রেফাত হাসিল করিতে পারিবে, অবশ্য যদি তদনুযায়ী ঠিকমত আমল করে। কেননা, আমলই ইহার পরীক্ষা।

اور امتحان بدون تو بہ آپکا غلام ـ قائل نہیں ہے قبلہ کسی شیخ و شاب کا

"জনাব! আপনার এই গোলাম (আমি) এমতেহান ব্যতীত কোন শেখ বা যুবকের মর্যাদা স্বীকার করিতে রাযী নহে।" এই মর্মেই মাওলানা রূমী বলেনঃ

کار کن کار بگزار از گفتار ـ کاندریں راہ کار باید کار

"দাবী ত্যাগ করিয়া কাজে মশ্‌গুল হও, মহব্বতের এই পথে কেবল কাজেরই আবশ্যক।" এ সম্বন্ধে শেখ সা'দী (রঃ)-ও বলেনঃ

قدم باید اندر طریقت نہ دم ـ کہ اصلے نہ دارد دمے بے قدم

"তরীকতের পথে আমল চাই, দাবী নহে। আমল ব্যতীত দাবীর কোন মূল্য নাই।"

শেখ ফরিদউদ্দীন আত্তার (রঃ) তাঁহর এই পান্দেনামা কিতাবটি মাওলানা রূমী (রঃ)-কে দিয়া-ছিলেন। মাওলানা রূমী ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ইহাকে নিজের আদর্শ করিয়া নিয়াছিলেন। আপনারা জানেন, ইহার পর তিনি কোন্ দরজায় পৌঁছিয়াছিলেন। এই হিসাবে শেখ ফরিদউদ্দীন (রঃ) মাওলানা রূমীর ওস্তাদ হন। মাওলানা রূমী (রঃ) স্বীয় মসনবী কিতাবে বহু স্থানে শেখ ফরিদউদ্দীনের বহু প্রশংসা করিয়াছেন। এক জায়গায় বলিয়াছেনঃ

ہفت شہر عشق را عطار گشت ـ ما ہنوز اندر خم یك کوچہ ایم

"হযরত আত্তার (রঃ) এশ্‌কের সাতটি শহর অতিক্রম করিয়াছেন, আমরা এখন পর্যন্ত একটি গলির মোড়ের মধ্যেই চক্কর খাইতেছি।"

এমন একজন মহামানব বলিতেছেন, দুনিয়ার সহিত মন আকৃষ্ট না করার নামই মা'রেফাত। দুনিয়া সঞ্চয় করা ক্ষতিকর নহে, অবশ্য অনাবশ্যক উপকরণ সঞ্চয় করা দূষণীয় বটে। কোন এক কবি বলিয়াছেনঃ

چیست تقوی ترك شبهات و حرام ـ از لباس و از شراب و از طعام

"পরহেযগারী কি ? পরিধেয়, পানীয় এবং খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে সন্দেহজনক এবং নিষিদ্ধ বস্তু ত্যাগ করাই তো পরহেযগারী।"

هرچه افزون ست اگر باشد حلال ـ نزد اصحاب ورع باشد وبال

"আবশ্যকের অতিরিক্ত বস্তুসমূহ হালাল হইলেও পরহেযগার লোকের পক্ষে ইহাও এক আযাব।"

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সরঞ্জাম রাখা নিষেধঃ বুযুর্গানে দ্বীন প্রয়োজনের অতিরিক্ত হালাল আমদানীকেও আযাবের সামগ্রী বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আমাদের অবস্থা এই যে, সন্দেহজনক এবং হারাম মাল দ্বারা ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছি এবং অনাবশ্যক আসবাবপত্র সংগ্রহে ব্যস্ত রহিয়াছি। আমাদের ঘরে এমন অনেক দ্রব্য আছে, যাহার কখনও আবশ্যক হয় না। কিন্তু এতটুকু শখ আছে যে, লোকে দেখিলে বলিবে, "অমুকের এতখানি ভাণ্ড-বাসন, কতখানি খাট-পালং এবং কতখানি লেফ-তোষক আছে।" এই শ্রেণীর আসবাব সঞ্চয় করিতেই হুযূর (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন। আবশ্যক পরিমাণ সরঞ্জাম রাখিতে নিষেধ করেন নাই। ইহার কারণ এই যে, অধিক পরিমাণে অনাবশ্যক দ্রব্য ভাণ্ডারে থাকিলেই তাহা মনের অশান্তি এবং অস্থিরতার কারণ হইয়া থাকে। প্রয়োজনীয় পরিমাণের সরঞ্জামে অশান্তি উৎপাদন করে না। অথচ আজকাল আমরা অনাবশ্যক সরঞ্জামাদি সংগ্রহেই বেশীরভাগ ব্যস্ত থাকি। এগুলি সঞ্চয় করিতেই আমরা অধিক সময় নষ্ট করিয়া থাকি। নচেৎ প্রয়োজনীয় সামান্য সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে আর কত সময় লাগে ? প্রত্যেক লোকেরই নিজের ঘরের তৈজসপত্রাদি হিসাব করিয়া দেখা উচিত, দৈনিক কোন্ কোন্ দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। তখনই দেখা যাইবে, দুই-চারিটি সরঞ্জাম ব্যতীত বাকী সমস্ত সরঞ্জামই কয়েকমাস কিংবা কয়েকবৎসর পরে কাজে লাগিবে। এই কথাটিই কবি 'ছায়েব' বলিয়াছেনঃ

حرص قانع نیست صائب ورنه اسباب معاش ـ آنچه ما در کار داریم اکثرےدر کار نیست

"হে 'ছায়েব' ! লোভ আমাদিগকে অল্পে সন্তুষ্ট থাকিতে দিতেছে না। নচেৎ যত সরঞ্জাম আমরা প্রয়োজনের জন্য রাখিয়াছি, উহার অধিকাংশই আবশ্যকের অতিরিক্ত।"

ইহাতে বুঝা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে কি পরিমাণ নেয়ামত দিয়া রাখিয়াছেন। এই অগণিত নেয়ামতের কথাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا

"তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতসমূহ গণিয়া শেষ করিতে পারিবে না।" আমার মতে এখানে গণনা করার অর্থ ব্যবহারে গণনা করা। অর্থাৎ, আমার নেয়ামতসমূহ তোমরা ব্যবহার করিয়া শেষ করিতে পারিবে না ; বরং অনেক দ্রব্য এমন দেখিতে পাইবে, যাহা কখনও তোমাদের ব্যবহারের সুযোগ ঘটে না। ফলকথা, মানুষ অযথা অনেক অনাবশ্যক সরঞ্জাম সঞ্চয় করিয়া রাখে। যাহার মধ্যে অযথা মন আকৃষ্ট থাকে।

মাওলানা ফরিদউদ্দীন আত্তার (রঃ) যখন দোকানদারী করিতেন, তরীকতের প্রতি এখনও মনো-যোগ দেন নাই। তখন একদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে তরীকতের প্রতি আকর্ষণ করার নিমিত্ত খোদা-প্রেমে মত্ত একজন ওলীকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। মাজ্‌যূব লোকটি তাঁহার দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং আলমারির মধ্যস্থিত বোতলগুলির মধ্য হইতে একটির প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেনঃ ইহাতে কি? তিনি উত্তর করিলেনঃ 'ইহাতে অমুক শরবত আছে।' লোকটি দ্বিতীয় একটি বোতলের দিকে ইশারা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ 'ইহাতে কি?' উত্তর আসিলঃ 'খামীরাহ্।' তৃতীয় বোতল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেনঃ 'লউক'। ইহাতে মাজ্‌যূব লোকটি অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া বলিলেনঃ "সবকিছুই তো আঠার ন্যায় আটককারী দেখিতেছি। এমতাবস্থায় (আটিত বস্তুর মধ্য হইতে) তোমার প্রাণ কেমন করিয়া বাহির হইবে?" মাওলানা আত্তার (রঃ) মুচকি হাসিয়া বলিলেনঃ "তোমার প্রাণবায়ু যেমন করিয়া বাহির হইবে আমার প্রাণও তেমন করিয়া বাহির হইবে।" মাজ্‌যূব বলিলেনঃ "আমার কি? আমি তো এইরূপে প্রাণ দিব।" এই বলিয়াই তিনি চিত হইয়া শয়ন করিলেন। অনেকক্ষণ পরও যখন তিনি আর উঠিলেন না, তখন মাওলানা আত্তার (রঃ) অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে ডাকিলেন, কোন সাড়া না পাইয়া বুঝিলেন যে, লোকটি সত্যই প্রাণ দিয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে তাঁহার মনে এমন আঘাত লাগিল যে, তৎক্ষণাৎ দোকানের সমস্ত মালপত্র দান-খয়রাত করিয়া তিনি আল্লাহ্‌র অন্বেষণে বাহির হইয়া পড়িলেন। সুতরাং আমাদের যে অবস্থা তাহাতে মনে হয়, বাস্তবিকপক্ষে আমাদের প্রাণও মৃত্যুকালে এই আসবাবপত্রের মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া সহজে বাহির হইতে চাহিবে না। বিশেষত মেয়েলোক-দের। কেননা, তাহারা অনাবশ্যক আসবাবপত্র বহুল পরিমাণে সঞ্চয় করিয়া থাকে। যাহাকিছু তাহাদের সম্মুখে পতিত হয়, উহা দেখিয়াই তাহাদের মুখের লালা নিঃসৃত হইতে থাকে। তাহাদের অবস্থা ঠিক সেইরূপ, যেমন কোন কবি বলিয়াছেনঃ لختے برد از دل گزرد هر كه زپيشم

"আমার সম্মুখ দিয়া অতিক্রমকারীদের প্রত্যেকে আমার হৃদয়ের এক টুকরা সঙ্গে লইয়া যায়।" এই পদ্যাংশটি কোন এক কবি দিল্লী শহরে আবৃত্তি করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ইহার দ্বিতীয় পাদ মিলাইতে না পারিয়া অস্থির চিত্তে বসিয়া হাবুডুবু খাইতেছিলেন। তাঁহার মনের তৎকালীন অবস্থা অবিকল اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِى كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ অর্থাৎ, "তাহারা প্রত্যেক ময়দানে অস্থির চিত্তে পেরেশান অবস্থায় ঘুরিতেছিল" আয়াতেরই নমুনা বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক কোন কবি কবি-তার পাদ মিলাইবার ফিকিরে থাকিলে তাহার অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে। এই কবিও দ্বিতীয় পাদের চিন্তায় অস্থির হইয়া হাবুডুবু খাইতেছিলেন। ঘটনাক্রমে জনৈক তরকারি বিক্রেতা নিম্নোক্ত পাদটি গাহিয়া তরমুজের ফালি বেচিতে বেচিতে কবির বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতেছিল—

من قاش فروش دل صد پارهٔ خويشم "আমি আমার শতধাবিভক্ত হৃদয়ের এক ফালি বিক্রয় করিতেছি।" ইহা শুনিবামাত্র কবি আনন্দে নাচিয়া উঠিলেন; বলিলেন, এই পাদটিই আমার কবিতার দ্বিতীয় পাদ হইতে পারে। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই হইতে পারে না। তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া তরকারি বিক্রেতাকে বলিলেনঃ "তোমার এই পাদটি আমার নিকট বিক্রয় কর।" অর্থাৎ, তুমি আমার নিকট হইতে টাকা লইয়া এই প্রতিশ্রুতি দাও যে, অতঃপর তোমাকে কেহ

জিজ্ঞাসা করিলে এই পাদটি আমার রচিত বলিবে, তোমার বলিবে না। ইহাতে তাহার ক্ষতি ছিল না। বিনা পরিশ্রমে মূল্য পাইয়া গেল। কবিও তাহার কবিতার দ্বিতীয় পাদ খরিদ করিয়া আনন্দিত চিত্তে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু এতটুকু করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল না। কেননা, আজও লোকে বলিয়া থাকে, উক্ত পাদটি তরকারি বিক্রেতার রচিত, কবি তাহার নিকট হইতে খরিদ করিয়া লইয়াছেন। এই ঘটনা না ঘটাইয়া এমনিই যদি তরকারি বিক্রেতার সেই পাদটি নিজের কবিতার সহিত যোগ করিয়া দিতেন, তবে হয়তো কেহ টেরই পাইত না যে, ইহা তরকারি বিক্রেতার রচিত; বরং সকলে উহাকে কবির রচিত বলিয়াই মনে করিত।

স্ত্রী-জাতি অত্যধিক লোভীঃ যাহাহউক, সাজ-সরঞ্জামাদি সম্বন্ধে স্ত্রী-জাতির অবস্থা অবিকল উপরোক্ত কবিতাটির মর্মার্থের সদৃশ। প্রত্যেক দ্রব্যই তাহাদের নিকট হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে। অবশ্য সতীত্ব ব্যাপারে উক্ত কবিতার মর্ম স্ত্রী-জাতির উপর প্রযোজ্য নহে। বিশেষত পাক-ভারতের স্ত্রীলোক। কেননা, এতদ্দেশীয় রমণীরা নিজের স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারও দিকে তো চক্ষু তুলিয়াও তাকায় না। তাহাদের হৃদয়ের মধ্যেও পর-পুরুষের চিন্তা কদাচ ঠাঁই পায় না। তবে অলঙ্কার এবং সাজ-পোশাকের বেলায় তাহাদের অবস্থা অবিকল এই কবিতার মর্মের অনুরূপ। কোথাও কোন নূতন অলঙ্কার বা কাপড়-চোপড় দেখিলে তাহাদের লালা পড়িতে আরম্ভ করে। নিজের কাছে যতই অলঙ্কার থাকুক না কেন, যেমন সুন্দর কাপড়ই থাকুক না কেন, কিন্তু নূতন কাটিং কিংবা নূতন ধরনের কিছু দেখিলে সঙ্গে সঙ্গেই নিজের বস্তুর প্রতি অন্তরে বিতৃষ্ণা জন্মে এবং নূতন ধরনের আর এক সেট প্রস্তুত করাইবার ফিকিরে লাগিয়া যায়।

স্ত্রী-জাতি সম্বন্ধে মাওলানা আবদুর রব ছাহেবের কৌতুকবাণী বড়ই চমৎকার। তিনি বলিতেন, মেয়েদের অবস্থা এইরূপঃ তাহাদের ষ্টকে যত ভাণ্ড-বাসনই থাকুক না কেন, জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেঃ "আর কি আছে—চার ঠিক্‌রে"। অর্থাৎ, চারিটি ভাঙ্গাচুরা। আর তাহাদের জামাজোড়া যতই ট্রাঙ্কভর্তি থাকুক না কেন, জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেঃ "আর কি আছে?—চার চিথ্‌ড়ে"। অর্থাৎ, খানচারেক ছেঁড়া-ফাটা।" আর জুতা যত জোড়াই মওজুদ থাকুক না কেন, জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া থাকেঃ "কি আর আছে—দো লীত্‌ড়ে" অর্থাৎ, দুইখানি ছেঁড়া ও পুরাতন।" ছন্দ খুব সুন্দর মিলাইয়াছেন,—'ঠিক্‌রে', চিথ্‌ড়ে' এবং 'লীত্‌ড়ে'। কেননা, তিনি দিল্লীর কৌতুক বাণী রচয়িতা কিনা! বাস্তবিক স্ত্রী-জাতির অবস্থা এইরূপই বটে।

জনৈক স্ত্রীলোক স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেনঃ "আমরা তো দোযখীই বটে। দোযখের যেমন পেট ভরে না, هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ "আরও আছে কি?" বলিতে থাকিবে, তদ্রূপ আমাদের ক্ষুধাও মিটে না। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইত্যাকার মগ্নতা হইতেই নিষেধ করিয়াছেন, যদ্দরুন অনাবশ্যক দ্রব্যে মন আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

দুনিয়ার মোহজাল হইতে মুক্তিলাভের উপায় এই যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য যথাসম্ভব সংক্ষেপ করুন, যে স্ত্রীলোক পানের অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারেন তিনি তাহা করুন। যিনি চা-পানে অভ্যস্ত, যাহাতে মন আবদ্ধ থাকে তিনি তাহা বর্জন করুন। যিনি এক টাকা গজ মূল্যের কাপড় পরিধান করেন, তিনি বার আনা গজের পরিতে আরম্ভ করুন। এইরূপে সর্বপ্রকার খরচ-পত্র এবং সাজ-সরঞ্জাম সংক্ষেপ করুন। অর্থাৎ, প্রয়োজনের পরিমাণে লাভ করিয়া ক্ষান্ত থাকুন। প্রয়োজনেরও আবার শ্রেণীবিভাগ আছে—

১। যাহা ব্যতীত কাজ চলিতে পারে না, এই পরিমাণ রাখা শুধু জায়েয নহে; বরং ওয়াজেব।

২। যাহার অভাবে কাজ চলিতে পারে বটে, কিন্তু উহা থাকিলে আরাম হয়। না থাকিলে কষ্ট হইবে। কাজ চলিলেও বড় কষ্টের সহিত চলিবে। এরূপ আসবাবপত্র রাখারও অনুমতি আছে।

৩। যেসমস্ত আসবাবপত্রের জন্য কোন কাজই আটকিয়া থাকে না, তাহার অভাবে কোন প্রকার কষ্টও হয় না, অথচ তাহা হাতে থাকিলে মন প্রফুল্ল থাকে। তবে নিজের মন প্রফুল্ল রাখার উদ্দেশ্যে সক্ষম হইলে এরূপ আসবাব রাখাও জায়েয।

৪। অপরকে দেখাইবার জন্য এবং অপরের দৃষ্টিতে বড় হওয়ার উদ্দেশ্যে কোন সাজ-সরঞ্জাম রাখা হারাম।

যেসমস্ত স্ত্রীলোক নিজের শান্তির জন্য কিংবা নিজের ও স্বামীর মন সন্তুষ্টির জন্য মূল্যবান কাপড় অথবা অলঙ্কার পরিধান করে, সামর্থ্য থাকিলে তাহাদের জন্যও ইহা পাপ নহে। অবশ্য অপরকে বাহার দেখাইবার উদ্দেশ্যে পরিলে গোনাহ্‌গার হইবে। ইহার চিহ্ন এই যে, নিজের ঘরে হীন ও তুচ্ছ মেথরানীদের ন্যায় নোংরা পোশাকে থাকে, কিন্তু কোন উৎসব উপলক্ষে কোন স্থানে বাহির হইলে নবাবযাদী সাজিয়া বাহির হয়। যেমন লক্ষ্ণৌ শহরের মজুর, সারাদিন ব্যাপিয়া লেঙ্গুট পরিয়া মজুরি করে, আর সন্ধ্যাকালে ভাড়া করা কাপড় পরিধানপূর্বক পকেটে দুই পয়সা লইয়া বেড়াইতে বাহির হয় এবং এক পয়সার পানের খিলি লইয়া চিবাইতে থাকে ও এক পয়সার ফুলের মালা গলায় পরিয়া নবাবযাদা সাজে।

এখন মহিলারা চিন্তা করিয়া দেখুন, কি উদ্দেশ্যে তাঁহারা নিত্য-নূতন জামা-জোড়া পরিবর্তন করিয়া ঘরের বাহিরে যান। ইহাতে যদি নিজের শান্তি ও মনের আনন্দ উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তবে নিজ গৃহে এরূপ সাজিয়া-গুজিয়া থাকেন না কেন? কোন কোন স্ত্রীলোক ইহার উত্তরে বলিয়া থাকেন, আমরা আমাদের স্বামীর মর্যাদা রক্ষার্থে উত্তম জামা-জোড়া পরিয়া বাহির হইয়া থাকি। যদি এই যুক্তি মানিয়া লওয়া হয়, তথাপি বলা যায়, প্রথমবারে উৎসব উপলক্ষে জামা-জোড়ার যেই ফেরিস্তি বাহির করিয়াছিলেন, আপনার ধারণা অনুযায়ী স্বামীর মর্যাদা রক্ষার জন্য ইহাই যথেষ্ট ছিল। এখন দেখা যাক, কখনও উপর্যুপরি কয়েকদিন উৎসবে যোগদান করিতে হইলে আপনি তিন দিনই এক পোশাকে যোগদান করিবেন, না প্রতিদিন নূতন পোশাক পরিবেন। আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যহ বেশ পরিবর্তন করা হয়। তবে এই পরিবর্তন কেন? স্বামীর মর্যাদা রক্ষার জন্য এক প্রহস্তই তো যথেষ্ট। কিন্তু তাহা নহে, স্বামীর মর্যাদা ভাওতা মাত্র, এই উদ্দেশ্যে কখনও প্রতিদিন নূতন নূতন পোশাক পরিবর্তন করা হয় না। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেকদিন এক পোশাকে বাহির হইতে পারেন না, যদি আর কিছুও না হয়, অন্তত ওড়না তো পরিবর্তন করিবেনই। কেননা, উহার স্থান পোশাকের উপরিভাগে এবং অভ্যাগত সকলের দৃষ্টি সর্বাগ্রে উহার উপরই পতিত হয়। অতএব, উহা অবশ্যই পরিবর্তন করা চাই, যাহাতে প্রতিদিন নূতন পোশাক পরিহিতা বলিয়া বোধ হয়।

কেবল ইহাই শেষ নহে, আবার মজলিসে বসিয়া তাঁহার অলঙ্কারের বাহার দেখাইবারও লোভ হইয়া থাকে। অনেকে তো কেবল এই উদ্দেশ্যেই মস্তক উলঙ্গ রাখেন, যাহাতে আপাদমস্তক পর্যন্ত যাবতীয় অলঙ্কার কাহারও চক্ষু এড়াইতে না পারে। তন্মধ্যে যাঁহারা আলেম-পত্নী কিংবা নিজে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিতা, তাঁহারা অবশ্য নগ্ন মস্তকে চলাফেরা করেন না। কিন্তু কোন এক ছুতায় নিজের অলঙ্কার দেখাইতে ত্রুটি করেন না। কখনও বা মাথা চুলকান, কখনও বা

কান চুলকান ইত্যাদি। ইহা সরাসরি 'রিয়া' এবং এই উদ্দেশ্যে মূল্যবান জামা-জোড়া ও সোনা-দানা পরিধান করা হারাম।

স্ত্রী-জাতির আর একটি রোগঃ মেয়েদের মধ্যে আরও একটি রোগ এই যে, ইহারা কোন উৎসবের মজলিসে গমন করিলে সমাগত সকল স্ত্রীলোকের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কারপত্র মস্তক হইতে পা পর্যন্ত ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়া লয়। কাহারও অলঙ্কার তাহার অপেক্ষা অধিক সুন্দর বা মূল্যবান কিংবা পরিমাণে বেশী কিনা এবং কাহারও অপেক্ষা সে তুচ্ছ কিনা। ইহাও উপরোক্ত 'রিয়া' এবং অহংকারেরই শাখা। পুরুষ-জাতির মধ্যে এই রোগটি তুলনামূলক কম। যদি দশ জন পুরুষ কোথাও একত্রিত হয়, তবে কাহারও মনে এরূপ কল্পনা আসে না, কাহার পরিচ্ছদ কিরূপ? এই জন্যই সে মজলিস হইতে বাহির হইয়া কাহারও পোশাকের বিবরণ বলিতে পারে না, কিন্তু মেয়েরা কয়েকজন একত্রিত হইলে কাহার স্ত্রীর কত অলঙ্কার ছিল, কিরূপ পোশাক পরিধান করিয়াছিল, সকলেরই তাহা স্মরণ থাকে। স্মরণ রাখিবেন, এই উদ্দেশ্যে মূল্যবান পোশাক এবং অলঙ্কারাদি পরিধান করা নিষিদ্ধ।

উপরে আমি যে পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কারপত্রের মধ্যে প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয়ের শ্রেণীবিভাগ দেখাইয়াছি, তাহা কেবল এই দুইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে; বরং সর্বপ্রকারের ব্যবহার্য দ্রব্যেই এরূপ শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে। ঘর-বাড়ীর ব্যাপারেও এবং ভাণ্ড-বাসনের ক্ষেত্রেও। প্রত্যেক ব্যবহার্য দ্রব্যের প্রয়োজনের মাপকাঠি এই যে, যাহা ব্যতীত কষ্ট হয় উহা প্রয়োজনীয়, যাহার অভাবে কষ্ট হয় না তাহা বেদরকারী। ইহার মধ্যে যাহা মনের আনন্দের নিয়তে হয় তাহা জায়েয এবং যাহা অপরকে নিজের বাহাদুরী দেখাইবার নিয়তে হয় তাহা হারাম। এই মাপকাঠি অনুসারে আমল করা আবশ্যক। এই মাপকাঠি দ্বারা সকলে সঠিক পন্থায় চলিতে পারে না। ইহা অনুযায়ী আমল করিতে হইলে কোন দিশারীর পরামর্শ বা উপদেশের প্রয়োজন। এখান হইতেই হয়তো আপনারা পীরের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। কবি কেমন সুন্দর বলিয়াছেনঃ

گر ہوائے ایں سفر داری دلا ـ دامن رہبر بگیر و پس بیا
یار باید راہ را تنہا مرو ـ بے قلندر زاندریں صحرا مرو

"হে মন! প্রেমের পথে যদি তোমার চলিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে কোন কামেল পীরের আঁচল ধারণ কর। নিজের বিবেক-বুদ্ধির ভরসা ত্যাগ কর। ময়দানে কামেল পীরের সঙ্গ ব্যতীত পা বাড়াইও না।"

এই উদ্দেশ্যে কোন পীরের হাতে কেবল বায়আত করাই যথেষ্ট নহে; বরং নিজেকে তাঁহার হাতে সোপর্দ করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন আছেঃ

چوں گزیدی پیر ہمیں تسلیم شو ـ ہمچوں موسی عرزہر حکم خضر رو
صبر کن در کار خضرائے بےنفاق ـ تا نگوید خضر رو ہذا فراق

'কামেল পীর অবলম্বন করিলে তুমি সম্পূর্ণরূপে নিজকে তাঁহার হাতে সোপর্দ করিয়া দাও মূসা আলাইহিস্‌সালামের ন্যায় খিযির আলাইহিসসালামের নির্দেশ অনুযায়ী চল, হে বন্ধু! পথে

সাথী খিযির আলাইহিস্‌সালামের কার্যাবলীর কারণ অনুসন্ধানে তাড়াতাড়ি করিও না। যাহাতে তিনি তোমাকে বলিয়া না ফেলেনঃ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِىْ وَبَيْنِكَ 'ইহাই তোমার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ।'

মোটকথা, প্রত্যেক বিষয়ে পীরের নিকট জিজ্ঞাসা কর—"আমি এই কাজ করিতে ইচ্ছা করি। ইহা প্রয়োজনীয় না অপ্রয়োজীয়?" কিছুদিন তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া কাজ করিতে থাক। ইন্‌শাআল্লাহ্, একদিন তুমিও দৃঢ় হইয়া যাইবে। وَ مَنْ يُّؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তিনি তাহার অন্তরকে সৎপথ দেখাইয়া থাকেন।' দৃঢ় হওয়ার উপায় এই যে, প্রথমে নিজকে কোন কামেল পীরের হাতে সোপর্দ কর এবং তাঁহার নির্দেশানুযায়ী কার্য কর। শুধু কাজ করাই যথেষ্ট নহে; বরং তাহা স্থায়ী অবস্থায় পরিণত হওয়া আবশ্যক। অনুরূপভাবে আমি এস্থলে যে সংসারবিরাগের বিষয় বর্ণনা করিতেছিলাম, তাহাতেও একথা অন্তরে দৃঢ়রূপে বসিয়া যাওয়া আবশ্যক যে, আমরা সংসারে মুসাফির ছাড়া আর কিছুই নহি, এই অবস্থাও পীরের নিকট আত্মসমর্পণের দ্বারাই হাসিল হইবে। কিন্তু আফসোসের বিষয়, আজকাল পীরের মধ্যেই সেই দৃঢ় অবস্থা নাই। ফলত যে কেহ তাঁহাকে কোন হাদিয়া পেশ করে তৎক্ষণাৎ কবূল করেন। সঙ্গত কি অসঙ্গত মোটেই বিচার করিয়া দেখেন না, আবার অনাবশ্যক সাজ-সরঞ্জামও প্রচুর পরিমাণে সঞ্চয় করিয়া রাখেন।

কোন কোন পীরের নিকট হাদিয়ার মোছাল্লা এবং গালিচা অসংখ্য পরিমাণে স্তূপীকৃত হইয়া যায়। কেহ জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস পায় না যে, এত জায়নামায কি করিবেন? অবশ্য নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও বন্ধু-বান্ধব বা মুরীদ-মু'তাকেদীনের মধ্যে বিতরণ করার নিয়তে, 'হাদিয়া-স্বরূপ' অনাবশ্যক আসবাবপত্র গ্রহণ করায় কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকালের পীর ছাহেবানের অবস্থা এই যে, অনাবশ্যক হাদিয়া গ্রহণপূর্বক সযত্নে নিজের ভাণ্ডারেই সঞ্চয় করিয়া থাকেন। ইহার কোন বস্তু বিনষ্ট হইলে আবার চাকর-নওকরদের মারধরও করেন। ইহার কারণ এই যে, দুনিয়ার মোহজালে অবদ্ধ বলিয়া এ সমস্ত সাজ-সরঞ্জামের প্রতি তাঁহাদের অন্তর আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

সংসারে গৃহহীন লোকের ন্যায় বাস করঃ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ কথাটি যদি তাঁহাদের হৃদয়ে উত্তমরূপে বসিয়া যাইত, তবে তাঁহাদের অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইত না। বস্তুত পীর ছাহেবানের জন্য হাদিয়া গ্রহণের অবস্থা এইরূপ হওয়া উচিত ছিল—যেমন হযরত গাউসুল আ'যম রাহেমাহুল্লাহ্‌র দরবারে জনৈক মুরীদ একখানা চীন দেশীয় আয়না পেশ করিলে তিনি হাদিয়া প্রদানকারীর মন সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে স্বীয় পরিচারককে ডাকিয়া বলিলেনঃ সতর্কতার সহিত এই দর্পণটি রাখিয়া দাও। আমি মাথা আঁচড়াইবার সময়ে ইহা আমার সম্মুখে আনিয়া রাখিও লোকে হয়তো মনে করিয়া থাকিবে, এই দর্পণটির প্রতি হযরত গাউসুল আ'যমের (রঃ) মন আকৃষ্ট হইয়াছে। ঘটনাক্রমে পরিচারকের হাত হইতে পড়িয়া দর্পণখানি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। হযরত শায়খ পাছে তিরস্কার করেন এই ভয়ে পরিচারক ভীত হইয়া পড়িল। ভয়ে ভয়ে সে নিবেদন করিলঃ از قضا آئینه چینی شکست "খোদার হুকুমে চীন দেশীয় আয়নাখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।" হযরত গাউসুল আ'যম তৎক্ষণাৎ একটুও চিন্তা না করিয়া পরিচারকের উচ্চারিত পাদের

সঙ্গে কবিতার দ্বিতীয় পাদ যোগ করিয়া বলিলেনঃ خوب شد اسباب خود بينى شكست
'বহুত আচ্ছা, আপন প্রতিকৃতি দর্শনের (অহংকারের) উপকরণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ভালই হইয়াছে।'

কামেল পীরের হাদিয়া গ্রহণের আর একটি অবস্থা উল্লেখ করিতেছি শুনুন। আর একবার সানজারের অধিপতি হযরত গাউসুল আযমকে লিখিলেনঃ "আমি আপনার খান্‌কার জন্য আমার দেশের নীম্‌রোয রাজস্ব 'ওযীফা'স্বরূপ দান করিতে ইচ্ছা করি। অনুগ্রহপূর্বক অনুমতি প্রদান করুন।" তদুত্তরে হযরত শায়খ নিম্নলিখিত কবিতা লিখিয়া পাঠাইলেনঃ

چوں چتـر سنـجـرى رخ بختم سياه باد ــ در دل بـود اگــر هوس ملك سنـجـرم
زانگـه كه يـافتم خبـر از ملـك نيم شب ــ من ملـك نيـم روز بيك جونـمـى خرم

"যদি আমার হৃদয়ে মুলকে সাঞ্জারের জন্য বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষাও থাকে, তবে সাঞ্জারাধিপতির কৃষ্ণ রাজছত্রের ন্যায় আমার নসীবও কালিমালিপ্ত হউক। যেদিন হইতে 'মুল্‌কে নীম্‌শব' অর্থাৎ, 'অর্ধ রাত্রি' সম্পদের সন্ধান পাইয়াছি, সেদিন হইতে আমি একটি যবের দানার বিনিময়েও 'মুল্‌কে নীম্‌রোয' অর্থাৎ, অর্ধ দিবসের রাজত্ব খরিদ করিতে নারায।"

কিসের আবেগে হযরত ইব্‌রাহীম ইব্‌নে আদ্‌হাম রাজত্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন? বিবেক-বুদ্ধি বা জ্ঞানের সাহায্যে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নহে। আমরা তাঁহার ন্যায় বাদশাহ্ হইলে সহস্র যুক্তি এই মর্মে পেশ করিতাম যে, এমন রাজত্ব ত্যাগ করা উচিত নহে। কেননা, রাজকার্য পচিালনার মাধ্যমে জনসেবার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, 'আলহামদুলিল্লাহ্', আমাদের ধর্মভাবের প্রাবল্য রহিয়াছে। আমাদের রাজত্বের দ্বারা ধর্মের যথেষ্ট সেবা ও প্রচার হইবে। তাই বলি, অপর কোন বাদশাহ্ হইলে ধর্মের বিষয় চিন্তা করিবে কিনা জানি না। কিন্তু বন্ধুগণ! ইবরাহীম ইব্‌নে আদ্‌হাম (রঃ) দৃঢ় ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন। উক্ত ভাবের প্রাবল্য তাঁহার সম্মুখে সর্বপ্রকার যুক্তির দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। তাই তিনি কোন যুক্তির ধার না ধারিয়া রাজত্ব পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এইরূপে সংসার ত্যাগের হাল বা ভাব কাহারও দৃঢ় হইলে তিনি যুক্তিরই ধার ধারেন না। ভাব-প্রাবল্যের লক্ষণই অন্যরূপ।

একদিন হযররত মাওলানা কাসেম ছাহেব (রঃ) হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ্ ছাহেব (নাউওয়া-রাল্লাহু মারকাদাহু)-এর খেদমতে আরয করিলেনঃ "হযরত! আমি চাকুরী পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি।" হাজী ছাহেব বলিলেনঃ "এখন পর্যন্ত তো জিজ্ঞাসা করিতেছ", জিজ্ঞাসা করা দ্বিধা-সংকোচের প্রমাণ এবং দ্বিধা-সংকোচ অপক্কতার লক্ষণ। অপক্ক অবস্থায় চাকুরী ত্যাগ করা সঙ্গত নহে। সময় আসিলে নিজেই রশি ছিঁড়িয়া পালাইবে। মানুষ তোমাকে ধরিবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু তুমি কাহারও বাধা মানিবে না। অন্তরে প্রবল ভাব উৎপন্নের অবস্থা এইরূপ।

হালপ্রাপ্তি উদ্দেশ্য নহে, কাজই উদ্দেশ্যঃ বন্ধুগণ! মনের মধ্যে হাল বা ভাবের সৃষ্টি করুন, ভাব না হইলে কাম চলে না। অবশ্য ভাবের উৎপাদনই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে; বরং আমলই একমাত্র উদ্দেশ্য। ভাবের প্রাবল্য ব্যতীতও যদি মানুষ স্থায়ীভাবে 'আমল' করিয়া যাইতে পারে, তাহাতেও কৃতকার্য হইতে পারে। কিন্তু ভাব উৎপাদন ব্যতীত আমলের বিষয় একটি দৃষ্টান্ত হইতে আরও পরিষ্কারভাবে বুঝিতে চেষ্টা করুন। রেল গাড়ীকে ধাক্কা দিয়াও চালান যায়, কিন্তু মানুষের শক্তিই কত? কতক্ষণ ধাক্কা দিতে পারে? অল্প কিছুদূর ঠেলিয়াই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। অতঃপর গাড়ীর গতি সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়। আমলের সহিত ভাব থাকার দৃষ্টান্ত এইরূপ, যেমন—ইঞ্জিন

উত্তপ্ত হইয়া বাষ্পীয় শক্তির বলে গাড়ীকে টানা আরম্ভ করিলে দুর্বার গতিতে চলিতে থাকে, চালক না থামাইলে কোন বাধা-বিঘ্নই উহাকে থামাইতে পারে না। কাষ্ঠখণ্ড কিংবা লৌহখণ্ড পথে রাখিয়া দিলেও উহাদিগকে ইতস্তত নিক্ষেপ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে। এরাকী (রঃ) এই 'হাল' বা ভাবের অন্বেষণেই বলিতেছেনঃ

صنمـا ! ره قلنـدر سزاوار بمن نمـائی ـ که دراز و دور دیدم ره و رسم پار سائی

"হে মুরশিদ ! আমাকে আকর্ষণের পথ দেখাইয়া দিন। কেননা, রিয়াযত ও পরিশ্রমের পথ বড়ই দুর্গমবোধ হইতেছে। এখানে راه قلند (আকর্ষণের পথ) বলিতে 'হালের' পথ বুঝান হইয়াছে। আর رسم پارسائی (রিয়াযত ও পরিশ্রমের পথ) বলিতে নিছক আমল উদ্দেশ্য করা হইয়াছে।" ফলকথা, এরাকী (রঃ) বলিতেছেনঃ খোদা-প্রাপ্তির জন্য নিছক আমলের পথ বড় দূর-দারাজের পথ। এই পথ বড়ই বিপদসঙ্কুল। মানুষ কতক্ষণ নিজেকে ধাক্কা দিয়া চালাইতে পারিবে, কতক্ষণ সে বিশুদ্ধ নিয়ত এবং অকপট মনোভাব রক্ষা করিতে পারিবে? কখনও বা 'রিয়া' উৎপন্ন হইবে, কখনও বা আত্মাভিমান আসিয়া পড়িবে। পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক আপদ হইতে কতক্ষণ সে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে? পরবর্তী কবিতাগুলিতে তিনি তরীকত-পথের উক্ত বিপদগুলির উল্লেখ করিতেছেন।

بطواف کعبـه رفـتم بحـرم رهم ندادنـد ـ که بروں درچـه کردی که دروں خانه آئی
بزمیں چوں سجده کردم ز زمیں ندا بر آمد ـ کـه مرا خراب کـردی تـو بسجـدۂ ریـائی
بقـمـار خانـه رفـتم همـه پاکبـاز دیـدم ـ چوں بصـومعـه رسیـدم همـه یافتم ریائی

"কাবা শরীফের তওয়াফ করিতে গমন করিলে হরম শরীফের দ্বারে আমাকে বাধা দিয়া বলা হইল, হরমের বাহিরেই এমন কি কাজ করিয়াছ যে, ভিতরে আসিয়া তাহা পূর্ণ করিতে চাহিতেছ? যমীনের উপর সজ্‌দা করিতে গেলে যমীন হইতে আওয়ায আসিল, 'রিয়া' সহকারে সজ্‌দা করিয়া তুমি আমাকে অপবিত্র করিয়া ফেলিয়াছ। জুয়ার আড্ডায় গমন করিয়া এ কাজে সকলকেই খাঁটি দেখিতে পাইলাম। এবাদতখানায় যাইয়া অধিকাংশ আবেদকেই দেখিলাম 'রিয়ার' সহিত এবাদত করিতেছে।"

মোটকথা, দুর্বার কর্মস্পৃহা ভিন্ন আমলের মধ্যে নিয়ত খাঁটি হওয়া ভাগ্যে জুটে না এবং দুর্বার কর্মস্পৃহা বা প্রবল ভাবাবেগ কামেল পীরের সাহচর্য ব্যতীত হাসিল হয় না।

نفس نتـواں کشـت الاظل پیـر ـ دامن آں نفس کش را سخت گیـر

"কামেল পীরের পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত নফ্‌সকে বশে আনয়ন করা কঠিন। সেই নফ্‌স সংশোধনকারী কামেল পীরের আঁচল দৃঢ়ভাবে ধারণ কর।"

প্রবল ভাবাবেগ বা দুর্বার কর্মপ্রেরণার অভাবে নফ্‌সের প্রাবল্য বিদ্যমান থাকে। শুধু আমলের দ্বারা নফ্‌সকে দমান যায় না; কর্মপ্রেরণা সবল হইলেই নফ্‌স দমিত হইয়া থাকে। দুর্বার কর্মস্পৃহা উৎপন্ন করিবার উপায়ঃ ১। অবিরত আমলে লাগিয়া থাকা। ২। দৈনিক নির্দিষ্ট সময়ে কিছু পরি-

মাণ যেকের করা। ৩। কামেল পীরের সাহচর্যে থাকা। আমি দাবী করিয়া বলিতেছি, এই তিনটি উপায় অবলম্বন করিলে ইন্‌শাআল্লাহ্, 'হাল', অর্থাৎ, দুর্বার কর্মপ্রেরণা উৎপন্ন হইবেই।

অতঃপর এই স্পৃহাকে স্থায়ী করার চেষ্টা করিলে ক্রমশ উন্নতি লাভ করিতে করিতে 'মোকাম' অর্থাৎ, চরম পর্যায়ে প্রবল কর্মপ্রেরণা হাসিল হইবে। হাল ও মোকামের মধ্যে ব্যবধান এতটুকু হইবে যে, চরম পর্যায়ের ভাবাপন্ন ব্যক্তির অবস্থা বাহিরে সাধারণ দ্বীনদার লোকের ন্যায় হইবে এবং ভিতরে তাহার উন্নতি হইতে থাকিবে। দুনিয়ার সহিত তাহার সম্পর্ক এইরূপ যে, হাতে বা অধিকারে সবকিছু থাকিয়াও সবকিছু হইতে তাহার অন্তরের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন থাকে। রাজত্ব হাতে তুলিয়া দিলেও উহার সহিত তাহার অন্তরের কিছুমাত্র সম্পর্ক হয় না। লক্ষ লক্ষ টাকার অধিকারী হইলেও উহা তাহার হৃদয়কে কিছুমাত্র আকর্ষণ করিতে পারে না। তাহাকে দুনিয়া ত্যাগ করিয়া যাইতে বলিলে তৎক্ষণাৎ সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া যাইতে তাহার কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। কেননা, দুনিয়ার কোন ধন-সম্পদকেই সে নিজের বলিয়া মনে করে না। তাহার মনে সর্বদা এই দৃঢ় বিশ্বাস বিদ্যমানঃ

فی الحقیقة مالك هر شیء خدا ست ـ ایں امانت چند روزه نزد ماست

"প্রকৃতপক্ষে খোদাই প্রত্যেক বস্তুর অধিপতি। এ সমস্ত বস্তু কিছুদিনের জন্য আমাদের হাতে গচ্ছিত রহিয়াছে মাত্র।"

সে যখন প্রত্যেক বস্তুকেই খোদার বলিয়া মনে করিতেছে, তখন উহার সম্বন্ধে কোন চিন্তা করার প্রয়োজন কি? প্রথমতঃ ইহার চেয়ে অধিক বিস্তারিত বর্ণনা করার সময় নাই। দ্বিতীয়তঃ, চরম অবস্থার লক্ষণগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রাথমিক অবস্থারই সমতুল্য বটে। আমার আশঙ্কা হয়, প্রাথমিক অবস্থায় নির্বোধরা নফ্‌সের ধোঁকায় পড়িয়া নিজদিগকে চরম অবস্থার কামেল বলিয়া মনে করে। কেননা, চরম অবস্থাপ্রাপ্ত কামেল লোকের বিপুল ক্ষমতা ও স্থায়িত্বের দরুন কর্মপ্রেরণার প্রাবল্য প্রকাশ পায় না। অতএব, প্রথম অবস্থার তরীকতপন্থীদের মধ্যে যেমন আমলের স্পৃহা থাকে না, চরম পর্যায়ের তরীকতপন্থীদের বাহ্যিক অবস্থাও তদ্রূপই দৃষ্ট হয়। বস্তুত এতদুভয় শ্রেণীর লোকের অবস্থার মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকিলেও বাহিরে তাহা অনুভূত হয় না।

তরীকতপন্থী প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং চরম অবস্থার লোকের দৃষ্টান্ত এইরূপ—মনে করুন, এক ব্যক্তি কখনও শরাব পান করে নাই বলিয়া তাহার হুঁশ-জ্ঞান বহাল আছে, ইহা প্রাথমিক অবস্থার তরীকতপন্থী। আর এক ব্যক্তি এইমাত্র শরাব পান আরম্ভ করিয়াছে, এই কারণে সে মাতাল, ইহা মাধ্যমিক অবস্থার লোক। আর এক ব্যক্তি বহু বৎসর ধরিয়া শরাবপানে অভ্যস্ত, শরাবপানে সে কিছু মাতাল হয় বটে, কিন্তু তাহা বাহিরে বিশেষ প্রকাশ পায় না। ইহা চরম অবস্থার লোক। এই ব্যক্তি মধ্যম স্তরের শরাবী অপেক্ষা অধিক পরিমাণে শরাব পান করিয়াছে বটে; কিন্তু অভ্যস্ত থাকার কারণে মধ্যস্তরের লোকের মত সে তত মাতাল হয় না। পক্ষান্তরে মধ্যম স্তরের শরাবীর অভ্যাস মাত্র অল্প দিনের বলিয়া সে নেশা বরদাশত করিতে পারে না। হুঁশ-জ্ঞান হারাইয়া ফেলে। কখনও বা 'আমি খোদা' বলিয়া দাবী করে, কখনও বা বিকট চীৎকার করিতে থাকে, তাহাকে সকলেই চিনিতে পারে। পক্ষান্তরে চরম অবস্থাপ্রাপ্ত তরীকতপন্থীকে বিশিষ্ট লোকেরা চিনিয়া থাকেন। এই অবস্থাদ্বয়ের বিষয়ে রুদলবী নিবাসী শেখ আবদুল হক (রঃ) বলিয়াছেনঃ

منصـور بچـه بود كه از يك قطره بفـريـاد آمـد
اينجـا مرد اننـد كه درياها فرو برند و آروغ نه زنند

অর্থাৎ, "মানছুর হাল্লাজ কামেল ছিলেন না, মধ্যম স্তরের 'সালেক্' ছিলেন। সুতরাং একবিন্দু পান করিয়াই চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই ময়দানে বহু কামেলও রহিয়াছেন। সমুদ্রের পর সমুদ্র পান করিলেও ঢেকুর উঠে না।"

ফলকথা, বিপুল ক্ষমতা ও স্থায়িত্ববশতঃ কামেল লোকের উপর ভাবের প্রাবল্য অধিক হয় না। তিনি স্থানচ্যুত হন না, সুতরাং তাঁহার বাহ্যিক অবস্থা প্রাথমিক স্তরের সালেকের সদৃশই মনে হয়। বস্তুত চরম অবস্থার লক্ষণাবলীও প্রাথমিক অবস্থার অনুরূপ হইয়া থাকে। এই কারণেই প্রাথমিক অবস্থার লোক ধোঁকায় পতিত হইয়া নিজেকে কামেল বলিয়া মনে করিতে পারে। সুতরাং চরম অবস্থাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ এবং লক্ষণসমূহ এখন বর্ণনা করিব না। এখন উহার প্রয়োজনও বোধ করিতেছি না। আপনারা প্রথমে আমলের প্রেরণাই লাভ করুন। অতঃপর ইন্‌শা-আল্লাহ্, ইহার চরম অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছাইবার মত লোকের অভাব হইবে না। এখন তিনটি বিষয়ের শিক্ষা গ্রহণ করুন।

তিনটি প্রয়োজনীয় পাঠঃ ১। জ্ঞান ; ২। আমল ; ৩। হাল। আপনি এই তিনটি পাঠ শিক্ষা করিলে চতুর্থ পাঠ আমি হই বা আর কেহই হন, পড়াইয়া দিবেন। যিনি মা'রেফাত সম্বন্ধে কোনই জ্ঞান রাখেন না, তিনি প্রথমে জ্ঞান অর্জন করুন। আর যিনি জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন, কিন্তু আমলে অভ্যস্ত হন নাই, তিনি আমলের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করুন। আর যাহার জ্ঞানও আছে আমলও আছে, কিন্তু হাল (ভাবাবস্থা) নাই, তিনি তাহা নিজের মধ্যে উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করুন। অবিরত চেষ্টার ফলে আপনার মধ্যে كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ হাদীসের মর্মানুযায়ী ভাবাবস্থা উৎন্ন হইলে এই লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইবে। আপনি অনাবশ্যক সাজ-সরঞ্জামের প্রতি আকৃষ্ট হইবেন না। কাহারও সহিত ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হইয়া নিরিবিলি থাকিতে পছন্দ করি-বেন। কেননা, মুসাফিরকে কেহ মন্দ বলিলে সে উহার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া সময় নষ্ট করে না। দেখুন, ষ্টেশনে কিংবা মুসাফিরখানায় কেহ কাহারও কোন ক্ষতি করিলে তজ্জন্য সে থানায় এজা-হার করে না। কেননা, সে জানে, এজাহার করিলে এই ঝামেলা শেষ করিতে কিছুদিনের জন্য তাহাকে এখানে বিলম্ব করিতে হইবে। অথচ বিলম্ব করার মত অবকাশ তাহার নাই। বস্তুত যে ব্যক্তি সফরের অবস্থায় নিজকে মুসাফিরের ন্যায় নিঃসহায় মনে না করে, সে ব্যক্তিই ঝগড়া-বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ইহা আমি এই জন্য বলিলাম যে, কেহ হয়তো বলিতে পারেন, "আমি তো সফরের অবস্থায়ও ঝগড়া-বিবাদ করিয়া থাকি।" একথার উত্তরেই আমি পূর্বাহ্নে বলিয়া দিলাম —"তখন আপনি নিজেকে মুসাফিরের ন্যায় নিঃসহায় মনে করেন না"। অন্যথায় আপনি কখনও ঝগড়া-বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া সময় নষ্ট করিতে সাহসী হইতেন না। একথার আরও একটি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আমরা কোরবান। তিনি এস্থলে كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ বলিয়াছেন, كَاَنَّكَ مُسَافِرٌ বলেন নাই। غَرِيْبٌ শব্দের লাযেমী অর্থ মুসাফির আর আভিধানিক অর্থ নিঃসঙ্গ নিঃসহায়। (আর مُسَافِرٌ শব্দের অর্থ সাধারণ

পথিক, সঙ্গী সাথী এবং সহায়-সম্বল থাকুক বা না থাকুক।) সুতরাং হাদীসে বর্ণিত غَرِيْبٌ শব্দের দ্বারা সাধারণ মুসাফির না বুঝাইয়া নিঃসম্বল, নিঃসঙ্গ ও নিঃসহায় মুসাফির বুঝায়। অতএব, হাদী-সের অর্থ এই দাঁড়ায়—"সংসারে তোমরা নিঃসম্বল-নিঃসহায় মুসাফিরের ন্যায় বাস কর।" এখন আপনারা উপরোক্ত কথাটির দ্বিতীয় উত্তর অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সহায়-সম্বলবিশিষ্ট মুসাফিরই সফরকালে ঝগড়া-বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে সাহস পায়। নিঃসহায় এবং নিঃসম্বল মুসাফির সফরকালে সকল অন্যায়-উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করিয়া থাকে। ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হইবে না।

আমি একদিন কোন এক স্থানে জনৈক নিরীহ ও নিঃসহায় মুসাফিরকে কতিপয় লোক কর্তৃক নিপীড়িত হইতে দেখিয়াছি। লোকে বলিতেছেঃ 'তুমি গোসলখানায় পায়খানা করিয়াছ।' সে ব্যক্তি নিজকে নিঃসঙ্গ, নিঃসহায় মনে করিয়া যাবতীয় উৎপীড়ন অকাতরে সহ্য করিয়া যাইতেছে। كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ বাক্যে দুনিয়াবাসীকে এই শ্রেণীর মুসাফিরের ন্যায় থাকিতেই বলা হইয়াছে।

ইসলামের আদি-অন্ত অবস্থা ঃ اِنَّ الْاِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَّ سَيَعُوْدُ غَرِيْبًا فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ 'ইসলাম গরীব' অবস্থায় আবির্ভূত হইয়াছে। অন্তিম সময় আবার 'গরীব' হইয়া যাইবে। এস্থলে غريب শব্দের অর্থ নিঃস্ব নহে। কেননা, ইসলাম ধর্মের অবস্থা কোনকালেই 'মিস্‌কীন' ছিল না। ইসলাম মিস্‌কীন অবস্থায় আবির্ভূত হইলে ধনী লোকের খোশামোদ বা তোষামোদ করিত এবং ধনীদের নিকট অবনমিত হইয়া থাকিত। কিন্তু ইসলাম কোনদিন তাহা করে নাই; বরং আবহমান-কাল হইতেই ইসলাম ধনৈশ্বর্যে গর্বিত ও অহংকারীদের দর্প চূর্ণ করিয়া আসিয়াছে। তাহাদের মিথ্যা দেব-দেবীর পরিষ্কার ভাষায় নিন্দা করিয়াছে, তাহাদিগকে স্বীয় অনুসরণের নিমিত্ত আহ্বান করি-য়াছে। মিস্‌কীন কখনও এমন সাহসী হইতে পারে কি? কখনই না। হাঁ, ইহা সত্য কথা যে, প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম অপরিচিত, নিঃসহায়, নিঃসঙ্গ ছিল। খুব অল্পসংখ্যক লোকই প্রথম অবস্থায় ইসলামের সহায়তা করিয়াছিল। অধিকাংশ লোকই উহার বিরোধিতা করিয়াছিল। এই মর্মেই হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ অন্তিম অবস্থায়ও ইসলাম অপরিচিত এবং নিঃসহায় হইয়া যাইবে। দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই উহার বিরোধিতা করিবে, অনুগত থাকিবে না, فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ অর্থাৎ, 'সেসমস্ত লোককে মোবারকবাদ, যাহারা নিঃসহায় অবস্থাতেও ইসলামকে আঁকড়াইয়া থাকিবে এবং সংসারে অপরিচিত ও নিঃসহায় থাকিবে।' কেননা, যে যুগে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে, সেই যুগে মুসলমানগণ غَرِيْبٌ অর্থাৎ, নিঃসহায় অবস্থায় দিন যাপন করিবে। বস্তুত যাহারা তখন হকের উপর থাকিবে, তাহারাই প্রকৃত আহ্‌লে-হক।

ফলকথা, আহ্‌লে-হক সকল অবস্থায়ই দুনিয়া হইতে নিঃসম্পর্ক এবং নিঃসহায়। সুতরাং তাঁহারা নিঃসহায়ের মত থাকিতেই ইচ্ছা করেন। আলোচ্য হাদীসের তা'লীমও ইহাই বটে, সুতরাং সত্য ধর্মা-বলম্বী কাহারও বিরুদ্ধাচরণের পরোয়া করে না। কেননা, তাহারা كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ হাদীসের মর্মানুযায়ী আমল করিয়া দুনিয়াতে নিজেদেরকে নিঃসহায় এবং নিঃসঙ্গ মনে করিয়াই থাকে। তাঁহারা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অপর কাহাকেও নিজের সাথী বলিয়া মনে করেন না। কাজেই কাহারও বিরুদ্ধাচরণে তাঁহাদের মনে কষ্ট হয় না। সমগ্র পৃথিবী তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেও তাঁহাদের অবস্থার কোন পার্থক্য হইবে না। তাঁহারা সবকিছু হইতে মুক্ত, তাঁহাদের অবস্থা সম্বন্ধে কবি কেমন সুন্দর বলিয়াছেনঃ

زیـر بار ند درختـاں کہ ثمـرھـا دارند ـ اۓخوشـا سروکـہ از بنـد غم آزاد آمد

"ফলবান বৃক্ষ ফলের ভারে অবনমিত হইয়া থাকে। ঝাউ বৃক্ষ কতইনা সুখী, যাহা আনন্দ এবং চিন্তা, সর্বপ্রকারের বেড়ি হইতেই মুক্ত।" সত্য ধর্মাবলম্বী হইতে অধিক সুখ-শান্তিতে আর কেহই থাকে না। শেষফল এই হয় যে, তাঁহারা দুনিয়াতেও আধিপত্য করিয়া থাকেন। বিরুদ্ধাচারীরাই শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের গোলাম হইয়া পড়ে। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে সংসারে তাঁহারা বাদশাহ্ নাও হন, কিন্তু পরলোকে তো তাঁহারাই বাদশাহ্ হইবেন।

সারকথা ঃ আপনারা সংসারে অপরিচিত ও নিঃসহায় মুসাফির হইয়া বাস করুন। দুনিয়াকে কখনও নিজের ঘর মনে করিবেন না। উক্ত বাণী অনুযায়ী নিজের অবস্থা গঠন করিয়া লউন। ইন্‌শাআল্লাহ্, অতঃপর অধিক ঝামেলা এবং অতিরিক্ত সাজ-সরঞ্জামের প্রতি আপনাআপনিই ঘৃণা জন্মিবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মন অধিক আকৃষ্ট হইবে। ইহাই আমার অদ্যকার বর্ণনার উদ্দেশ্য। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচ্য হাদীসে ইহারই তা'লীম দিয়াছেন। এখন দো'আ করুন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে আমলের 'তাওফীক' দান করুন!

وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ

— ■ —

থানাভুন শহর, নিজ বাড়ী
১৩৪১ হিজরী, ২৪শে মহররম, মঙ্গলবার,

আর্‌রেযা বিদ্‌দুনিয়া

[দুনিয়ার প্রতি সন্তোষ]

■

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ اِنَّ الَّذِيْنَ لَايَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيَاتِنَا غَافِلُوْنَ ط اُوْلٰٓئِكَ مَاْوٰهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

সূচনা

এই আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের এক বিশেষ দোষের নিন্দাবাদ করিতেছেন। আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্, উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে উক্ত বিনিন্দিত সম্প্রদায়ভুক্ত একজন লোকও নাই। কিন্তু তাহাতে আমার এই বক্তব্যকে সম্পর্কহীন এবং অনাবশ্যক মনে করা উচিত হইবে না; বরং ইহাতে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত যে, মূল সত্তার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত মানুষই এক! কাজেই যে ব্যক্তি নিন্দনীয় হয়, মূল সত্তার কারণে হয় না; বরং কোন বিশেষ দোষের কারণে মানুষ নিন্দনীয় হইয়া থাকে। উক্ত নিন্দনীয় দোষ যাহার মধ্যে থাকিবে সে ব্যক্তিই নিন্দিত হইবে। যাহার মধ্যে উক্ত দোষ থাকিবে না সে নিন্দিত হইবে না। কোরআন শরীফ পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, যাহার নিন্দা করা হইয়াছে সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিন্দনীয় দোষগুলিরও উল্লেখ করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা যাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তাহাদের বিশেষ বিশেষ গুণই হইল সন্তুষ্টির মূল। যেহেতু তাহাদের মধ্যে এইসব গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাই আমি তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট আছি।

সুতরাং বুঝা গেল যে, প্রশংসা বা নিন্দা প্রভৃতি প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয় গুণাবলীর কারণেই হইয়া থাকে। যাহার মধ্যে যেরূপ গুণ থাকিবে সে তদ্রূপ ফলই প্রাপ্ত হইবে। উপরোক্ত বর্ণনায় আর একটি প্রশ্নেরও উত্তর হইয়া গিয়াছে। কেহ মনে করিতে পারেন, যে সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া এই আয়াতগুলি নাযিল হইয়াছে, তাহাদের একজন লোকও যখন এই মজলিসে নাই, তবে এই

আয়াতগুলি এই মজলিসের জন্য কেন অবলম্বন করা হইল? অনুবাদ হইতে বুঝিতে পারিবেন, কোন্ সম্প্রদায়ের নিন্দা করা হইয়াছে, কিন্তু আমি পূর্বাহ্নে বলিয়া দিতেছি যে, সে নিন্দিত সম্প্রদায় কাফের। এই কারণেই প্রশ্ন উঠে যে, কাফেরদের সম্বন্ধীয় আয়াত এখানে কেন পাঠ করা হইল? এই প্রশ্নের উপর ভিত্তি করিয়াই কোন কোন লোক' কোন নিন্দা বা আযাবের আয়াত কাফেরদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে জানিয়া নিশ্চিন্তই হইয়া বসে। মনে করিতে থাকে, বাঁচা গেল, লক্ষ্যস্থল আমরা নহি। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখার বিষয়, যে আয়াত কাফেরদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে তাহা শুনিয়া মুসলমানদের পক্ষে নিশ্চিন্ত হওয়ার পরিবর্তে উহাকে ভীষণ চাবুক মনে করা উচিত। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়! মুসলমানগণ ইহা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া পড়েন যে, ইহা তো কাফেরদের সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে।

প্রশংসনীয় গুণ সন্তুষ্টির মূল ঃ বন্ধুগণ! ইহা সত্য যে, এই আয়াতে কাফেরদেরই নিন্দাবাদ রহিয়াছে এবং কোরআনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাফেরদেরই নিন্দা করা হইয়াছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের নিন্দা কোরআনে খুবই কম। কিন্তু চিন্তার বিষয়, কাফেরদের নিন্দাবাদের কথা আমাদিগকে কেন শুনান হইতেছে? ইহার উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত নিন্দনীয় দোষসমূহ মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া গেলে অত্যধিক বিস্ময়ের বিষয় হইবে। এই জাতীয় দোষ কাফেরদের মধ্যেই হইয়া থাকে। বলাবাহুল্য, কাহারও মূল সত্তার সহিত আল্লাহ্ তা'আলার শত্রুতাও নাই, অনুরাগও নাই; বরং মানুষের প্রশংসনীয় গুণাবলী তাঁহার সন্তোষের ভিত্তি এবং নিন্দনীয় দোষাবলী তাঁহার অসন্তোষ ও নিন্দাবাদের ভিত্তি। অতএব, যদি উক্ত নিন্দনীয় দোষসমূহ আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত এবং দাবীদার মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তবে তাহাদের পক্ষে ইহাতে অধিক লজ্জিত হওয়া উচিত এবং অনুমান করিয়া দেখা উচিত, যে দোষের কারণে কাফেরদের তিরস্কার ও নিন্দা করা হইয়াছে, ঠিক সেই দোষই যদি আমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তবে খুব ভালরূপে উহাদের সংশোধন করা আবশ্যক।

মনে করুন, এক বিদ্রোহী প্রজাকে বাদশাহ্ খুবই তিরস্কার করিলেন এবং বলিলেন, তুই বিদ্রোহ করিয়াছিস, তুই এটা করিয়াছিস, ওটা করিয়াছিস ইত্যাদি। এই তিরস্কার ও ডাঁট-দাপট শ্রবণ করিয়া অন্যান্য অপরাধীদেরও ভীত হওয়া উচিত, নির্ভীক থাকা উচিত নহে। তাহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত, বিদ্রোহী লোকটি যেসমস্ত ধারার অপরাধে অপরাধী, উহার সবগুলি কিংবা আংশিক অনুরূপ দোষ আমার মধ্যে আছে কিনা? অথবা মনে করুন, কোন এক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোক জনসাধারণের উপর যুলুম করে, প্রজাদের উপর উৎপীড়ন করে, কিংবা ডাকাতি করে; কিন্তু বিদ্রোহী নহে। অবশ্য ফৌজদারী দণ্ডবিধির অনেক ধারাই তাহার উপর প্রযোজ্য। ঘটনাক্রমে তাহারই সম্মুখে বাদশাহ্ জনৈক বিদ্রোহীকে ডাঁট-দাপট ও তিরস্কার করিলেন এবং তাহার মধ্যে যেসকল অপরাধ বিদ্যমান আছে, সেসমস্ত অপরাধের উল্লেখ করিয়াও বিদ্রোহী লোকটিকে তিরস্কার করিলেন। ইহা শুনিয়া মর্যাদাশালী লোকটিরও সতর্ক হওয়া উচিত। হাঁ, এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই আছে যে, অপরাধ লঘু হইলে অসন্তোষ কম এবং গুরুতর হইলে অসন্তোষ অধিক হইবে।

পাপী মুসলমান কাফেরের চেয়ে উত্তম ঃ অবশ্য মুসলমানের পাপ যত গুরুতরই হউক, তাহা কখনও কাফেরের সমতুল্য হইতে পারে না। ইহা ধ্রুব সত্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমান পাপী ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন না; কিন্তু ইহাতে কাহারও সান্ত্বনা গ্রহণ করা উচিত নহে যে, আমার প্রতি তো অসন্তুষ্টি কম আছে। দেখুন, এক অপরাধীর ১০ বৎসরের এবং অপর অপরাধীর

৫ বৎসরের দণ্ডাদেশ হইল। অল্পমেয়াদী দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি কি নিশ্চিন্ত হইবে? আমার ধারণা, কোন জ্ঞানবান ব্যক্তিই অপর অপরাধী অপেক্ষা তাহার দন্ডাদেশ তুলনামূলক কম হইয়াছে বলিয়া নিশ্চিন্ত হইবে না। এখানে একটি সূক্ষ্ম কথা ইহাও আছে যে, কোন কোন সময় বড় ধারা এবং গুরুতর দণ্ডাদেশ শ্রবণে তত মনঃকষ্ট হয় না—ক্ষুদ্র ধারা এবং লঘু দন্ডাদেশ শুনিয়া যত কষ্ট হইয়া থাকে। কেননা, গুরুতর অর্থাৎ, দীর্ঘমেয়াদী দণ্ডাদেশে অপরাধীর মনে নৈরাশ্য আসিয়া পড়ে এবং ইহা প্রসিদ্ধ কথা, اَلْيَأْسُ اِحْدَى الرَّاحَتَيْنِ "নৈরাশ্যও দ্বিবিধ শান্তির মধ্যে একটি।"

কথিত আছে, কোন এক অপরাধীকে বিচারক ৭ বৎসরের দণ্ডাদেশ প্রদান করিয়া বলিলেনঃ "দেখ তুমি আপীল করিও না, অন্যথায় তোমার শাস্তি আরও অধিক হইবে, আমি শাস্তি কমই দিলাম।" কিন্তু সে তাহা অমান্য করিয়া আপীল করিলে সম্ভবত তাহার প্রতি ২৮ বৎসর জেল ভোগের আদেশ হইল। এই গুরুতর দণ্ডাদেশ শ্রবণে তাহার মনে এই ভাবিয়া পূর্ণ নৈরাশ্য আসিল যে, এখন আর জেল হইতে জীবিত প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা নাই এবং নৈরাশ্যের দরুন তাহার অন্তরে এক প্রকার শান্তি আসিল।

এই হিসাবে পাপী মুসলমান লঘু শাস্তির কথা শুনিয়া অধিক চিন্তিত হওয়া উচিত। কেননা, সে নিরাশও হইতে পারিবে না। মোটকথা, যদিও শাস্তির গুরুত্ব এবং লঘুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে পাপী মুসলমান কিছু সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু নৈরাশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে লঘু শাস্তি তাহাদের পক্ষে অধিক চিন্তার কারণ। আমি ইহা এই জন্য বর্ণনা করিলাম, যেন পাপী মুসলমান কাফের অপেক্ষা লঘু শাস্তির উপযোগী হইবে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত না হয়। অধিকাংশ মানুষ এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হয় যে, অবশেষে একদিন দোযখ হইতে অবশ্যই মুক্তি পাইব। লঘু শাস্তির কথা মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া বড় ভুল। ফলকথা, কাফের এবং পাপী মুসলমানের শাস্তির ব্যবধান অন-স্বীকার্য। কিন্তু এই ব্যবধান কোন মুসলমানকে নিশ্চিন্ত করিতে পারে না; বরং কাফেরদের চেয়ে অধিক হউক, সমান হউক কিংবা কম হউক, চিন্তা মনে থাকিতেই হইবে।

আখেরাত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়ার শাস্তিঃ কিন্তু আমরা দেখিতেছি, মুসলমানগণ সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত আছে, কতক লোক তো আদৌ চিন্তা করে না। তাহাদের সম্বন্ধে আর কি বলিব? কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কোন কোন জ্ঞানবান লোকও এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেনঃ শাস্তি হইলেও কাফেরদের সমান তো আর হইবে না। আপনদের মন হইতে এই নিশ্চিন্ততা দূর করার উদ্দেশ্যেই আমি এই সমস্ত বর্ণনা পেশ করিতেছি যে, এই কল্পনা আপনারা কখনও হৃদয়ে স্থান দিবেন না। আর এই প্রতিবাদের উত্তর দিতেছি যে, ইহা শুধু কাফেরদেরই উদ্দেশ্যে প্রদান করা হইয়াছে, আমাদের আবার চিন্তা কিসের?

উত্তরের সারমর্ম হইল এই যে, যেসমস্ত দোষের কারণে কাফেরদিগকে এই শাস্তির ধমক প্রদান করা হইয়াছে, সেই শ্রেণীর কোন দোষ আপনাদের মধ্যে থাকিলে অবশ্যই আপনাদের চিন্তিত হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ, আর একটি কথা স্মরণ রাখুন, চামারকে চামার বলিয়া দশ জুতা মারিয়া দিলে তাহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। কিন্তু যদি কোন মর্যাদাসম্পন্ন সম্মানী লোককে এই জাতীয় কথাও বলা হয়, উহা তাঁহার পক্ষে নিতান্তই লজ্জার বিষয়। এইরূপে কাফেরদিগকে যদি আল্লাহ্‌র দর্শনলাভে অবিশ্বাসী, পার্থিব জীবনে সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত বা নিদর্শন-সমূহের প্রতি অমনোযোগী বলা হয়, তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছু নাই। পক্ষান্তরে মুসলমানদের

মধ্যে যদি এ জাতীয় দোষ দেখা যায় এবং তদ্দরুন তাহাদিগকে ঐসমস্ত দোষে দোষী বলা হয়, তবে ইহা নিতান্ত লজ্জার কথা। আরও দেখুন, যদি কোন একজন ভদ্র ও বিশিষ্ট লোককে কোন এক মেথরানীর সহিত বন্দী করিয়া জেলখানার এক কামরায় আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, তবে উক্ত ভদ্র লোকের জন্য কতই না লজ্জার কথা। স্মরণ রাখিবেন, দোযখ বিশেষ করিয়া কাফেরদের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মুসলমানগণ স্বেচ্ছায় কাফেরদের স্বভাব ও কার্য অবলম্বন করিয়া

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কাজে-কর্মে ও স্বভাবে যে সম্প্রদায়ের হয়, সে উক্ত সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হয় এবং সেই সম্প্রদায়েরই সঙ্গে কয়েদখানায় আবদ্ধ হওয়ার উপযোগী হয়।

تَشَبُّهْ -এর অর্থ ও ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে উল্লেখিত تَشَبُّهْ -কে আজকাল লোকে একেবারেই উড়াইয়া দিয়াছে। যদি কিছু থাকিয়া থাকে তবে তাহা কেবলমাত্র পোশাকে আছে বলিয়া মনে করে। অনেক নির্ভরযোগ্য লোক এই ভুল ধারণায় আছেন যে, ধরন-করণ এবং পোশাক-পরিচ্ছদ দ্বীনদার-পরহেযগারের ন্যায় করিয়া নিজেকে পরহেযগার শ্রেণীভুক্ত মনে করেন—কার্যকলাপ যাহাই হউক না কেন। কিন্তু এই ব্যাপারে এরূপ মনোভাবের দৃষ্টান্ত অবিকল এই ঃ

একবার এক বহুরূপী বৃদ্ধের সাজ পরিয়া পুরস্কার পাওয়ার উদ্দেশ্যে আমার নিকট আসিলে মজলিসের এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল, আল্লাহ্‌র দরবারে এসমস্ত বহুরূপীর কি অবস্থা হইবে? কখনও বা স্ত্রীলোকের সাজ গ্রহণ করে, কখনও বা মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে অন্য কোন বেশ পরিধান করে। বহুরূপী উত্তর করিল ঃ আমরা কি এসমস্ত পোশাকে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে যাইব? সেখানে মৌলবীদের পোশাক পরিয়া যাইব, তৎক্ষণাৎ আমাদের মাগ্‌ফেরাত হইয়া যাইবে। আমি ধমক দিয়া তাহাকে বলিলাম ঃ কি বাজে বকিতেছ? আল্লাহ্‌কে কেহ কি ধোঁকা দিতে পারে? আমাদের ঠিক একই অবস্থা, আলেম, ফাযেল এবং নেককারের আকৃতি ধারণ করি বটে; কিন্তু ভিতর শত শত নোংরামিতে পরিপূর্ণ। কবি বলেন ঃ

از بروں چوں گور کافر پر حلل ـ وانـدروں قهـر خدائی عز و جل
از بروں طعنـه زنی بر بایـزیـد ـ وز درونـت ننـگ میـدارد یزیـد

"কাফেরের সমাধির ন্যায় তোমার বাহির জাঁকজমকপূর্ণ সাজে সজ্জিত, কিন্তু অভ্যন্তরে মহাশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার দারুণ ক্রোধ রহিয়াছে। তোমার বাহ্যিক অবস্থা হযরত বায়েযীদের (রঃ) ন্যায় মহাতাপসকেও হার মানায়। কিন্তু তোমার অভ্যন্তরস্থ কু-প্রকৃতি ও নোংরা স্বভাব ইয়াযীদকেও লজ্জিত করে।" আমাদের মধ্যে বহিরাকৃতির দরবেশ অনেক আছেন, কিন্তু স্বভাব-চরিত্রের দরবেশ খুবই কম।

ফলকথা, এই হাদীসটি শুধু আকৃতি এবং পোশাকের জন্যই খাছ (নির্দিষ্ট) নহে; বরং প্রত্যেক অবস্থার জন্যই ব্যাপক। মানুষ এই হাদীস সম্পর্কে অনর্থক বুলি আওড়াইয়া থাকে। তাহারা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, হাদীসটি নিতান্ত যুক্তিপূর্ণ। বিশিষ্ট ও সাধারণ সর্বপ্রকার লোকই ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। দেখুন, কোন ব্যক্তি বৃথা ও অনর্থক কথা বলিতে আরম্ভ করিলে তাহাকে বলা হয় ঃ "তুমি চামার হইয়া গিয়াছ" কিংবা কোন ব্যক্তি সদা-সর্বদা নপুংসক লোকদের মধ্যে অবস্থান করিতে থাকিলে তাহাকে নপুংসকদের মধ্যেই গণ্য করা হয়। ব্যাপার

যখন এরূপ, তখন আমরাও কাফেরদের স্বভাব এবং কার্যকলাপ অবলম্বন করিলে তাহাদের সদৃশ এবং সমতুল্য হইয়া যাইব এবং তাহাদের সঙ্গে আমাদিগকে দোযখেও যাইতে হইবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ "খোদা, আমি তোমার নিকট বেহেশ্‌তের প্রার্থনা করিতেছি এবং দোযখ হইতে 'পানাহ্‌' চাহিতেছি।" অন্যথায় দোযখের সহিত মু'মিন লোকের কোন সম্পর্ক নাই।

বেহেশ্‌ত যেমন পরহেযগার লোকদের জন্য নির্দিষ্ট, তদ্রূপ দোযখও কাফেরদের জন্য নির্দিষ্ট। মধ্যবর্তী একদল লোক কাফেরও নহে পরহেযগারও নহে, তাহারা কাফেরদের ন্যায় প্রথমবারেই বেহেশ্‌তেও যাইবে না; কিন্তু ঈমানে পরহেযগার লোকের সদৃশ বলিয়া কিছুকাল দোযখে শাস্তি ভোগের পর বেহেশ্‌তে চলিয়া যাইবে। অতএব, ঐসমস্ত লোক বেহেশ্‌তে গমনের উপযোগী হইবে যাহারা পরহেযগার অথবা পরহেযগারসদৃশ; অন্যথায় নহে। অবশ্য যাহারা পরহেযগার নহে; বরং পাপী মু'মিন, তাহারা পাপ হইতে যখন পাক-ছাফ হইয়া যাইবে, তখন বেহেশ্‌তে গমনের উপযোগী হইবে। যেমন, চেরাগের গায়ে গাদ জমিয়া মরিচা ধরিলে আগুনে পোড়াইয়া উহাকে পরিষ্কার করা হয়। তৎপর উহা পবিত্র স্থানে ব্যবহারের যোগ্য হয়। এইরূপে পাপী মুসলমানকে দোযখের আগুনে পোড়াইয়া পরিষ্কার করা হইবে। তখন তাহারা বেহেশ্‌তের যোগ্য হইবে।

দোযখে শাস্তিদান ও পবিত্রকরণ ঃ পাপী মু'মিনকে দোযখের আগুনে পবিত্র করার আর একটি দৃষ্টান্ত বুঝিয়া লউন। শিশু যদি মলমূত্রে লিপ্ত হইয়া যায় তখন বলা হয়, ইহাকে গোসলখানায় নিয়া ভালরূপে রগ্‌ড়াইয়া আন, তাহার শরীরের ময়লা ছাঁচিয়া পরিষ্কার কর। এইরূপে দোযখকেও গোসলখানা মনে করুন। কিন্তু গোসলখানার রগ্‌ড়ান বরদাশ্‌ত হইলেও দোযখের রগ্‌ড়ান, ছাফাই এবং পরিষ্কার করা কখনও বরদাশ্‌ত করা যাইবে না। ফলকথা, কাফেরদের সহিত সামঞ্জস্য থাকার দরুনই পাপী মুসলমান দোযখে যাইবে। প্রভেদ শুধু এতটুকু যে, কাফেরদিগকে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে দোযখে অনন্তকালের জন্য পাঠান হইবে, আর মুসলমান পাপীকে পাক-ছাফ করার উদ্দেশ্যে; কিন্তু কষ্ট ও যন্ত্রণা অবশ্যই হইবে। দেখুন, হাম্মামখানায় যখন ঝামা দ্বারা ঘষা হয় তখন কেমন কষ্ট হয়! অতএব, "পরিষ্কার করার জন্য দোযখে দেওয়া হইবে" কথায় পাপী মুসলমানের কি লাভ হইল? দোযখে প্রবেশ করিতেও হইল, যন্ত্রণা এবং কষ্টও ভোগ করিতে হইল। মনে করুন, এক ব্যক্তির দেহে যদি ছুরি ঢুকাইয়া দেওয়া হয়, আর এক ব্যক্তির শরীরে সূঁই বিঁধাইয়া দেওয়া হয়, তবে আর একজনের কষ্ট অধিক দেখিয়া সে নিজের অপেক্ষাকৃত কম কষ্ট নিশ্চিন্ত মনে কি সহ্য করিতে পারিবে? কখনও না। আমরা দোযখের সেই কঠিন শাস্তি কেমন করিয়া বরদাশ্‌ত করিব? ছুরিকার অগ্রভাগের সামান্য আঁচড় কিংবা সূক্ষ্ম শলাকার সামান্য জখমও সহ্য করিতে পারি না। সুতরাং পাপী মু'মিনের মনে এই ভাবিয়া সান্ত্বনা গ্রহণ করা উচিত নহে যে, তাহাদের শাস্তি কাফেরদের চেয়ে লঘু হইবে।

যেমন, আবু তালেব সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, দোযখে তাঁহার শাস্তি সর্বাধিক লঘু হইবে। যেহেতু তিনি হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজীবন যথেষ্ট সেবা করিয়াছিলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলার হেক্‌মত ও কৌশলের উপর কোরবান হউন, আবু তালেব রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এত ভালবাসিতেন, অথচ অন্তিম মুহূর্তে 'কালেমা' পড়া তাঁহার

ভাগ্যে হইল না। মৃত্যুকালে কালেমা উচ্চারণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন; কিন্তু খোদা আবু জাহ্‌লের বিনাশ করুন, দুরাচার তখনও তাঁহাকে কুমন্ত্রণা দিল। অবশেষে ঈমানবিহীন অবস্থায়ই তাঁহার জীবনের অবসান ঘটিল। এই ঘটনাটি বর্ণনা করার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু যেহেতু ইহা হইতে একটি মাসআলা বাহির করা উদ্দেশ্য ছিল, কাজেই বর্ণনা করিলাম।

মহব্বত প্রকাশ করা নাজাতের জন্য যথেষ্ট নহেঃ আমি যে মাসআলা বাহির করিতে মনস্থ করিয়াছি তাহা হয়তো আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন। আজকাল মানুষ শুধু ওয়াযের মজলিস কিংবা মীলাদের মাহ্‌ফিলের অনুষ্ঠান করাকেই নাজাতের কারণ মনে করিয়া থাকে এবং বলে, আল্লাহ্ ও রাসূলের সহিত আমাদের যথেষ্ট মহব্বত আছে। ইহাকেই নাজাতের জন্য যথেষ্ট মনে করিয়া থাকে। নামাযেরও প্রয়োজন মনে করে না, রোযারও না, হজ্জেরও না এবং মাগফেরাত প্রার্থনারও না। ইহার জন্য শিক্ষিত লোকগণই অধিক দায়ী। তাঁহারা নিজেদের লোভ-লালসা চরিতার্থকরণের নিমিত্তই এই প্রথা জারি করিয়াছেন। সর্বসাধারণকে সন্তুষ্ট রাখার উদ্দেশ্যে মজলিসে এমন বিষয়বস্তু অবলম্বনে ওয়ায করিয়া থাকেন যে, ছাহেবান! দাড়ি কামান, নাচ-গান করুন, বাজনা বাজান কিছু ক্ষতি নাই, সব মাফ হইয়া যাইবে; কিন্তু হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মহব্বত রাখুন। আর ঐ অবিশ্বাসী ওয়াহাবীদের মজলিসে বসিবেন না। ইহারা ওয়াহাবী নাম দিয়া থাকে সত্যিকারের সুন্নী সম্প্রদায়কে, যদিও তাঁহারা যথারীতি হানাফী মযহাবের মুকাল্লেদ। ওয়াযের মজলিসে তাঁহারা ইহাও বলিয়া থাকেন যে, "যাহা ইচ্ছা কর, পরোয়া নাই। কিন্তু কেবল আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি মহব্বত রাখ।" সর্বসাধারণের উপর ইহার ক্রিয়া এই হইয়াছে যে, তাহারা সমস্ত আমলকে অনাবশ্যক মনে করিয়া লইয়াছে। এই সমস্ত লোকের আবু তালেবের ঘটনা হইতে বুঝিয়া লওয়া উচিত—আজকাল যত লোকই হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মহব্বতের দাবী করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কাহারও মহব্বতই আবু তালেবের সমকক্ষ নহে। আবু তালেব ঐ ব্যক্তি, যিনি কোরাইশ সম্প্রদায়ের সকলে হুযূর (দঃ)-এর সঙ্গ-সহায়তা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেও তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন এবং হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষপাতিত্বের দরুন যথেষ্ট কষ্ট সহিয়াছিলেন। আজকাল তো আমাদের অবস্থা এইরূপ, শরীঅতে মোহাম্মদীর বিরুদ্ধাচণের জন্য প্রস্তুত হইয়া যাই। মৌখিক মহব্বতের দাবী-দারের মহব্বতের দৌড় নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বুঝিতে পারিবেন—

এক মজলিসে ইমাম বংশের উপর ইয়াযীদের অত্যাচার কাহিনী বর্ণিত হইতেছিল। শ্রোতাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "দুঃখের বিষয় তখন আমি ছিলাম না, নচেৎ এরূপ করিতাম, ঐরূপ করিতাম ইত্যাদি।" এই ভণ্ডামি দেখিয়া গ্রাম্য সাদাসিধা এক লোক উত্তেজিত হইয়া বলিলঃ "আমি বলি, আমি ইয়াযীদ। আমি এরূপ করিয়াছি, ঐরূপ করিয়াছি, সাহস থাকিলে আস।" ইহা শুনিতেই উক্ত বাহাদুর ব্যক্তি ঘাব্‌ড়াইয়া গেল। আজকালকার মহব্বতে রাসূলের দাবীদারগণের অবস্থাও এইরূপ মনে করিবেন।

অতএব, দেখুন, হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যে আবু তালেবের এত অনুপম মহব্বত ছিল, শুধু মহব্বতের দাবী নহে; বরং সত্যিকারের মহব্বত। এতদ্‌সত্ত্বেও এই মহব্বত তাঁহাকে দোযখ হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। কেননা, মহব্বত নেড়া ছিল, তৎসঙ্গে আনুগত্য ছিল না। আজকালকার দাবীদারগণ তো অত খাঁটি মহব্বতেরও দাবী করিতে পারে না। যদি করেও, তবে স্মরণ রাখিবেন, وَجَائِزَةٌ دَعْوَى الْمَحَبَّةِ فِى الْهَوٰى - وَلٰكِنْ لَّا يَخْفٰى كَلَامُ الْمُنَافِقِ

"মহব্বতের মৌখিক দাবী করা অবিধেয় নহে। কিন্তু মোনাফেকের কথা আল্লাহ্‌র নিকট গোপন থাকে না।" আমি বলি, মহব্বতের সহিত হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্বন্ধে আলোচনা কর। কিন্তু নিয়মমত আলোচনা কর। ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-ও হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্বন্ধে তাঁহাদের অবস্থা সর্বদা এইরূপ ছিলঃ

ما هرچه خوانده ایم فراموش کرده ایم ـ الا حدیث یارکه تکرار می کنیم

"আমরা যাহাকিছু পড়িয়াছি, ভুলিয়া গিয়াছি, কেবল দোস্তের আলোচনা ভুলি নাই, তাহা প্রতি-মুহূর্তে আমাদের ওযীফা হইয়া রহিয়াছে।" তাঁহারা প্রতিমুহূর্তে হুযূর (দঃ)-এরই আলোচনা করিতেন। যেমন, মাওলানা ফজলুর রহমান ছাহেব বলিতেনঃ "আমরা তো প্রত্যেক সময়ই মীলাদ পড়িয়া থাকি। অর্থাৎ, لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ পাঠ করি। এই কালেমা তাইয়্যেবার মধ্যেও তাঁহারই আলোচনা হইয়া থাকে। হুযূর (দঃ)-এর স্মরণ আমাদের হৃদয়ে সকল সময়ই বিরাজমান, মুখে ও হাতে আমরা সর্বদা হুযূরের স্মরণে নিয়োজিত আছি।" সোব্‌হানাল্লাহ্‌! কেমন সুন্দর জ্ঞানগর্ভ কথা বলিয়াছেন যে, ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) প্রতিনিয়ত হুযূর (দঃ)-এর আলোচনা করিতেন। নিছক আলোচনাই করিতেন না; বরং হুযূরের যেসমস্ত গুণাবলী আলোচনা করিতেন তদ্রূপ নিজদিগকে গঠন করারও চেষ্টা করিতেন। আজকাল যে ধরনের 'মীলাদ' প্রচলিত হইয়াছে, ছাহাবায়ে কেরামের যুগে ইহার নামগন্ধও ছিল না। কোন ছাহাবী কোন সময় মিঠাই বা বাতাসা-জিলিপী বিতণ করেন নাই। কখনও মীলাদের জন্য তারিখ নির্দিষ্ট করেন নাই। কেহ যদি বলেনঃ "আমরা তো আনন্দে মিঠাই বিতরণ করিয়া থাকি।" আমি তদুত্তরে বলিবঃ "দৈনিক কেন বিতরণ করেন না?" এক বিশেষ মজলিস জমাইয়া তাহাতে কেন বিতরণ করা হয়? এইরূপ 'কিয়াম'ও। এ সম্বন্ধেও আমার বক্তব্য—এই নির্দিষ্ট মজলিসে নির্দিষ্ট সময়ে দাঁড়াইয়া পড়ার কারণ কি? এখন যে হুযূরের আলোচনা চলিতেছে, এখন কেহ দাঁড়ান না কেন? স্মরণ রাখিবেন, ইহা পয়সা উপার্জনকারীদের মনগড়া আবিষ্কার। মজলিসের প্রত্যেকটি অংশকে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিতে তৈয়ার করিয়া লইয়াছেন, যাহাতে মানুষ প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহাদের মুখাপেক্ষী থাকে। যখনই জনসাধারণ তাঁহাদের দ্বারা উক্ত কার্যের অনুষ্ঠান করিবে, তখনই তাঁহাদিগকে কিছু দান করিবে। আবার যখন ওয়ায়েয ছাহেব কিছু পাইলেন, তখন মজলিসে যোগদানকারীদেরও কিছু পাওয়া উচিত। এই কারণে মিঠাই বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

লোকে আরবের দস্তুর ও প্রথা দ্বারা এসমস্ত বিষয় প্রমাণ করিতে চায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহারা জানে না যে, আরব দেশে কোন্ পদ্ধতিতে মীলাদ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যদিও আরব দেশের অধুনা প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠানে কিছু ন্যূনাধিক্য আছে, তথাপি আমাদের দেশের তুলনায় তথাকার অনুষ্ঠান যথেষ্ট অনাড়ম্বর ও সরল। মিঠাই বিতরণ করা হয় সত্য, কিন্তু উহার অবস্থা এই যে, অর্ধ মজলিসে বিতণের পর শেষ হইয়া গেলে বিনা দ্বিধায় বলা হয়—'খালাছ'। অর্থাৎ, শেষ হইয়া গিয়াছে। আচ্ছা! এদেশে কেহ এরূপ মজলিস করিয়া দেখান তো? কসম করিয়া বলিতেছি, এখানে মীলাদের নামে যাহাকিছু হইতেছে সবকিছুই 'ফখর' বা আড়ম্বর প্রকাশের জন্য বটে।

ঈসালে সওয়াবের সহজ পন্থাঃ বন্ধুগণ! মহব্বতের রকমই স্বতন্ত্র। শাহ্ আবদুর রহীম ছাহেব দেহ্‌লবী প্রতিবৎসর রবিউল আউয়াল মাসে কিছু খাদ্য প্রস্তুতকরত বিতরণ করিতেন। একবার

তিনি কোন খাদ্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলেন না, অগত্যা যৎকিঞ্চিৎ ছোলা ভাজাইয়া বিতরণ করিলেন। পরবর্তী রাত্রেই স্বপ্নে দেখিলেন, হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ছোলা ভাজা খাইতেছেন। দেখুন, আল্লাহ্‌ওয়ালাগণই মহব্বত করিতে জানেন, তাঁহাদের নিকট হইতে শিক্ষা করুন এবং তাঁহাদের অনুসৃত পথে চলুন।

আমি ঈসালে সওয়াবের সহজ পন্থা বলিয়া দিতেছি; কিন্তু সেই পন্থা নফ্‌সের পছন্দ হইবে না। তাহা এই যে, যাহাকিছু দান-খয়রাত করিতে ইচ্ছা করেন; গোপনে করিবেন। রবিউল আউয়াল মাসে ৫০ পঞ্চাশ টাকা খয়রাত করুন, কিন্তু কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না। এক টাকা করিয়া এক একজন মিস্‌কীনকে দান করুন। যদি বাস্তবিক হুযূরের প্রতি সত্যিকারের মহব্বত থাকে, তবে এই পন্থায় আমল করুন। কিন্তু আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি, এরূপ কখনও পারিবেন না। নফস কুমন্ত্রণা দিবে—"মিঞা! ৫০ টাকা খরচ হইল, অথচ কেহই জানিতে পারিল না।"

আজকাল তো মীলাদ মাহ্‌ফিলের অবস্থা এই পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, আমি কানপুরে অবস্থানকালে এক ব্যক্তি আসিয়া মীলাদ পাঠের জন্য আমাকে দাওয়াত করিয়া লইয়া গেল। আমি যথাসময়ে হুযূরের মীলাদ ও অন্যান্য আখলাক্ সম্বন্ধে ওয়ায সমাধা করিয়া আসিলাম। পরবর্তী দিন জানিতে পারিলাম, সেই মঞ্চে বাইজী কর্তৃক নাচ-গান অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা শ্রবণে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, সে বাড়ীতে বিবাহের উৎসব ছিল। তাহার মূল উদ্দেশ্য ছিল নাচ-গানের অনুষ্ঠান করা। কিন্তু কোন কোন সৎভাবাপন্ন বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে মীলাদেরও আয়োজন করিয়াছিলেন। অতএব, বুঝিতে পারেন, এই মীলাদের ব্যবস্থা হুযূরের মহব্বতের কারণে ছিল না; বরং বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে বাধ্য হইয়া করিতে হইয়াছিল। আরও মজার কথা এই যে, মীলাদ অনুষ্ঠান নাচ-গানের সঙ্গে সমান তালে একই মঞ্চে করা হইয়াছিল।

نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْهُ তথাপি লোকে বলে, আমাদের হৃদয়ে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর মহব্বত আছে, আমরা তাঁহার অনুরক্ত।

কানপুরে থাকাকালে আমার কানে আসিত, "অদ্য অমুক বেশ্যা বাড়ীতে মীলাদের মজলিস হইবে, আজ অমুক বেশ্যালয়ে হুযূরের জীবনী অবলম্বনে বক্তৃতা হইবে।" দুঃখের বিষয়, এ সমস্ত এলাকার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় 'যেনা' সম্বন্ধীয় ওয়ায কেহই সেখানে করে না। নিছক রাসূলের জীবনী আলোচনায় কি ফল হইবে? দেখুন, দস্তরখানে যদি শুধু চাট্‌নী রাখা হয়, তবে কেবল ইহা ভক্ষণে কাহারও তৃপ্তি হইতে পারে কি? কখনই না; বরং চাট্‌নী না দিয়া যদি শুধু খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হয় তথাপি তাহাতে কাজ চলিতে পারে। অবশ্য উভয় বস্তু একত্রে দেওয়া হইলে—

نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ 'আলোর উপর আলো' অর্থাৎ, অতি উত্তম হয়।

এই প্রসঙ্গে এতগুলি কথা বলিলাম যে, মানুষ মহব্বতের দাবী করিয়া থাকে; কিন্তু কাজ করে উহার বিপরীত এবং মহব্বতের দাবী করিয়াই পরিত্রাণ পাইবার আশা পোষণ করিয়া থাকে। তাহারা একবার আবু তালেবের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করুক, তাঁহার পরিণাম কি হইবে। অবশ্য অন্যান্য কাফেরের তুলনায় তাঁহার শাস্তি অনেক লঘু হইবে। হুযূর (দঃ)-এর বদৌলতে আবু তালেবের পায়ে কেবল একজোড়া আগুনের জুতা পরিহিত থাকিবে। কিন্তু ইহাও এমন যন্ত্রণাময় হইবে যে, তিনি মনে করিবেন, আমার চেয়ে অধিক কষ্ট বোধ হয় কেহই ভোগ করিতেছে না।

দুনিয়াতেই দেখুন, কাহারও পায়ে যদি একটা বাবুলের কাঁটাও বিধে, তাহার অবস্থা কেমন হইয়া থাকে ? অতএব, যদি কেহ মনে করেন যে, কাফেরদের চেয়ে আমার শাস্তি তুলনামূলক লঘু হইবে, তবে তিনি ভাল করিয়া চিন্তা করুন, দোযখের লঘু শাস্তিও বরদাশ্‌ত করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং কাহারও এরূপ ধোঁকায় পতিত থাকা উচিত নহে যে, "আমার শাস্তি অপেক্ষাকৃত লঘু হইবে।" আশা করি, আমার এই দীর্ঘ আলোচনায় আপনাদের অলীক সন্দেহের অবসান ঘটিয়াছে।

নিশ্চিন্ত থাকার পরিণতি ঃ এখন ঐসব আলোচ্য আয়াতে তিরস্কার ও নিন্দাবাদ করা হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "যাহারা মৃত্যুর পরে আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে বলিয়া বিশ্বাস করে না।" অবশ্য এই অবিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। কেননা, আমরা তো তাহা বিশ্বাস করি, কিন্তু ইহাতেও নিশ্চিন্ত হওয়ার কিছু নাই। কারণ, এই দোষ না থাকার কারণে শাস্তি লঘু হইবে বটে ; কিন্তু শাস্তি তো নিশ্চয়ই হইবে। অতঃপর আরও দোষের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন ঃ

وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ○

"আর যাহারা পার্থিব জীবনে সন্তুষ্ট হইয়া উহাতে নিশ্চিন্ত রহিয়াছে এবং যাহারা আমার নির্দেশ -সমূহ হইতে অমনোযোগী।" আয়াতে মোট চারিটি দোষের উল্লেখ করিয়া উহার প্রতিফলস্বরূপ বলা হইয়াছে ঃ أُولٰئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ "তাহাদের ঠিকানা দোযখে।" এই শোচনীয় পরিণতি হইতে বুঝা গেল যে, এই চারিটি দোষের শাস্তি এমন জঘন্য, যাহা বড়ই নিন্দনীয় এবং দূষণীয়। কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, 'সমষ্টিগতভাবে চারিটি দোষের পরিণামই শোচনীয়। আমাদের মধ্যে তো সমবেতভাবে সবগুলি দোষ নাই। কেননা, আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে প্রত্যাবর্তনে বিশ্বাস রাখি। সুতরাং এই বিশ্বাস না করার দোষ আমাদের মধ্যে নাই!' আসল কথা এই যে, প্রথমতঃ সমষ্টিগতভাবে চারিটি দোষের এই পরিণাম হওয়ার কোন দলিল নাই। সংযোজক অব্যয় 'و' ব্যবহার করিয়া এক বাক্যে কতকগুলি বস্তু বা বিষয় একত্র করা হইলে সমষ্টি না বুঝাইয়া কোন কোন সময় পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেকটিকেও বুঝায়। এতদ্ভিন্ন সম্ভাবনার উপর নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, যদি ইহা মানিয়াও লওয়া হয়—তথাপি আল্লাহ্ তা'আলা যখন কাফেরদের দোষ উল্লেখ করিতে আরম্ভ করিয়া শুধু 'আল্লাহ্‌র দর্শনলাভে অবিশ্বাসী হওয়ার' দোষ বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই ; বরং আরও কয়েকটি দোষেরও উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ্যে বুঝা যায় যে, শেষোক্ত দোষগুলি অনর্থক উল্লেখ করা হয় নাই। যদি পৃথকভাবে উক্ত শাস্তিতে ইহাদের কোন দখল না থাকে, তবে অনর্থকতা সাব্যস্ত হয়। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেকটি দোষেরই উক্ত পরিণামে দখল আছে। কাজেই পৃথকভাবে প্রত্যেকটি কার্যই নিন্দনীয় এবং দূষণীয় বটে। ইহার কোন একটি কাহারও মধ্যে থাকিলে তাহাকে নিষ্পাপ বলা যাইবে না। এই চারিটি দোষের প্রথমটি হইতে আল্লাহ্‌র ফযলে আমরা নিশ্চয়ই মুক্ত আছি এবং শেষোক্ত দোষটি, অর্থাৎ, আল্লাহর আহ্‌কাম ও নির্দেশাবলী হইতে অমনোযোগী থাকা, আমাদের মধ্যে আছে কিনা সন্দেহ। কেননা, অমনোযোগিতা দুই প্রকার। (১) বিশ্বাসের অভাবে অমনোযোগী হওয়া এবং তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা। আমরা নিশ্চিতভাবে ইহা হইতে মুক্ত আছি। (২) সাধারণ অমনোযোগিতা, ইহাতে আমরা অবশ্যই লিপ্ত আছি।

সন্তুষ্টি ও নিশ্চিন্ততার প্রভেদঃ মধ্যবর্তী দুইটি দোষে আমরা অবশ্যই লিপ্ত আছি। এই দুইটি একই বটে, তবে সামান্য প্রভেদ আছে। কেননা, সন্তুষ্টি জ্ঞানপ্রসূত আর নিশ্চিন্ততা স্বভাবোদ্‌গত। কোন সময় কোন বস্তুকে জ্ঞান পছন্দ করে; কিন্তু স্বভাবত উহা চিত্তাকর্ষক নহে। যেমন, তিক্ত ঔষধ রোগ নিরাময়ের জন্য কিংবা আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় শহীদ হওয়ার জন্য অগ্রসর হওয়া পছন্দনীয় বটে, কিন্তু স্বভাব উহাকে পছন্দ করে না। আবার কোন সময় দেখা যায়, কোন বস্তু স্বভাবত পছন্দনীয় ও লোভনীয়; কিন্তু জ্ঞান উহাকে পছন্দনীয় মনে করে না। যেমন 'যেনা' প্রভৃতি। মোটকথা, কোন ক্ষেত্রে সন্তুষ্টি আসে, কিন্তু নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। আবার কোন সময় নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, কিন্তু সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। কিন্তু যেই অবস্থায় সন্তুষ্টি এবং নিশ্চিন্ততা একত্রিত হয় তাহা বড়ই কঠিন অবস্থা, কাফেরগণ ব্যাপকভাবে এই অবস্থার অধীন; বরং অধিকাংশ মুসলমানও ইহাতে নিমজ্জিত।

যেক্ষেত্রে দ্বীন এবং দুনিয়ার স্বার্থে বিরোধ দেখা যায়, যেমন মিথ্যা মোকদ্দমা, ঘুষ গ্রহণ, পরের যমীন জবর দখল ইত্যাদি। এই সমস্ত বিষয়কে পাপ বলিয়া সকলেই জানে, তথাপি মনে মনে পছন্দ করে, খারাপ মনে করে না; বরং তাহা সংশোধনের পরামর্শ দেওয়া হইলে বলিয়া থাকে, ইহা গভর্ণমেণ্টের আইনের ব্যাপার, উপদেষ্টা কি বুঝিবে? ফলকথা, জ্ঞানত তাহারা ইহা পছন্দ করে এবং প্রাধান্যও দেয়। হয়তো বিশ্বাস এরূপ নহে, অনুরূপ অবস্থা এল্‌ম শিক্ষার ব্যাপারেও। তাহারা জানে—প্রাথমিক স্তরে শিশুকে আধুনিক শিক্ষায় লিপ্ত করিলে ধর্ম সম্বন্ধে শিশুরা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ থাকিয়া যায়। অথচ জানিয়া-শুনিয়া উহা গ্রহণের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে—শৈশব হইতে আধুনিক শিক্ষায় লিপ্ত না করিলে তাহারা জীবনে উন্নতি করিবে কেমন করিয়া? ইহাকেই বলে দুনিয়াতে সন্তুষ্টি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকালকার দস্তুরই এরূপ হইয়াছে যে, আলেম এবং দরবেশগণের মধ্যেও এই রোগ ঢুকিয়া পড়িয়াছে। অথচ তাহাদেরই অধিক সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ছিল। আমি দেখিতেছি, দুনিয়ার প্রতি সন্তুষ্টির কারণে তাহাদের নীতি এই হইয়াছে যে, মুর্দা বেহেশ্‌তে যাক কিংবা দোযখে যাক, কিছু আসে যায় না, "তাহাদের চাই পয়সা।" ইহারা সেই শ্রেণীর আলেম, যাহাদের কার্যকলাপ ও স্বভাব-চরিত্র দেখিয়া জনসাধারণ দ্বীনী এল্‌ম হইতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

দ্বীনী এল্‌মের অমর্যাদাঃ বন্ধুগণ! দ্বীনী এল্‌মকে আমরা নিজেরাই অপমান করিয়াছি। নচেৎ এককালে ইহার মর্যাদা এত ঊর্ধ্বে ছিল যে, সকল শ্রেণীর মানুষই ইহার সম্মুখে মস্তক অবনত করিত। দিল্লীর বাদশাহ্‌র দরবারে কোন আলেম পদার্পণ করিলে স্বয়ং বাদশাহ্‌ তাঁহার সম্মুখে নত হইয়া পড়িতেন। অন্যান্য শ্রেণীর লোকের তো কথাই নাই, অধীনস্থ রাজ-রাজড়ারা কিংবা জায়গীরদারগণ দরবারে আসিলে বাদশাহ্‌ চোখ তুলিয়াও তাঁহাদের দিকে তাকাইতেন না। কিন্তু আলেমগণকে দেখামাত্র মাথা নত করিয়া তাঁহাদের প্রতি সম্মান জানাইতেন। এখন বলুন, তৎকালীন ওলামায়ে কেরামের নিকট কোন্‌ বস্তু ছিল? কোন্‌ রাজ্য ছিল? কেবল এই তো ছিল যে, তাঁহারা আলেম ছিলেন, ধর্মপথের নায়ক ছিলেন। কিন্তু এখন আমরা নিজেরাই যদি নিজেদের অমর্যাদা করি, তবে ইহাতে কাহার কসূর? একই অবস্থা হইয়াছে পীরদের। অতিরিক্ত লোভের বশীভূত হইয়া তাঁহারাও মর্যাদা হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

এক গ্রাম্য বর্বরের ঘটনা আমার স্মরণ পড়িল। মৌসুমের শস্য ঘরে আসিলে সে যখন নিম্নশ্রেণীর সেবক পরিচারকদের মামুলী অংশ পৃথক করিতে বসিল, গৃহিণী ও ছেলে-পেলেরা সেবক-

পরিচারকদের হিসাব করিতে লাগিল—ধোপা, মালী, পাটনী প্রভৃতি। কৃষক বসিয়া তাহা শুনিতেছিল। সমস্ত নিম্নস্তরের সেবকদের নাম বলা সমাপ্ত হইলে কৃষক বলিয়া উঠিলঃ "কমবখত! পীরের অংশটাও পৃথক করিয়া লও।" এত অবজ্ঞার সহিত যে পীরের মামুলি অংশ পৃথক করা হইল, তিনিও সেই শ্রেণীর পীর। একটি ঘটনা হইতেই তাহাদের সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারিবেনঃ 'মাসাব্রী' মৌজার কতিপয় লোক মঙ্গলৌরের কাজী ছাহেব রাহেমাহুল্লাহ্‌র মুরীদ হইয়াছিল। তাহাদের খান্দানী পীর ইহা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে বলিলেনঃ "ভাল কথা, আমিও তোমাদিগকে পুল্‌সেরাতের উপর হইতে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিব।" এই শ্রেণীর পীরই এইরূপ অবজ্ঞার পাত্র। অনুরূপভাবে কতক ওলামাও ইত্যাকার অবজ্ঞার উপযোগী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কোন একজন সাবজজ সেকেলে পোশাক পরিধান করিয়া পুরাতন ভাবধারাযুক্ত কোন এক জায়গায় বদলী হইয়া গেলেন। স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরিচয়লাভের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া তিনি জনৈক সম্মানী লোকের বাড়ীতে যাইয়া পৌঁছিলেন। গৃহস্বামী দূর হইতে তাঁহার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়াই গৃহের অভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন। আগন্তুক জনৈক চাকরের সাহায্যে বলিয়া পাঠাইলেন, "বল, আমি জিলার সাবজজ। তোমার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।" নাম শুনিয়া ভদ্র লোকটি বাহিরে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেনঃ "মাফ করুন, আপনার আবা কাবা দেখিয়া আমি ধারণা করিয়াছিলাম, কোন মৌলবী ছাহেব চাঁদা আদায়ে আসিয়াছেন।" আজকাল ওলামাদের সম্বন্ধে সর্বসাধারণের এই ধারণা। কিন্তু ইহাতে তাহাদের বিশেষ দোষ নাই; বরং এই শ্রেণীর আলেমদেরই দোষ, তাহারাই নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারা সর্বসাধারণের মনোভাব নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, ইহা আলেমদেরই ত্রুটি। আলেমগণ যদি এই জাতীয় নীচ ও হীন কার্যকলাপ হইতে দূরে থাকিত, তবে সাধারণ লোক তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিবার সাহস পাইত না।

এল্‌মে-দ্বীন শিক্ষার প্রতি উৎসাহদানঃ যাহারা এই শ্রেণীর অর্বাচীন আলেমদিগকে দেখিয়া এল্‌মে দ্বীন হইতে সরিয়া পড়িয়াছে, তাহারাও ভুল করিয়াছে। দ্বীনী এল্‌মের সাথে সাথে সন্তানদিগকে উচ্চাঙ্গের আদব-কায়দাও শিক্ষা দিতে পারিত, তাহা হইলে সন্তানদের অসঙ্গত ও অশোভন স্বভাবের উৎপত্তিই হইত না। দ্বিতীয়ত কোন বংশানুক্রমিক ভদ্র সন্তান যদি দ্বীনী এলম শিক্ষা করে, তবে সে তাহার বংশগত স্বভাবসুলভ উন্নত মনোভাবের দরুন উপরোক্ত নীচ মনের ও হীন স্বভাবের কার্য করিবেই না। বস্তুত অধিকাংশ নীচ বংশের লোকেরাই এমন হীন কার্য করিয়া থাকে। ইহাই যখন আসল ব্যাপার, তখন সন্তানের দ্বীনী তা'লীমের জন্য শিক্ষক নির্বাচনের বেলায়ও এদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আমি বলি না যে, 'সন্তানদের আধুনিক শিক্ষায় লিপ্ত করিবেন না।' আধুনিক শিক্ষা অবশ্যই দিন, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও চিন্তা করুন যে, ধর্মীয় শিক্ষা দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বস্তু, সুতরাং প্রথমে দ্বীনী এল্‌ম শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। অতঃপর অন্যান্য শিক্ষা। ধর্মীয় শিক্ষা প্রথমে দিতে না পারিলেও অন্যান্য শিক্ষার সাথে দ্বীনী তা'লীম দেওয়া একান্ত আবশ্যক। যদি অন্য শিক্ষার সাথে বিস্তারিতরূপে দ্বীনী এল্‌ম শিক্ষাদানের সুযোগ বা সময় না হয়, তবে ধর্ম সম্বন্ধীয় উর্দু (বা বাংলা) বইগুলিই পড়ান, কিন্তু তাহা প্রাইভেট শিক্ষকের নিকট সবকে সবকে পড়িতে হইবে। কিতাব খরিদ করিয়া বলিয়া দিলে চলিবে না যে, "পড়িয়া লও"; বরং কোন দ্বীনদার-পরহেযগার আলেম দ্বারা পূর্ণ কিতাব আদ্যন্ত সবকে সবকে ভালরূপে বুঝিয়া পড়িতে হইবে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একটি ঘন্টা এই শিক্ষার জন্য ব্যয় করিলেই

যথেষ্ট হয়; বরং আমি বলি, ছেলে-মেয়েরা দৈনিক যে সময়টুকু খেলাধুলায় নষ্ট করে, উহা হইতে একটি ঘণ্টা ধর্মীয় শিক্ষায় ব্যয় করুন, সময় সময় পরীক্ষা নিন্। কৃতকার্যতার জন্য পুরস্কার এবং অকৃতকার্যতার জন্য শাস্তি দান করুন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমল করাইবারও চেষ্টা করুন। অঙ্ক ইত্যাদি যেরূপ টাস্ক বা অনুশীলনী দিয়া থাকেন এবং তাহা না করিলে শাস্তি দিয়া থাকেন, তদ্রূপ ধর্মীয় শিক্ষায় প্রত্যেকটি মাসআলা সম্বন্ধে কড়াকড়ি শিক্ষা দিন।

ইহার সুফল এই হইবে যে, আধুনিক শিক্ষালাভের সাথে সাথে ছেলে-মেয়েরা দ্বীনদার-পরহেযগার হইতে থাকিবে। অবশ্য এই শিক্ষার জন্য একজন উপযুক্ত আলেমকে নিযুক্ত করিতে হইবে। ইংরেজী শিক্ষার জন্য শত শত টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন, ধর্মীয় শিক্ষার জন্য দশ টাকা ব্যয় করিলে এমন কি যুলুম হইয়া যাইবে? আবার উক্ত মৌলবী ছাহেব হইতে আপনি নিজেও জরুরী মাসআলা শিখিয়া উপকৃত হইতে পারেন।

"দুনিয়ার প্রতি সন্তুষ্টি" ব্যাধির ব্যাপকতাঃ প্রসঙ্গক্রমে এ কথাও বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করিতেছি যে, এই শহরে পূর্বের ন্যায় দ্বীনী এল্‌ম শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে ভাল হইত। এখন-কার ছেলেদের কিছু না কিছু এল্‌মে দ্বীন অবশ্যই শিক্ষা করার প্রয়োজন ছিল। দেখুন, অন্তত দুই ঘণ্টার জন্যও যদি কোন হক্কানী আলেমের সাহচর্য ভাগ্যে জুটে, তবে ছেলেরা শেষ পর্যন্ত দ্বীনদার পরহেযগার না হইলেও ধর্ম সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কিছু জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, এদিকে মানুষের লক্ষ্যই নাই। যদি বলেন, "এই শহরে মৌলবী দুর্লভ।" আমি বলিব, "এই শহরে রাজমিস্ত্রী নাই। আপনাদের প্রয়োজন হইলে অবশ্যই অন্য শহর হইতে আনয়ন করেন। তবে অন্যস্থান হইতে মৌলবী আনয়ন করিতে দোষ কি? এর বেলায় কেন অপেক্ষায় থাকেন, মৌলবী কি নিজেই আপনাদের নিকট আসিবেন?" বন্ধুগণ! যদি আপনাদের অন্তরে ধর্মের কোন গুরুত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব থাকিত, তবে ধর্ম শিক্ষার জন্য আপনারা নিজেরাই মৌলবী তালাশ করিতেন।

সারকথা এই যে, দুনিয়ার প্রতি সন্তুষ্টির এই অপকারিতাগুলি হইতে অনেক কম লোকই মুক্ত আছেন। এমন কি তথাকথিত মৌলবী এবং দরবেশগণও ইহা হইতে মুক্ত নহেন। বস্তুত মৌলবী ও দরবেশদের দুনিয়ার প্রতি সন্তুষ্টি বড়ই মারাত্মক। কেননা, তাহারা জনসাধারণকে ধোঁকা দিয়া দুনিয়া উপার্জন করিয়া থাকেন। অবশ্য প্রত্যেক দলেই কিছুসংখ্যক লোক বাদ আছে। দুনিয়াদার-দের মধ্যেও এবং দ্বীনদারদের মধ্যেও। এই পর্যন্ত আলোচ্য আয়াতের رَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا অংশটির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সম্মুখের দিকে وَاطْمَأَنُّوْا بِهَا বাক্যের ব্যাখ্যা শ্রবণ করুন।

দুনিয়াদার দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং দুনিয়াও তাহাদের অন্তরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। এই অনুরাগ তাহাদের অন্তর হইতে দূর করা সুকঠিন। দুনিয়ার প্রতি যৎসামান্য আকর্ষণ টের পাইতেই প্রত্যেক মুসলমানের প্রাণ আঁৎকিয়া উঠা উচিত। বলুন তো, দুনিয়াতে থাকিয়া কোন্ মুসলমানের প্রাণ দৈনিক কয়বার আঁৎকিয়া উঠিয়াছে? এই জন্য কখন কাহার মনে ভয়ের উদয় হইয়াছে? পক্ষান্তরে আখেরাতের কল্পনায় প্রাণে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়া থাকে। অথচ দুনিয়ার সহিত এতটুকু সম্পর্ক হওয়া উচিত, যতটুকু মুযাফ্‌ফরনগরের মুসাফিরখানার সহিত হইতে পারে। যদিও কার্যো-পলক্ষে জালালাবাদের লোক মুযাফ্‌ফরনগরে গমন করিয়া তথায় যাবতীয় কাজকর্ম সমাধা করে

বটে, কিন্তু তাহাদের মন জালালাবাদেই পড়িয়া থাকে। কেহ এ কথার অর্থ এরূপ মনে করিতে পারেন যে, মৌলবীরা দুনিয়া বর্জন করাইতে চান, সম্পূর্ণ ভুল। হাঁ, মৌলবী ইহা অবশ্যই বলেন যে, দুনিয়ার সহিত মুসাফিরখানার ন্যায় সম্পর্ক রাখুন। দেখুন, আপনারা সফরকালে মুসাফির-খানায় বা হোটেলে খাওয়া-দাওয়াও করেন এবং রাত্রি যাপনের জন্য কামরাও ভাড়া করিয়া থাকেন। কিন্তু তথায় কখনও আপনাদের মন বসে না। অথচ দুনিয়ার সহিত বেশ মন লাগাইয়া বসিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, আপনারা দুনিয়ার স্বরূপ চিনেন নাই। নির্বোধ শিশু মুসাফির-খানার কোন আরামদায়ক অবস্থা বা চিত্তাকর্ষক বস্তু দেখিয়া বায়না ধরে—"আমি বাড়ী যাইব না, এখানেই থাকিব।" দুনিয়ার সহিত যাহারা আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তাহাদের অবস্থাও ঠিক এইরূপই। পক্ষান্তরে যাহারা দুনিয়ার স্বরূপ সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল আছে, কোন কবি তাহাদের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেনঃ

خرم آں روز کزیں منزل ویراں بروم ـ راحت جان طلبم وزپے جاناں بروم
نذر کردم که گر آید بسر ایں غم روزے ـ بردر میکده شاداں و غزل خواں بروم

"সেইদিন কতই না আনন্দের হইবে, যে দিন আমি এই অস্থায়ী বাসগৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইব এবং প্রিয়জনের সমীপে গমন করিয়া আত্মার শান্তি কামনা করিব! (প্রিয়জনের মিলনলাভের পর জীবন অনন্তকাল স্থায়ী হইবে।) আমি মানত করিয়াছি যে, যে দিন এই চিন্তার অবসান ঘটিবে; অর্থাৎ, দুনিয়ার ঝামেলা হইতে মুক্তি লাভ করিব, সেইদিন আনন্দেচিত্তে গান গাহিতে গাহিতে শরাবখানার দ্বারদেশ পর্যন্ত চলিয়া যাইব।"

দেখুন, দুনিয়ার স্বরূপ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লোকগণ মানত করিতেছেন—ইহলোক হইতে মুক্তি পাইলে এইরূপ করিবেন।

দুনিয়ার অনুরাগ দূর করিবার উপায়ঃ এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সময়সাপেক্ষ। কিন্তু আমার সময় সঙ্কীর্ণ। কাজেই এখন ইহার একটিমাত্র উপায় বলিয়া আমি বিষয়টি সংক্ষেপ করিতেছি। তাহা এত কার্যকরী যে, পীরে কামেলের সংসর্গে থাকিয়া যে ফল লাভ করিতেন, এই উপায়টি অবলম্বনে তাহা সহজে লাভ হইবে। এখন সীমা ডিঙ্গাইয়া বাহিরে পা রাখিতেছেন, এই উপায়ে তাহা বন্ধ হইয়া যাইবে। প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় ঐ অঞ্চলের লোকের মনের অবস্থা যেরূপ হয়, এই উপায় অবলম্বনে আপনাদের অবস্থাও তদ্রূপ হইবে। অর্থাৎ, দুনিয়ার সমস্ত কাজই করিবেন, কিন্তু কোন কাজের প্রতি মনের আকর্ষণ থাকিবে না। উপায়টি এই—১। প্রত্যহ এক নির্ধারিত সময়ে মৃত্যুকে স্মরণ করুন। ২। অতঃপর কবরের অবস্থা স্মরণ করুন। ৩। তৎপর হাশরের কথা স্মরণ করুন। ৪। এবং সেই ভয়াবহ অবস্থা ও কষ্ট-মুসীবতের বিষয় চিন্তা করুন। ৫। এবং ইহাও চিন্তা করুন যে, আমাকে মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ্ তা'আলার সমক্ষে দাঁড় করান হইবে। ৬। আমার যাবতীয় কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ লওয়া হইবে। ৭। একটা একটা করিয়া সমস্ত হক আদায় করিতে হইবে। ৮। অতঃপর কঠিন আযাবের সম্মুখীন হইতে হইবে।

এইরূপে প্রতি রাত্রে শয়নকালে চিন্তা করিবেন। ইন্‌শাআল্লাহ্, দুই সপ্তাহের মধ্যে কায়া পরি-বর্তিত হইয়া যাইবে। দুনিয়ার প্রতি যে নিশ্চিন্ত মনোভাব, অনুরাগ এবং আকর্ষণ বিদ্যমান আছে, তাহা লোপ পাইবে।

সূচী-পত্র

আজিকার ওয়াযে যদিও শরীঅতের শাখা-বিধান বা মাসআলা অধিক বর্ণনা করা হয় নাই, কিন্তু بحمد الله মূলনীতি জাতীয় কথা যথেষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। এখন আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করুন—তিনি আমাদিগকে আমলের তাওফীক দান করুন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَآ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○

■

জালালাবাদ শহরের আলী হাসান ছাহেবের মসজিদ
১৩৩০ হিজরী, ১৫ই সফর

আল-ইত্‌মীনানু বিদ্‌দুনিয়া

■

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اِنَّ الَّذِيْنَ لَايَـرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غَافِلُوْنَ ط اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

দুনিয়ার অনুরাগই সমস্ত রোগের মূল

যদিও আমাদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের রোগ বা দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু হাদীসের প্রমাণে বুঝা যায়, সমস্ত রোগের মূলাধার একটি বস্তু। তাহা দুনিয়ার মহব্বত ছাড়া আর কিছুই নহে। হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার শব্দে বলিয়াছেন—

حُبُّ الدُّنْيَا رَاْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ "দুনিয়ার মহব্বতই সমস্ত দোষের মূল।" সুতরাং একটি একটি করিয়া পৃথকভাবে প্রত্যেকটি দোষ বিস্তারিত বর্ণনা করার পরিবর্তে সমস্ত রোগের মূল এবং উহা নিরাময়ের উপায় বর্ণনা করাই সঙ্গত। কেননা, প্রথমতঃ, প্রত্যেকটি রোগের বিস্তারিত বিবরণ প্রদানের সময় নাই। দ্বিতীয়তঃ, মূল রোগ নিরাময়ের উপায় জানিতে পারিলে উহার সাহায্যে তদধীন প্রায় সবগুলি রোগ নিরাময়েরই উপায় হইয়া যাইবে। মূল রোগটিই অন্যান্য রোগ উৎপন্ন হওয়ার কারণ। অতএব, মূলের চিকিৎসা হইলে তৎকারণে উৎপন্ন সমস্ত রোগেরই চিকিৎসা হইয়া যাইবে। বস্তুত কারণ দূরীভূত করাই প্রকৃত চিকিৎসা!

মৌলিক রোগের চিকিৎসা প্রথম করা উচিতঃ মনে করুন, কাহারও দেহ হইতে অতিরিক্ত রক্ত নিঃসরণের ফলে তাহার হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্ক দুর্বল হইয়া তৎসঙ্গে আরও কয়েকটি রোগ উৎপন্ন হইয়াছে। এমতাবস্থায় চিকিৎসার এক পদ্ধতি এই হইতে পারে যে, প্রত্যেকটি রোগের চিকিৎসা পৃথক পৃথকভাবে করা হইবে। যেমন হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্ক সবলকারী ঔষধ সেবন করিয়া

উহাদের দুর্বলতা দূর করা হইবে। বলাবাহুল্য, এই উপায়ের চিকিৎসা বহু সময়সাপেক্ষ এবং আয়াসসাধ্য।

দ্বিতীয় পদ্ধতি এই হইতে পারে যে, সমস্ত রোগের মূল অনুসন্ধান করিয়া উহার চিকিৎসা করা হইবে। যেমন, এস্থলে অতিরিক্ত রক্ত ক্ষয়ের কারণেই মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা এবং অন্যান্য রোগ উৎপন্ন হইয়াছে। এখন রক্ত বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ রক্ত দেহে উৎপন্ন করিলেই যাবতীয় রোগ আপনাআপনি নিরাময় হইয়া যাইবে। অনুরূপভাবে এখানেও দুনিয়ার মহব্বতই যখন সমস্ত অনর্থের মূল, তখন দুনিয়ার মহব্বত অন্তর হইতে দূর করিতে পারিলে অন্যান্য দোষগুলি আপনাআপনিই সংশোধিত হইয়া যাইবে। প্রকৃতপক্ষে ইহাই ব্যাপক চিকিৎসা।

দুনিয়ার মহব্বত মৌলিক রোগ কেন? এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, অন্যান্য দোষের সঙ্গে দুনিয়ার মহব্বতের এমন কি সম্পর্ক আছে, যদ্দরুন উহাকে সমস্ত রোগের মূল বলা হইয়া থাকে? যেমন, নামায না পড়ার সঙ্গে দুনিয়ার মহব্বতের কি সংস্রব? অথচ দেখা যাইতেছে যে, বহু সংসারাসক্ত লোক নামাযও পড়ে এবং রোযাও রাখে। এইরূপ সংসারাসক্তি লইয়াও বহু লোক বহু নেক কার্য করিয়া থাকে। তথাপি সংসারাসক্তিকে যাবতীয় মন্দ কার্যের মূল কেন বলা হইল? বাহ্যত কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া বুঝা যায় না। যেমন, কাহারও মধ্যে রোগ আছে; কিন্তু দুনিয়ার প্রতি মহব্বত নাই।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, গভীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে, প্রত্যেক মন্দ ও দূষণীয় কার্যের মূলে হইল সংসারাসক্তি। কেননা, সংসারাসক্ত লোকের হৃদয়ে কস্মিনকালেও পরলোকের প্রতি কোন আগ্রহ বা উৎসাহ থাকে না এবং মন্দ কাজ হইতে আত্মরক্ষা করার প্রবৃত্তিও হয় না। পক্ষান্তরে যাহার হৃদয়ে পরলোকের চিন্তা ও ভয় বিরাজমান থাকে, তাহার দ্বারা কোন পাপ কার্যই অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। কেননা, পাপী লোকের মনে পাপের পরিণাম সম্বন্ধে কোন ভয় নাই বলিয়াই সে পাপ কার্য করিয়া থাকে। বস্তুত পরলোকের চিন্তা যেমন বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত, তদ্রূপ দুনিয়ার মহব্বতেরও নানাবিধ স্তর আছে। উভয় জাতীয় স্তরসমূহের মধ্যে যেগুলি পরস্পর বিরোধী, উহারা কোন ক্ষেত্রে একত্রিত হইতে পারে না। কিন্তু পরস্পর বিরোধী না হইলে একত্রিত হওয়া সম্ভব। ইহাই হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটির তাৎপর্যঃ

لَايَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّ لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ○

"যেনাকারী মু'মিন অবস্থায় যেনা করে না এবং চোরও মুমিন অবস্থায় চুরি করে না।

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপর একটি হাদীসে বলিয়াছেনঃ

مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ ـ

"যে ব্যক্তি কালেমা তাইয়্যেবা পড়িয়াছে, (অর্থাৎ, উহার মর্ম অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিয়াছে) সে ব্যক্তি বেহেশ্‌তে প্রবেশাধিকার লাভ করিবে, যদিও সে যেনা বা চুরি করে।

ঈমানের স্তর বিভিন্নঃ বস্তুত ঈমানের বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে। প্রথমতঃ, পরলোকের প্রতি গুরুত্ব প্রদানপূর্বক শুধু আল্লাহ্‌র একত্বে ও রাসূলের সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন। ইহা ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর। ইহাতে ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহা ঈমান বলিয়াই গণ্য হইবে না। ঈমান পরলোক চিন্তার এই সর্বনিম্ন

স্তরটি ব্যভিচার, চুরি ও অন্যান্য পাপ কার্যের সহিত একত্রিত হইতে পারে। মূলত ঈমানের দৃষ্টান্ত এরূপ মনে করুন, যেমন কোন চিকিৎসক নিজের রোগীকে ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিয়া তৎসম্বন্ধীয় সর্বপ্রকারের উপদেশ প্রদান করিলেন। চিকিৎসকের উদ্দেশ্য—ইহাতেই রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিবে। কিন্তু হতভাগ্য রোগী ব্যবস্থাপত্রের সমস্ত ঔষধ সেবন না করিয়া উহার কিছু অংশ সেবন করিল। বলাবাহুল্য, ইহাতে সে সামান্য ফলই লাভ করিবে। অবশ্য পূর্ণ ব্যবস্থা-পত্র মানিয়া চলিলে পূর্ণ ফলই লাভ করিত। অনুরূপভাবে শুধু ঈমান কেবল অনন্তকালের আযাব হইতেই রক্ষা করিতে পারে। পূর্ণ পরিত্রাণলাভের কারণ হইতে পারে না। এই স্তরের ঈমানের সহিতই পাপ কার্যের সমাবেশ হইতে পারে। ঈমানের দ্বিতীয় স্তর—পক্ষান্তরে যেই দৃঢ় বিশ্বাস মু'মিন ব্যক্তির মধ্যে স্বীয় প্রভাব পূর্ণরূপে বিস্তার করিতে পারে—তাহা ঈমানের উচ্চতম স্তর, ইহাই ঈমানে কামেল নামে অভিহিত। এই স্তরের ঈমান পাপ কার্যের সহিত একত্রিত হইতে পারে না। এই শ্রেণীর ঈমানদার লোক কর্তৃক কখনও ব্যভিচার, চুরি প্রভৃতি কোন জঘন্য স্তরের পাপ কার্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে না।

ফলকথা, আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। একটি উচ্চতম পর্যায়ের দৃঢ় বিশ্বাস। ইহার প্রভাবে ঈমানদার ব্যক্তি সর্ববিধ গোনাহ্‌র কাজ হইতে বিরত থাকে। ইহার নাম 'তাছদীকে কামেল' বা পূর্ণ বিশ্বাস। আর একটি তাছদীকে নাকেছ বা নিম্নতম পর্যায়ের বিশ্বাস। ইহা ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া মানুষ কতক গোনাহ্‌র কাজ হইতে মুক্ত থাকে এবং কতক পাপ কার্য তাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এই দ্বিতীয় স্তরের বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত পূর্বোক্ত চিকিৎসক প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্রের আংশিক অনুসরণের সমতুল্য। অর্থাৎ, আংশিক অনুসরণে আংশিক ফলই লাভ হয়। এইরূপে এই স্তরের বিশ্বাস দ্বারা এই ফল হইবে যে, মানুষ দোযখের অনন্ত শাস্তি হইতে মুক্তি পাইবে। কিন্তু পূর্ণ পরিত্রাণ অর্থাৎ, প্রথমবারেই নাজাত পাইবে না। পক্ষান্তরে প্রথম পর্যায়ের ঈমানের দৃষ্টান্ত চিকিৎসক প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্রের পূর্ণ অনুসরণের সমতুল্য মনে করুন। ইহার পূর্ণ অনুসরণে রোগী যেমন পূর্ণ ফল লাভ করিবে, তেমনি দোযখের অনন্ত শাস্তি হইতে মুক্তিলাভ ছাড়াও নানাবিধ পুরস্কার এবং নেয়ামতেরও উপযোগী হইবে।

কিংবা উপরোক্ত উচ্চ ও নিম্নস্তরের ঈমানদারকে এরূপ দুই ব্যক্তির সহিত তুলনা করিতে, পারেন, যাহারা বিষের মারাত্মক ক্রিয়ায় বিশ্বাসী। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাহাদের একজন বিষ পান করিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। অপরজন বিষ পান করিল না। বলাবাহুল্য, ইহারা উভয়েই বিষকে ধ্বংসাত্মক বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি বিষপানে প্রাণ হারাইয়াছে, তাহার বিশ্বাস ছিল দুর্বল এবং অপূর্ণ। কেননা, পূর্ণ বিশ্বাসের কোন লক্ষণ তাহার মধ্যে পাওয়া যায় নাই। পক্ষান্তরে অপর ব্যক্তির বিশ্বাস এ সম্বন্ধে পূর্ণ ছিল, উহার ফলেই সে বিষ পান করে নাই।

অথবা অপূর্ণ ঈমানকে সেই ব্যক্তির সহিতও তুলনা করিতে পারেন, যে ব্যক্তি তাহার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতি কোনই গুরুত্ব দিল না এবং নিজের কাজ-কর্ম দুরুস্ত করিল না, অমনিই নির্বিকার রহিল। ইহাতে বুঝা যায় যে, সে ব্যক্তি ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর আগমন-সংবাদ পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে নাই, নিতান্ত মামুলি মনে করিয়াছে। কেননা, তাহার পূর্ণ বিশ্বাস থাকিলে উহার ফল এই হইত যে, সে নিজের কাজ-কর্ম দুরুস্ত করিয়া রাখিত।

এইরূপে যেই বিশ্বাসের ফল বা প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তাহাই পূর্ণ বিশ্বাস বা ঈমানে কামেল। কামেল ঈমানদারের ঈমানের প্রভাব প্রতি পদে পদে পরিলক্ষিত হয়। যাহার অবস্থা এরূপ হইয়া

দাঁড়ায়, সে কখনও নাফরমানী করিতে পারে না। এরূপ ব্যক্তি অতীতকালের কৃত ত্রুটি-বিচ্যুতির সংশোধনে তৎপর হইয়া পড়ে। ভবিষ্যতে পাপানুষ্ঠান হইতে বিরত থাকে। এই উচ্চতম ও নিম্নতম স্তরের মধ্যস্থলে আরও বহুবিধ স্তর রহিয়াছে।

সংসারাসক্তির স্তর বিভিন্ন ঃ সংসারাসক্তিও বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। কাহারও মধ্যে কম, কাহারও মধ্যে বেশী। কাফেরের মধ্যে অবশ্যই বেশী এবং মুসলমানের মধ্যে কম; কিন্তু কিছুটা আছে নিশ্চয়ই। আর ইহাই যাবতীয় পাপানুষ্ঠানের গোড়া। কেননা, সংসারানুরাগের ফলেই পরলোকের চিন্তা হ্রাস পায়। সুতরাং সংসারাসক্তি যেই স্তরের হইবে, পরলোকের প্রতি নিশ্চিন্ততাও সেই পর্যায়েরই হইবে। সংসারাসক্তি পূর্ণমাত্রায় হইলে পরলোকের প্রতি নিশ্চিন্ততাও পূর্ণমাত্রায় হইবে; যেমন কাফেরের মধ্যে তাহা দেখা যায়। আর মুসলমানের মধ্যে যাহার ভিতরে সংসারাসক্তি যেই পরিমাণে বিদ্যমান আছে; তাহার মধ্যে পরলোকের প্রতি নিশ্চিন্ত মনোভাবও সেই পরিমাণেরই। এখন আপনারা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আমি যে বলিয়াছিলাম, সংসারাসক্তিই যাবতীয় পাপানুষ্ঠানের মূল। যথার্থ কাফেরের মধ্যে ইহা তো পূর্ণরূপেই বিদ্যমান। দুঃখের বিষয়, আমাদের মধ্যেও তাহা পরিদৃষ্ট হয়।

যদি বলেন যে, إِنَّ الَّذِيْنَ لَايَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا এই আয়াতটি কাফেরের নিন্দাবাদের জন্য অবতারিত হইয়াছে, আমাদের সম্মুখে আলোচনা করার জন্য ইহা কেন অবলম্বন করা হইল? আমাদের সঙ্গে ইহার কি সম্পর্ক? তবে বলা হইবে, এরূপ সন্দেহ এবং প্রশ্ন অনেকের মনেই উদয় হইয়া থাকে। কেননা তাহারা মনে করে, যেসমস্ত আয়াত কাফেরদের সম্বন্ধে 'নাযিল' হইয়াছে, মুসলমানদের সঙ্গে উহাদের কোন সম্পর্ক নাই। এই ধারণার বশীভূত হইয়াই তাহারা নিজেদের পরিণাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত এবং নির্বিকার। আমি বলি, তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখুন, কাফেরদের প্রতি শাস্তির ভীতি প্রদর্শনরূপে যেসমস্ত আয়াত নাযিল হইয়াছে—উহাদের ভিত্তি কি? কাফের-দের ব্যক্তিবিশেষের প্রতি এ সমস্ত শাস্তির ধমক, না তাহাদের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে? বলাবাহুল্য, ইহা স্পষ্ট যে, কাফেরদের মধ্যে যেসমস্ত ঘৃণিত আচরণ পরিদৃষ্ট হয়, উহাকে ভিত্তি করিয়াই তাহাদিগকে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, ব্যক্তিগতভাবে কোন মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অনুরাগও নাই, বিরাগও নাই। মানুষ হিসাবে সকলেই তাঁহার নিকট সমান।

বরং মানুষের কার্যকলাপই আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা এবং বিরাগের মূল। যাহার আমল ভাল তিনি তাহাকে ভালবাসেন, আর যাহার আমল মন্দ তাহার প্রতি তিনি বিরাগ। কথায় বলে, "কর্মই প্রিয়, চর্ম প্রিয় নহে।" ব্যক্তিগতভাবে কেহ ঘৃণিত হইলে তাহার আমল যতই ভাল হউক না কেন, সে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় না হওয়াই উচিত। অথচ হাদীস শরীফে উক্ত রহি-য়াছে ঃ "বান্দার গোনাহ্ সমস্ত পৃথিবী পরিপূর্ণ হইলেও তওবা করিলে তাহা মাফ হইয়া যায়।" অতএব, বুঝিতে হইবে, কাফেরদের উদ্দেশ্যে যেসমস্ত শাস্তির ধমক প্রদান করা হইয়াছে, উহা তাহাদের আমলের পরিপ্রেক্ষিতেই বটে; ব্যক্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে নহে। সুতরাং ঐ শ্রেণীর কার্যকলাপ যদি কোন মু'মিনের মধ্যে দেখা যায়, সেও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ঘৃণিত এবং উক্ত শাস্তির ধমকের বা ভীতি প্রদর্শনের পাত্র বলিয়া গণ্য হইবে। অবশ্য মু'মিনের প্রতি ঘৃণা কাফের-

দের ন্যায় তত কঠোর হইবে না। কেননা, কাফেরদের আমল কুফরের সহিত মিলিত হইয়া জঘন্যরূপে ঘৃণিত হয়।

সারকথা এই যে, কার্যাবলীই মহব্বত এবং বিরাগের মূল কারণ, তবে মু'মিন এবং কাফেরের অনুষ্ঠিত পাপ কার্যের মধ্যে এতটুকু পার্থক্য রহিয়াছে যে, যে ব্যক্তি বিষ পান করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বিষক্রিয়া নাশক কোন ঔষধ সেবন করিল না, তাহার মৃত্যু অনিবার্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বিষ পান করার সঙ্গে সঙ্গে বিষনাশক ঔষধ সেবন করে, বিষের ক্রিয়া তাহার মধ্যেও হয় বটে; কিন্তু তাহা অপেক্ষাকৃত লঘু হইয়া থাকে, একেবারে প্রাণসংহার করে না। মু'মিন এবং কাফের কর্তৃক অনুষ্ঠিত পাপ কার্যের তুলনাও তদ্রূপ। মু'মিন ব্যক্তি পাপ কার্যরূপ বিষ পান করিলেও সঙ্গে সঙ্গে ঈমান ঠিক রাখিয়া বিষনাশক ঔষধও সেবন করিয়াছেন। উক্ত ঈমান পাপের বিষক্রিয়া দুর্বল করিয়া দিয়াছে। পক্ষান্তরে কাফেরের ঈমান নাই বলিয়া তাহার বিষনাশক ঔষধ সেবন করা হয় নাই। ফলে পাপের বিষক্রিয়া তাহার মধ্যে পূর্ণরূপে চলিয়াছে। তবে ইহা সত্য যে, উভয়েই বিষ পান করিয়াছে। সুতরাং বিষের অনিষ্টকারিতার কথা উভয়কে শুনান হইতেছে।

ইহার আরও একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুনঃ পৃথিবীতে দুই প্রকারের অপরাধী রহিয়াছে। এক প্রকারের লোক বাদ্‌শাহের বিদ্রোহী এবং অবাধ্য, তদুপরি তাহাদের অপরাধ প্রবলও বটে। আর এক প্রকারের লোক অপরাধ করে সত্য; কিন্তু বিদ্রোহী নহে। দ্বিতীয় প্রকারের লোক যেহেতু অনুগত, কাজেই অপরাধের ফল তাহাকে ভোগ করিতে হইবে সত্য; কিন্তু আনুগত্যের কারণে তাহা অপেক্ষাকৃত লঘু হইবে। অর্থাৎ, তাহার শাস্তি সীমাবদ্ধ থাকিবে। পক্ষান্তরে বিদ্রোহী অপরাধীর শাস্তি হইবে সীমাহীন। তাহার শাস্তি পূর্বোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক হইবে। অর্থাৎ, তাহাকে অনন্তকালের জন্য বন্দী করিয়া রাখা হইবে।

অনন্ত আযাবের রহস্যঃ ইহাই কাফেরদের অনন্তকাল দোযখের আযাব ভোগ করার রহস্য। কাফেরেরা অনন্তকালের জন্য দোযখবাসী হইবে। কিন্তু পাপী মু'মিন দোযখে অনন্তকাল থাকিবে না। কারণ, মু'মিন লোক অপরাধ করিলেও বিদ্রোহী নহে। পক্ষান্তরে কাফেরেরা অপরাধও করে, তদুপরি বিদ্রোহীও বটে।

কেহ কেহ প্রতিবাদ করিয়া থাকে যে, কাফেরদের অনন্ত শাস্তি অযৌক্তিক। আমি বলি, কাফের -দের ন্যায় অপরাধীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যেরূপ শাস্তির বিধান করিয়াছেন, এরূপ অপরাধীর জন্য আপনারাও অনুরূপ শাস্তির ব্যবস্থাই করিয়া থাকেন। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, পৃথিবীর শাসক -মণ্ডলীর হাতে অনন্তকাল স্থায়ী শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা তত নাই; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার হাতে তাহা আছে। আপনাদের হাতে অনন্তকাল স্থায়ী শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা থাকিলে এরূপ অপরাধীর জন্য আপনারাও সেই ব্যবস্থাই করিতেন। কিন্তু কি করিবেন, অপরাধী নির্ধারিত সময়ে মরিয়া যায়, আপনাদের তাহাতে কোনই হাত থাকে না। কাজেই আপনারা অনন্ত শাস্তি প্রদানে অক্ষম। নিজের অন্তরকে জিজ্ঞাসা করুন, আপনাদের হাতে তদ্রূপ ক্ষমতা থাকিলে কি করিতেন? বলাবাহুল্য, আপনারাও অনন্ত শাস্তিরই ব্যবস্থা করিতেন। মানুষের ক্ষমতা অসীম নহে বলিয়া অসীম শাস্তি প্রদানে তাহারা অক্ষম, ক্ষমতার যতটুকু থাকে তাহা প্রয়োগে মানুষ একটুও ত্রুটি করে না। দেখুন, কোন কোন দেশের বৈশিষ্ট্য হইল, তথাকার লোক দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে। অতএব, তদ্রূপ দেশে দেশদ্রোহী অপরাধীকে 'যাবজ্জীবন কয়েদের' শাস্তি প্রদান করা হইলে তাহা ভারতীয় দেশদ্রোহী অপরাধীর শাস্তি অপেক্ষা দীর্ঘতম হইবে। কিন্তু ইহাতে কেহ প্রতিবাদ করে না যে, (পাক) ভারতে

(পাক) ভারতে এই শ্রেণীর অপরাধী মাত্র ২০/৩০ বৎসরের জন্য জেলখানায় আবদ্ধ থাকে। পক্ষান্তরে অন্যান্য দেশে ইহাদিগকে ৫০ বৎসর হইতে ১০০ বৎসর পর্যন্ত কারাগারে কেন আবদ্ধ রাখা হয়? এরূপ অপরাধীর শাস্তি উভয় দেশেই 'যাবজ্জীবন কয়েদ' বা আজীবন কারাবাস। কিন্তু ইহার কি প্রতিকার আছে যে, কোন দেশের কয়েদী কারাগারে শীঘ্রই মারা যায়, আর কোন দেশের কয়েদীর মৃত্যু দীর্ঘকাল পরে হয়? সুতরাং তাহাদের কারাভোগের মেয়াদ বিভিন্নরূপ হইয়া পড়ে।

অনুরূপভাবে পরলোকের বৈশিষ্ট্য এই যে, তথাকার আয়ুষ্কাল অনন্ত। কেহ সেখানে মৃত্যুমুখে পতিতই হইবে না? এদিকে বিদ্রোহীর শাস্তি ইহলোকেও 'যাবজ্জীবন কয়েদ' এবং পরলোকেও তাহাই। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলার ব্যবস্থা যুক্তি বহির্ভূত বলা যাইতে পারে না। তিনি কোন নূতন কাজ তো করেন নাই। তাহাই করিয়াছেন যাহা তোমরা করিয়া থাক। পক্ষান্তরে পাপী মু'মিনদের অন্তরে যেহেতু ঈমান রহিয়াছে, কাজেই উহার ফলে তাহাদের এক নির্দিষ্ট কালের জন্য শাস্তি হইবে। কেননা, তাহারা খোদাদ্রোহী নহে। পক্ষান্তরে কাফেরেরা খোদাদ্রোহী এবং বিদ্রোহের শাস্তি অনন্ত কারাবাস। কাজেই তাহাদিগকে অনন্তকাল দোযখে বাস করিতে হইবে।

ছাত্রসুলভ প্রশ্নের উত্তর : এস্থলে ছাত্রসুলভ একটি প্রশ্নের উদ্ভব হইতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতটি কাফেরদের উদ্দেশ্যে নাযিল হইয়াছে এবং যেসমস্ত কার্যের দরুন তাহাদিগকে শাস্তির ধমক প্রদান করা হইয়াছে, তন্মধ্যে কতক শাখা-বিধান জাতীয়ও বটে। ইহাতে বুঝা যায়, কাফেরেরা শরীঅতের শাখা-বিধানগুলির আওতাভুক্ত, অথচ ফেকাহ্-শাস্ত্র ও মূলনীতিবিশারদ মনীষীদের মতে কাফেরেরা শরীঅতের শাখা-বিধানগুলির আওতাভুক্ত নহে। এই কারণেই তাঁহারা বলিয়াছেন, যদি কাফের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নামায পড়ে, তাহা শুদ্ধ হইবে না। কারণ, সে শরীঅতের বিধানা-বদ্ধ নহে। অনুরূভাবে ইসলাম গ্রহণের পর পূর্ব নামাযের কাযাও তাহার উপর ওয়াজেব নহে।

ইহার উত্তর এই যে, ইহাতে কাফেরেরা শরীঅতের শাখা-বিধানের আওতাভুক্ত হওয়া অব-ধারিত হয় না। কেননা, কাফেরেরা যে শাস্তি ভোগ করিবে, মূলত তাহা শুধু কুফরের জন্য হইবে। পক্ষান্তরে পাপী মুসলমান যে শাস্তি ভোগ করিবে তাহা কেবলমাত্র শাখা-বিধান অমান্য করার জন্যই হইবে। ইহা অবশ্য সত্য যে, শাখা-বিধান অমান্য করার দরুন কাফেরদের শাস্তি অতিরিক্ত হইবে এবং আযাবও অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে। এ কথা নহে যে, শুধু শাখা-বিধান অমান্য করার জন্য শাস্তি হইবে।

ইহার দৃষ্টান্ত এরূপ মনে করিতে পারেন, সরকারবিরোধী দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন যদি বিদ্রো-হের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনাও সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়, আর একজন কেবল নিজেই বিদ্রোহী, কিন্তু দেশে দেশে কোন আন্দোলন করে না, বলাবাহুল্য, দেশদ্রোহিতার শাস্তি উভয়েই ভোগ করিবে। কিন্তু বিদ্রোহের সঙ্গে উত্তেজনা সৃষ্টিকারীকে যে শাস্তি প্রদান করা হইবে, তাহা অবশ্যই অপর বিদ্রোহী অপেক্ষা গুরুতর হইবে, যেহেতু সে শুধু বিদ্রোহই সৃষ্টি করে নাই, সৃষ্টি করিয়াছে উত্তেজনা। এমতাবস্থায় উভয়ের মূল শাস্তি বিদ্রোহের জন্যই বটে; কিন্তু বিদ্রোহের সঙ্গে উত্তেজনা সৃষ্টি করার দরুন একজনের শাস্তি অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়াছে।

শাখা-বিধানসমূহ অমান্যকারী কাফেরকে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বিদ্রোহীর ন্যায় মনে করুন। যে আল্লাহ ও রাসূলের সত্যতায় অবিশ্বাস তো করেই, তদুপরি শাখা-বিধানসমূহও অমান্য করে। অতএব, মূল কুফরের জন্যই তাহাকে অনন্তকাল দোযখের আগুনে জ্বলিতে হইবে। কিন্তু শাখা-বিধানসমূহ অমান্য করার দরুন আযাবের মধ্যে কঠোরতা অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে। আর যে

কাফের ঈমানের শর্তবিহীন শাখা-বিধানসমূহ পালন করে; যেমন, ন্যায়-নিষ্ঠা, নম্রতা এবং বদান্যতা প্রভৃতি। ইহার দৃষ্টান্ত সেই বিদ্রোহী ব্যক্তির ন্যায়, যে শুধু বিদ্রোহই করিয়াছে, কিন্তু বিশৃঙ্খলা বা উত্তেজনা সৃষ্টি করে নাই। তাহার শুধু কুফরীর জন্যই শাস্তি হইবে, শাখা-বিধান অমান্য করার জন্য শাস্তি বৃদ্ধি পাইবে না। আশা করি, এই বর্ণনা দ্বারা উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন!

আর পাপী মুসলমানের দৃষ্টান্ত সেই অপরাধীর ন্যায় মনে করুন, যে ব্যক্তি দেশদ্রোহী নহে। সে বিদ্রোহী নহে বলিয়া বিদ্রোহের শাস্তি আজীবন কারাবাস ভোগ করিবে না, কেবল শাখা-বিধান অমান্য করার শাস্তি ভোগ করিবে।

আলোচ্য আয়াত হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, কাফেররা শাখা-বিধানসমূহের আওতাভুক্ত না হইলেও উহা অমান্য করার দরুন তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে। অবশ্য ইহা তাহাদের কুফরীর শাস্তি কঠোরতম করার উদ্দেশ্যেই হইবে। অতএব, ভাবিয়া দেখুন, শাখা-বিধানসমূহের আওতা-ভুক্ত মুসলমান যদি উহা অমান্য করে, তবে এই আয়াতের মর্মানুযায়ী সে শাস্তির ধমকের এবং ভীতি প্রদর্শনের অধিক উপযোগী বলিয়া প্রমাণিত হইবে। কেননা, শাখা-বিধানের আওতা বহির্ভূত কাফেরও যখন উহা অমান্য করার দরুন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন উক্ত বিধানের আওতাভুক্ত মুসলমান তাহা অমান্য করিলে কেন ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না?

সারকথা এই যে, কার্য যাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, সে-ই শাস্তির ভীতি প্রদর্শনের উপযোগী হইবে। সুতরাং যে নাফরমানীমূলক কার্যাবলী কাফেরদের মধ্যে বিদ্যমান, তাহা যদি আমাদের মধ্যেও পাওয়া যায়, তবে আমরাও অবশ্যই শাস্তির ভীতির উপযোগী হইব। কুফরীর শাস্তির ভীতির উপযোগী না হইলেও পাপানুষ্ঠানের শাস্তির উপযোগী অবশ্যই হইব।

ইহা সুস্পষ্ট কথা যে, আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের যেসমস্ত দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার সবগুলি আমাদের মধ্যে বিদ্যমান না থাকিলেও কতকাংশ অবশ্যই বিদ্যমান আছে। অবশ্য তাহাও কাফেরদের সমপরিমাণ নহে। দেখুন, আয়াতের প্রথমাংশে বর্ণিত إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا দোষ "যাহারা আমার দর্শনলাভের আশা পোষণ করে না"—সমস্ত মুসলমানই এই দোষ হইতে মুক্ত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা, মুসলমান এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, পরলোকে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ হইবে। কাজেই اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ কোন মুসলমানের মধ্যেই এই দোষটি নাই। কিন্তু দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত দোষ رَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا অর্থাৎ, "তাহারা দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট"—মুসলমানদের মধ্যে অবশ্য বিদ্যমান আছে। যদিও কাফেরদের সমপরিমাণ নহে; কিন্তু আছে নিশ্চয়ই। যদি কাহারও মনে এরূপ সন্দেহ হয়—যাহারা দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট থাকার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার দর্শনলাভের আশাও রাখে না, আয়াতে বর্ণিত শাস্তির ভীতি কেবল তাহাদের উদ্দেশ্যেই প্রদান করা হইয়াছে। মুসলমান দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট থাকিলেও এই শাস্তির ভীতির পাত্র হইবে না, তবে তদুত্তরে বলা হইবে, ভাষায় অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি এরূপ সন্দেহ করিতে পারে না। ভাষায় পারদর্শী প্রত্যেকটি লোক আয়াতটি শ্রবণ করিয়া, ইহাই বুঝিবে যে, কুফরীর সহিত মিলিত হওয়া ছাড়াও পৃথক পৃথক অবস্থায় এই দোষগুলিরও নিন্দনীয়তা বর্ণনা করা আয়াতটির উদ্দেশ্য।

অতঃপর বলিয়াছেনঃ وَاطْمَأَنُّوْا بِهَا "এবং উহা লইয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছে"—এই বাক্যটি পূর্বোক্ত رَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا বাক্যের তাফ্‌সীর-স্বরূপ। ইহা কোরআনের তাফ্‌সীর সংক্রান্ত একটি সুন্দর অনুগ্রহের প্রকাশ। কেননা, দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট থাকা মানুষের স্বভাব, ইহাতে ইচ্ছা শক্তির কোনই স্থান নাই।

দুনিয়ার সহিত আন্তরিকতা নিন্দনীয়ঃ নিছক দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট থাকা যদি পাপ কার্য বলিয়া গণ্য হইত, তবে একটি মানুষও এই পাপ হইতে রেহাই পাইতে পারিত না। কেননা, দুনিয়ার জীবনে কে সন্তুষ্ট নহে? এই জন্যই رَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا কথাটির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইল। ইহার ব্যাখ্যা সঙ্গে সঙ্গে না করা হইলে প্রত্যেক মানুষই পরকাল সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়িত। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলার ইহাই বিশেষ অনুগ্রহ যে, সঙ্গে সঙ্গে ইহার ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন— رَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوْا بِهَا "যাহারা দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হইয়াছে এবং উহা লইয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছে।"

শেষোক্ত কথাটি যোগ করিয়া দেওয়ার ফলে বুঝা গেল যে, দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট থাকা তখনই নিন্দনীয় হইবে, যখন উহার সহিত আন্তরিকতাও থাকে; অন্যথায় নিন্দনীয় নহে। কেননা, দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট থাকা স্বাভাবিক ব্যাপার। যেমন, অপর একটি আয়াতে এই কথাটি পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছেঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآءُكُمْ وَاَبْنَآءُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنَ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ — الاية

"অর্থাৎ, আপনি বলিয়া দিন, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের পরিবার, তোমা-দের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসায়ের বস্তু, যাহার বাজার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করিতেছ এবং তোমাদের বাসগৃহ, যাহা তোমাদের নিকট পছন্দনীয়—যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল অপেক্ষা এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় ...." এস্থলে আয়াতে বর্ণিত বস্তুসমূহ আল্লাহ্ এবং রাসূল অপেক্ষা অধিক প্রিয় হওয়ার অব-স্থায়ই শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। কিন্তু যদি এই সমুদয়ের প্রতি কিছু মহব্বত হয় এবং তাহা আল্লাহ্ ও রাসূলের মহব্বত অপেক্ষা অধিক না হয়, তবে তাহা দণ্ডনীয় ও নিন্দনীয় নহে। কেননা, এই পদার্থগুলি পার্থিব জীবনের অপরিহার্য উপকরণ। কাজেই ইহাদের প্রতি মানুষের অনুরক্ত হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং বুঝা গেল যে, এ সমস্ত পদার্থকে পছন্দ করা এবং তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হওয়া অর্থাৎ, মোটামুটি সম্মত থাকা শাস্তি ভোগের কারণ নহে। অবশ্য দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হইয়া পরলোক সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িলে তাহা শাস্তির ভীতি প্রদর্শনের কারণ হইবে। আর আন্তরিকতার ক্ষেত্রেই চিকিৎসার প্রয়োজন, অন্যথায় নহে।

এখন জানিয়া লওয়া দরকার اطمینان 'আন্তরিকতা' কাহাকে বলে—যাহার প্রতি ভীতি প্রদর্শিত হইয়াছে। ইতমীনান শব্দের মূল অর্থ—বিরতি বা নিবৃত্তি। ইহা গতিশীলতার বিপরীত। অতএব, দুনিয়ার জীবনে ইতমীনান হওয়ার অর্থ উহাতে এমন শান্তি ও তৃপ্তি আসা, যাহার ফলে মনে-প্রাণে সম্মুখের দিকে ভবিষ্যতের জন্য কোন আলোড়নও হয় না, কোন আগ্রহও হয় না।

কল্পনাশক্তি যেন আর সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয় না। যেমন, কোন পদার্থ কেন্দ্রস্থলে আসিয়া স্থির হইয়া যায়। নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, সম্মুখের দিকে চলে না। এমন অবস্থার জন্যই শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। বস্তুত আজকাল আমাদের অধিকাংশের অবস্থাই এরূপ! যে যেই অবস্থায় আছে তাহাতেই স্থির হইয়া রহিয়াছে। সম্মুখের দিকে আর পা বাড়াইতেছে না। দুনিয়ার জীবনের জন্যই আমাদের সম্যক চিন্তা নিয়োজিত। দুনিয়ার চিন্তায় নিমজ্জিত লোকদের অবস্থা এই যে, দুনিয়ার আলোচনা ভিন্ন আর কোন কিছুর আলোচনাই তাহাদের সেখানে নাই। এমন কি, রেলগাড়ীতে সহযাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করিলেও দুনিয়ার বিষয়েই আলাপ করিয়া থাকে। যেমন, "আপনাদের অঞ্চলে শস্যের কেমন অবস্থা? বৃষ্টি কেমন হইয়াছে? অমুক অমুক জিনিসের দর কি?" মোটকথা, প্রত্যেক মজলিসেই কেবল দুনিয়ার আলোচনা। অথচ রেল ভ্রমণের সময়টুকু নিতান্তই নিশ্চিন্ত এবং আনন্দিত থাকার সময়। কিন্তু দুনিয়াদারগণ এরূপ সময়েও কেবল দুনিয়ার চিন্তায়ই নিমগ্ন থাকে। তাহাদের কল্পনা বা চিন্তাশক্তি ইহার সম্মুখে অগ্রসর হইতেই চায় না। দুনিয়ার উপরই স্থির এবং নিশ্চল হইয়া গিয়াছে। পরলোকের কল্পনা বা চিন্তা কখনও মনের কোণে স্থান পায় না। অতঃপর বলিতেছেন, وَهُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غَافِلُوْنَ অর্থাৎ, "তাহারা আমার নিদর্শন এবং প্রমাণসমূহ স্বচক্ষে দর্শন করিয়াও উহাতে চিন্তা করিয়া আমার শক্তি ও মহিমা উপলব্ধি করার প্রতি মনোনিবেশ করে না।" এদিক হইতে সর্বদা সম্পূর্ণ অমনোযোগী থাকে। ইহাই হইল এই তিনটি বাক্যের সারমর্ম, যাহাতে মূল অপরাধ এই প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়ার জীবন লইয়া আমরা শান্ত এবং স্থির হইয়া রহিয়াছি। আমাদের কল্পনা বা মনোযোগ পরলোকের দিকে মোটেই অগ্রসর হইতেছে না।

পরলোকের দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রকারভেদঃ এখন বুঝিয়া লউন, দুনিয়ার জীবনে স্থিরতা ও নিশ্চলতার বিপরীত পরলোকের দিকে অগ্রগতি তিন প্রকারঃ ১। বিশ্বাসের গতিশীলতা, ২। কর্ম-চাঞ্চল্য, ৩। অবস্থার সচলতা। অর্থাৎ, পরলোকের আকর্ষণে ও ধ্যানে সর্বদা অস্থির থাকা এবং উহারই অনুসন্ধানে লিপ্ত থাকা। কাফেরদের মধ্যে উক্ত ত্রিবিধ অগ্রগতির কোনটিই নাই। কেননা, তাহাদের বিশ্বাসই সুস্থ এবং সঠিক নহে। দুনিয়াদার মুসলমানদের মধ্যে বিশ্বাসের গতিশীলতা অবশ্যই বিদ্যমান। কিন্তু কর্মের ও অবস্থার গতিশীলতা নাই। অর্থাৎ, পরলোকের কার্যের জন্য কোন ধ্যান বা চেষ্টাও নাই, কোন অনুসন্ধানও নাই। এই রোগটি প্রায় ব্যাপক। সাধারণ লোক তো দূরেরই কথা—আমাদের শিক্ষিত সমাজের অবস্থাই এইরূপ যে, আমাদের মন আখেরাতের চিন্তায় অস্থির নহে। কিন্তু কাহারও বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা দায়ের হইলে তাহার মনে এক অস্থিরতার উদ্ভব হয়। কোন সময়ের তরে মনে শান্তি ও স্থিরতা থাকে না। সর্বদা কেবল সেই মোকদ্দমারই ধ্যান-চিন্তা আর উহার কল্পনা। দেখুন, দেশে যখন প্লেগ মহামারী আকারে দেখা দিয়াছিল, তখন সকলের মনে কেমন অস্থিরতা বিদ্যমান ছিল! কোন সময়েই মনে শান্তি ছিল না। শুধু উহারই চিন্তা এবং উহারই ধ্যান। আখেরাতের জন্য আমাদের মনে কিন্তু তদ্রূপ অবস্থা নাই; বরং যে যেই অবস্থায় আছে উহাতেই স্থির রহিয়াছে। বর্তমান অবস্থা হইতে অপেক্ষাকৃত উন্নততর অবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য একটুও চেষ্টা নাই। মনে করুন, যথানিয়মে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িতেছি। ইহাতেই স্থির রহিয়াছি, ইহাছাড়া কিছু অতিরিক্ত নফল নামায পড়ার চেষ্টা বা কল্পনা কখনও হয় না। কোন সময় এমন কল্পনাও করি না যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই আমরা ঠিকমত

আদায় করিতেছি কিনা। ইহাও এক প্রকারের গতিশীলতা, যাহা আমরা পরিত্যাগ করিয়া বসিয়াছি। মোটকথা, আমরা যেই অবস্থায় আছি তাহাতেই স্থির রহিয়াছি। তাহা লইয়াই তৃপ্তি বোধ করিতেছি এবং মনে করিতেছি যে, সবকিছুই সমাধা করিতেছি। অথচ আমাদের অবস্থা এরূপ হওয়া উচিত ছিল যে, সবকিছু করা সত্ত্বেও ভীত এবং সন্ত্রস্ত থাকি। যেমন, আল্লাহ্ পাক খোদাভীরু লোকের বর্ণনায় বলিয়াছেনঃ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآاٰتَوْا وَّ قُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ "যাহারা যাহা দান করিবার ছিল দান করে এবং তাহাদের অন্তর এই ভয়ে ভীত থাকে যে, তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে গমন করিবে।" অর্থাৎ, নেক কাজ করিয়াও তাহাদের অন্তর ভীত এবং সন্ত্রস্ত থাকে। দেখুন, কোন ঊর্ধ্বতন অফিসারের অধীনস্থ কর্মচারীগণ যদি খুব তৎপরতার সহিত কাজ করে, তথাপি অফিসারের আগমনের সময় তাহাদের মনে এই ভয় উদিত হয় যে, পাছে ঊর্ধ্বতন অফিসার আমাদের কাজ অনুমোদন না করেন। অতএব, অফিসারের আগমনকালে তাহাদের হৃদয়ে অস্থিরতা এবং চাঞ্চল্য বিরাজ করে যে, কি জানি, আমাদের পরিণাম কি হয় ? মুসলমানদের অন্তরের অবস্থাও ঠিক এইরূপ হওয়া উচিত। কাজ সমাধা করার পরেও এই ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকা উচিত—হাশরে আমাদের অবস্থা না জানি কেমন হয় ? মুসলমানের হৃদয়ে পরকাল সম্বন্ধে কখনও শান্তি, স্থিরতা ও নিশ্চিন্ততা থাকা উচিত নহে। এরূপ অবস্থা উৎপন্ন না হইলে মনে করিতে হইবে কিছুই হাসিল হয় নাই।

দেখুন, আম্বিয়ায়ে কেরাম যাবতীয় অবস্থা বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা চিন্তিত থাকিতেন। অথচ আমরা এমন নিশ্চিন্ত ও স্থিতিশীল অবস্থায় আনন্দে কাল যাপন করিতেছি, তথাপি আমরা নিজের পরহেযগারীর গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। আমরা আম্বিয়ায়ে কেরামের চেয়ে অধিক পরহেযগার নিশ্চয়ই নহি। তাঁহারা আল্লাহ্‌র ভয়ে চিন্তা করিতে করিতে ওষ্ঠাগত প্রাণ ছিলেন। কাজেই প্রত্যেক মুসলমানেরই কোন সময় নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নহে; বরং তাহাদের অবস্থা এরূপ হওয়া উচিতঃ

عاشقی چیست بگو بندۂ جاناں بودن ـ دل بدست دگرےدادن و حیراں بودن

"প্রেম কি ? বল, প্রিয়জনের আজ্ঞাবহ দাস হওয়া এবং স্বীয় ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে তাহারই ইচ্ছাধীন করিয়া অস্থির ও পেরেশান থাকার নাম প্রেম।"

এই চিন্তা ও চাঞ্চল্য কিসের জন্য ? আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভে উন্নতি করার জন্য। আল্লাহ্‌র নৈকট্যের কোন সীমা নাই, কাজেই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ নৈকট্য লাভ করিয়া বিরত ও তৃপ্ত হওয়া যাইতে পারে না। সেই দরবারের অবস্থা এইরূপ যে, যতই উন্নতি লাভ কর না কেন, তাহাই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কবি বলিয়াছেনঃ

اے برادر بے نہایت درگہے است ـ ہرچہ بروےمیرسی برو ےمایست

"ভ্রাতঃ! আল্লাহ্‌র দরবার একটি সীমাহীন দরবার। উহার যতই নিকটে পৌঁছিবে ততই সেই অতিক্রান্ত পথ চিহ্নবিহীন অনতিক্রান্ত বলিয়া বোধ হইবে।"

আমরা সংসারে বহু ভূস্বামীকে দেখিয়াছি, তাহারা দুনিয়াতে যতই উন্নতি লাভ করুক না কেন, কোন পর্যায়েই তৃপ্ত হয় না। যে পরিমাণ ভূমিরই মালিক হউক না কেন তাহাতে তৃপ্ত থাকে না; বরং আরও ভূমি আরও কতগুলি গ্রাম অধিকারে আনয়নের লিপ্সায় প্রতিনিয়ত অস্থির থাকে।

কিন্তু আফ্‌সোসের বিষয়, আখেরাতের বেলায় মানুষ কেমন করিয়া শুধু নামাযের গুটিকতক সজ্‌দা করিয়াই তৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত হইয়া যায়? চাকুরীজীবীদের মধ্যে আজ যাহার মাসিক বেতন ৫০·০০ টাকা, কাল সে কেমন করিয়া ১০০·০০ টাকা মাসিক বেতন লাভ করিবে সে চিন্তায় অস্থির থাকে। যাহাদের বাড়ী-ঘর প্রস্তুত করাইবার শখ আছে, তাহাদের সর্বদা চিন্তা থাকে—কেমন করিয়া ঘর-বাড়ীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা যাইবে। কোন এক শৌখীন ধনী ব্যক্তির দালান-কোঠা নির্মাণের শখ ছিল অপরিসীম। সর্বদা এই ধ্যানেই থাকিতেন, কেমন করিয়া আর একখানা বাড়ী বা দালান নির্মাণ করা যায়। তিনি বলিতেনঃ হাতুড়ির আওয়ায আমার কানে না আসা পর্যন্ত আমার মনে শান্তি আসে না। দালান-কোঠা ও অট্টালিকা সম্বন্ধে রাজমিস্ত্রীদের উক্তি—"এক গজ ভূমিতে সারা জীবন রাজমিস্ত্রীর কাজ চালু রাখা যায়।" এক গজ ভূমিই সারা জীবনের জন্য যথেষ্ট, একতলার উপর আর একতলা, এইরূপ সারা জীবনব্যাপী নির্মাণকার্য বাড়ান হইলে এক জীবনে তাহা সমাপ্ত হইবে না।

মোটকথা, যাহার যে বস্তুর দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহা লাভ করিয়া সে কখনও তৃপ্ত হয় না। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আখেরাতের বেলায় মন তৃপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু দুনিয়ার প্রতি কখনও তৃপ্তি আসে না। মাওলানা রূমী (রঃ) বলেনঃ

اےکه صبرت نیست از دنیائےدوں ـ صبر چوں داری زنعم الماهدون
اےکه صبرت نیست از فرزند وزن ـ صبر چوں داری زرب ذو المنن

"এই নশ্বর দুনিয়ার মহব্বতে তোমার আত্মার তৃপ্তি হয় না। কিন্তু জগতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা হইতে তোমার মন কিরূপে তৃপ্ত হইয়া গেল। স্ত্রী-পুত্রের ভালবাসা হইতে তোমার মন তৃপ্ত হইল না, তবে দয়াল আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বত হইতে কেন তুমি তৃপ্ত হইয়া গেলে?"

দুনিয়ার ঝামেলায় কখনও তোমাদের মন বিরক্ত হয় না; কিন্তু আল্লাহ্ ও রাসূল হইতে বিরক্ত হইয়া একদম ঠাণ্ডা হইয়া বসিয়া গেলে? কোথায় আগ্রহ! কোথায় উৎসাহ্!! চিন্তাই নাই যে, ভবিষ্যতে কি হইবে? তবে আমাদের আসল ত্রুটি হইল দুনিয়ার জীবনের প্রতি আমরা সন্তুষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। বন্ধুগণ! যাহার মধ্যে গতিশীলতা বিদ্যমান থাকে তাহার অবস্থা এইরূপ হইয়া থাকে, যেমন কবি বলিয়াছেনঃ

دل آرام در بـر دل آرام جـو ـ لب از تشنگی خشـك و بر طرف جو

"প্রিয়জন বক্ষেই রহিয়াছে, তথাপি প্রিয়জনের অন্বেষণ চলিতেছে। নদীর তীরে উপবিষ্ট; কিন্তু তৃষ্ণার জ্বালায় ওষ্ঠাধর শুষ্ক।"

ইহলোকে কেহ কাহারও প্রতি অনুরক্ত হইলে মিলনের পরে অনুরাগের অবসান হয়। যেমন, কেহ কোন বীরাঙ্গনা রমণীর প্রতি আসক্ত হইলে মিলনের সঙ্গেই আসক্তি সমাপ্ত হইয়া ক্রমশ তাহার প্রতি বিরক্তি উৎপন্ন হইতে থাকে। কেননা, তাহার সৌন্দর্যের পরিসীমা এ পর্যন্তই। তাহার সম্মুখের দিকে আর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু খোদার মহব্বতে তো কখনও তৃপ্তি বা বিরক্তি আসা উচিত নহে। কেননা, তাঁহার সৌন্দর্যের কোন সীমাই নাই। তথাকার অবস্থা এইরূপঃ

نه حسنش غایتے دارد نه سعدی را سخن پایاں
بمیرد تشنه مستسقی و دریا همچناں باقی

"তাঁহার সৌন্দর্যেরও কোন সীমা নাই, সা'দীর বাক-স্পৃহারও শেষ নাই। কিন্তু তৃষ্ণাতুর রোগী পিপাসায় মারা যায়, অথচ সমুদ্র নিজ অবস্থার উপরই স্থায়ী আছে।"
আল্লাহ্ তা'আলার মহিমা ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে অপর এক কবি বলিয়াছেনঃ

قلم بسکن سیاهی ریز و کاغذ سوز و دم در کش
حسن ایں قصۂ عشق است در دفتر نمے گنجد

"কলম ভাঙ্গিয়া ফেল, কালি ফেলিয়া দাও, কাগজ জ্বালাইয়া ফেল এবং বর্ণনা ক্ষান্ত কর। এশ্‌কে এলাহীর সৌন্দর্য কাহিনী অসীম। কাগজের দফতরে কলমের সাহায্যে কালি দ্বারা লিখিয়া শেষ করা যাইবে না।"

তাঁহার সৌন্দর্য কি শেষ হইবে? সৌন্দর্যের বর্ণনারও শেষ নাই। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ۝

"আপনি বলুন, যদি আমার প্রভুর মহিমা ও গুণাবলী লিখিবার জন্য সমস্ত সমুদ্রের পানি কালি-রূপে ব্যবহৃত হয়, তবে সমুদ্রের পানি নিঃশেষ হইয়া যাইবে আমার প্রভুর সৌন্দর্য ও গুণাবলী সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই, যদিও অনুরূপ আরও সমুদ্রের পানি আনয়ন করা হয়। আল্লাহ্‌র সৌন্দর্য ও মহিমা সম্বন্ধে অন্য এক কবি বলেনঃ

داماں نگه تنگ و گل حسن تو بسیار ـ گل چیں بهار تو زداماں گله دارد

"দর্শকের আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টির অঞ্চল সঙ্কীর্ণ, আর তোমার মহিমা ও সৌন্দর্যের ফুল অনেক। সুতরাং তোমার সৌন্দর্যের পুষ্প আহরণকারী স্বীয় অঞ্চলের সঙ্কীর্ণতার অভিযোগ করিতেছে।"

তৃপ্তির দ্বিবিধ অবস্থা হইতে পারেঃ ১। সৌন্দর্য নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার কারণে। ২। দর্শকের আকাঙ্ক্ষার অভাবের কারণে। আল্লাহ্ পাকের সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে প্রথম প্রকারের তৃপ্তি সম্ভবই নহে। কেননা, তাহা অসীম, হাঁ, শেষোক্ত অবস্থা অর্থাৎ, আমাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষার অভাবে তৃপ্ত হওয়া সম্ভব। কিন্তু মুসলমানের পক্ষে ইহা বড়ই অমনোযোগিতা এবং দোষের কথা। সুতরাং আমাদের হৃদয়ে আল্লাহ তা'আলার সৌন্দর্য দর্শনের এবং মহিমা উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন করা উচিত।

বন্ধুগণ! পরলোকের ধ্যান উৎপন্ন করুন এবং বুঝিয়া লউন, প্রত্যেক বস্তু লাভ করার নির্দিষ্ট প্রণালী আছে। এইরূপে ধ্যান উৎপন্ন করারও প্রণালী রহিয়াছে। তাহা এইঃ মোরাকাবা করুন, আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের সংসর্গ অবলম্বন করুন। যেকের করুন। আমাদের উচিত দিবারাত্রি আল্লা-হ্‌র মহিমা সম্বন্ধে চিন্তা করা। দুঃখের বিষয়, আমরা কোন চিন্তাই করি না; চিন্তা করার অভ্যাস জন্মিলে সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। আমাদের মধ্যে যাহাদের আমলের অভ্যাস আছে, তাঁহারা কেবল সময় ও সুযোগ করিয়া অধিক পরিমাণে ওযীফা পাঠ করিয়া থাকেন। নফল নামায পড়িয়া থাকেন। আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, "ওযীফা ও নফল নামাযের জন্য যেরূপ সময় ও সুযোগ করিয়া লইয়াছেন, তদ্রূপ ধ্যান-চিন্তার জন্যও কিছু সময় রাখিয়াছেন কি? যাহাতে

পরলোকের বিষয় চিন্তা করিতে পারেন,—মৃত্যুর পরে কিরূপ অবস্থার সম্মুখীন হইবেন? কবরে কি অবস্থা ঘটিবে? হাশরের ময়দানের অবস্থা কিরূপ হইবে? পুল্সেরাতে কি অবস্থা ঘটিবে? আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবেন কি? বন্ধুগণ! আযাবের কথাও চিন্তা করুন, সওয়াবের কথাও চিন্তা করুন।

কোরআন শরীফে ধ্যান-চিন্তার বিভিন্ন পদ্ধতি বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোথাও বেহেশ্তের বর্ণনা এবং কোথাও দোযখের অবস্থা রহিয়াছে।

ধ্যানের জন্য বিপরীত বস্তুর উল্লেখের কারণ এই যে, মানুষের স্বভাব বিভিন্ন প্রকার। কাহারও দোযখের আযাব চিন্তা করিলে সুফল লাভ হয়। আবার কাহারও পক্ষে বেহেশ্তের বিবিধ নেয়ামত -সমূহের কল্পনা হিতকর হইয়া থাকে।

এক ব্যক্তি আমার নিকট অভিযোগ করিল যে, মৃত্যুর ধ্যান করিলে তাহার মন ঘাবড়াইয়া যায়। আমি বলিলামঃ মৃত্যুর ধ্যানে মন ঘাবড়াইয়া গেলে জীবনের চিন্তা কর। কল্পনা কর, এই জীবনের পরে ইহা অপেক্ষা উত্তম আর এক অনন্ত জীবন আছে।

বন্ধুগণ! দুনিয়া এবং আখেরাতকে স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রার সহিত তুলনা করুন। মনে করুন, এক ব্যক্তি একটি স্বর্ণ-মুদ্রা সঙ্গে লইয়া বাহির হইল, পথে আর এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার নিকট ঝক্ঝকে একটি রৌপ্য-মুদ্রা রহিয়াছে। সে ব্যক্তি স্বর্ণ-মুদ্রার মালিককে বলিলঃ তুমি ইচ্ছা করিলে তোমার ঐ মলিন মুদ্রাটি আমাকে দান করিয়া তৎপরিবর্তে এই উজ্জ্বল চক্চকে মুদ্রাটি গ্রহণ করিতে পার। স্বর্ণ-মুদ্রার বর্ণ উহার মালিকের দৃষ্টিতে রৌপ্য-মুদ্রার চাক্চিক্যের তুলনায় সুন্দর বোধ হইতেছিল না। অধিকন্তু রৌপ্য-মুদ্রাটি ওজনেও বেশী ছিল। এই কারণে সে বিনিময় করিতে সম্মত হইয়া গেল। এমন সময় এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল, মিঞা! ধোঁকায় পতিত হইও না। রৌপ্য-মুদ্রাটি স্বর্ণ-মুদ্রার তুলনায় অধিক উজ্জ্বল এবং ভারি হইলেও একটি স্বর্ণ-মুদ্রার মূল্য ১৮টি রৌপ্য-মুদ্রার সমান। লোকটি তখন চিন্তা করিয়া দেখিল, ব্যাপার এরূপ হইলে আমি রৌপ্য-মুদ্রা লইয়া কি করিব? বলাবাহুল্য, এমতাবস্থায় লোকটি উক্ত মুদ্রা বিনিময়ে কখনও সম্মত হইবে না। ইহা হইল চিন্তার ফল।

চিন্তা করিলে প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ চিনিতে পারা যায়। মানুষ কোন বস্তু লইয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলে পরিশেষে উক্ত বিষয়ের মূলতত্ত্ব জ্ঞানায়ত্ত হইয়াই যায়। সুতরাং দুনিয়া ও আখেরাত সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিলে জানিতে পারা যাইবে যে, আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া কিছুই নহে। স্বর্ণ-মুদ্রার তুলনায় রৌপ্য-মুদ্রার মূল্য যাহাকিছু আছে, আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার মূল্য তদ্রূপও নাই।

কোরআন শরীফে যে বর্ণিত আছে— لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ "যেন তোমরা দুনিয়া এবং আখেরাত সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখ!" জনৈক তাফসীরকার দুনিয়া সম্বন্ধে চিন্তা করার কেমন সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন! অর্থাৎ, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট এবং সুখ-শান্তি সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে যে, দুনিয়ার সুখ-শান্তি একদিন নিঃশেষ হইয়া যাইবে এবং দুনিয়ার জীবন কেবল দুঃখ-কষ্টে পরিপূর্ণ। পক্ষান্তরে আখেরাত সম্বন্ধে চিন্তা করিলে উহার বিপরীত দেখিতে পাইবে। উভয়কে সমষ্টিগতভাবে লইয়া চিন্তা করিলে দুনিয়া তোমার দৃষ্টিতে নিতান্ত তুচ্ছ ও হেয় বলিয়া মনে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আখেরাতের প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে। মোটকথা,

আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া কিছুই নহে বলিয়া বুঝিতে পারিবে এবং এই ধ্যানের ফলে দুনিয়ার কষ্টও তোমার নিকট ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকিবে। কেননা, তুমি যখন চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিবে যে, দুনিয়ার কষ্ট একদিন নিঃশেষ হইবেই। পক্ষান্তরে পরলোকে কেবল শান্তিই শান্তি। তখন দুনিয়ার কষ্ট কষ্ট বলিয়াই মনে হইবে না। এই কারণেই পূর্বোক্ত 'যা করে'কে বলিয়াছিলাম ঃ 'মৃত্যুর চিন্তায় মন ঘাবড়াইলে জীবনের চিন্তা কর।' আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক ব্যক্তির উপযোগী চিন্তার বিষয় নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের চিন্তা করিবার কোন অবসরই নাই।

চিন্তা এবং উহার বাধাসমূহ ঃ চিন্তা করার পথে কি কি বাধা আছে এখন আমি তাহা বর্ণনা করিব। দুইটি বস্তু চিন্তার পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া থাকে। ১। দৈহিক কামনা। মানুষ দুনিয়ার নানা-বিধ কামনায় লিপ্ত হইয়া আখেরাতের চিন্তা করে না এবং ইহলোকের কামনাজালেই জড়িত হইয়া থাকে। ২। নফ্‌সের সুখ-শান্তি। কখনও বা মানুষ নফসের সুখ-শান্তির মোহে মত্ত হইয়া আখেরা-তের চিন্তা হইতে বিরত থাকে। কেননা, তাহারা মনে করে, আখেরাতের চিন্তা মনে স্থান দিলে ইহলোকের সুখ-শান্তির ব্যাঘাত ঘটিবে। কিন্তু মানুষ ভাবিয়া দেখে না যে, আখেরাতের চিন্তার ফলে ইহলোকের দুঃখ-কষ্ট সহজ হইয়া যাইবে। অতঃপর সুখ-শান্তি সম্বন্ধেও মানুষের ভাবিয়া দেখা উচিত—আমি দুনিয়ার সুখ-শান্তির মোহে মাতিয়া থাকিলে আখেরাতের সুখ-শান্তি হইতে বঞ্চিত হইব। এরূপ চিন্তায় পদে পদে উপকৃত ও লাভবান হওয়া যায়।

মূল চিকিৎসা সংক্ষিপ্ত চিন্তা—ইহার সাহায্যে এল্‌ম এবং আমল সংশোধিত হইয়া যাইবে। এখন বুঝিয়া লউন, আমল দুই প্রকার। এক প্রকারের আমল জায়েয বা না-জায়েয হওয়া সম্বন্ধে আপনি অবগত আছেন, তাহা স্মরণ করিয়া এখন হইতে আমল করিতে আরম্ভ করুন। আর এক প্রকারের আমল জায়েয বা না-জায়েয হওয়া সম্বন্ধে আপনি অবগত নহেন, যথা—জমিদারী (সম্পত্তি) সংক্রান্ত অনেক কাজ এমনও আছে, যাহা জায়েয না-জায়েয হওয়া সম্বন্ধে লোকে কিছুই জানে না, তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করুন। আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হউন এবং তদনুযায়ী আমল করিতে থাকুন। এই বিষয় আমি দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিলাম। চিন্তা করিলে ধর্মের সমস্ত দরজাই আপনাদের সম্মুখে মুক্ত দেখিতে পাইবেন।

চিন্তা করার দৃষ্টান্ত এইরূপ মনে করুন, যেমন ঘড়ির হেয়ার স্প্রিং। আকারে উহা খুবই ক্ষুদ্র। কিন্তু ঘড়ির অভ্যন্তরস্থ যাবতীয় অংশগুলি ইহারই সাহায্যে নড়াচড়া করিয়া থাকে। এইরূপে চিন্তার সাহায্যে আপনারা ধর্মের দুর্ভেদ্য দুর্গও জয় করিতে পারিবেন। সাধারণ লোকের কথা কি বলিব, —আলেমগণই বা কি করেন? কিছুই করেন না। আমিও তদ্রূপই। অবশ্য আলেমদের চিন্তা করিবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু নির্জনে বসার প্রতি গুরুত্ব নাই। মোটকথা, ব্যাপকভাবে আমাদের রুচি বিগড়াইয়া গিয়াছে। সর্বদা হট্টগোল এবং হাসি-ঠাট্টায় সময় কাটাইতেছি। আমাদের অবস্থা এই যে, ক্লাবে কিংবা বৈঠকখানায় বসিয়া হাসি-কৌতুকে সমস্ত সময়টুকু অতিবাহিত করিয়া দিতেছি। প্রথমতঃ দুনিয়ার ঝামেলার জন্য আখেরাত সম্বন্ধে চিন্তা করার অবসরই পাইতেছি না। পাইলেও আখেরাতের চিন্তার পরিরবর্তে এই চিন্তা আসিয়া মন অধিকার করে যে, অমুক বন্ধুর নিকট যাইয়া কিছু গল্প-গুজব করা যাউক; সময়ও অতিবাহিত হইবে, আমোদও উপভোগ করা যাইবে। অবশেষে সেখানে যাইয়াই অপকার্যে মূল্যবান সময়টুকু কাটাইয়া আসি।

গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন, এইসব বন্ধু প্রকৃতপক্ষে আপনার শত্রু। মনে করুন, কেহ আপনার টাকা চুরি করিল। তাহার এই আচরণে আপনার মনে কেমন দুঃখ হইবে। তদ্রূপ আপনার

এই বন্ধু স্বর্ণ-মুদ্রা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান সময়টুকু নষ্ট করিয়াছে। অতএব, চিন্তা করিয়া দেখুন, সে কি সত্যই আপনার বন্ধু? আর এক ডাকাত 'হুক্কা'। এমন সর্বনাশা প্রথা প্রচলিত হইয়াছে যে, দুই পয়সার তামাক খরচ করিলে তদ্দ্বারা যত ইচ্ছা তত লোক একত্রিত করিয়া তাহাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করা যাইতে পারে। মোটকথা, হুক্কা কি জিনিস? হুক্কা বিবিধকে সমবেতকারী। হুক্কার আয়োজন করিলে ভাল-মন্দ সর্বপ্রকারের লোকই একত্রিত করা যায়। আমি স্বয়ং দেখিয়াছি, কাহারও গৃহে মজলিস জমাইয়া শোভা বর্ধনের ইচ্ছা করিলে সে ব্যক্তি হুক্কার আয়োজন করিয়া থাকে। অতঃপর লোকের অভাব হয় না। ফলকথা, যেন নিজেরাই নিজেদের মূল্যবান সম্পদ (সময়) লুণ্ঠন করিয়া নেয়ার জন্য গল্প-গুজবের আসর জমাইয়া থাকে।

সময় বড়ই মূল্যবান ঃ বন্ধুগণ! সময় বড়ই মূল্যবান সম্পদ। ইহার মর্যাদা রাখুন, ইহার সদ্ব্যব-হার করুন, ইহা এতই মূল্যবান যে, আযরাঈল আলাইহিস্‌সালাম রূহ্ কবয করার জন্য উপস্থিত হইলে, তখন আপনি সামান্য একটু সময়ের বিনিময়ে আপনার সম্পূর্ণ রাজত্বও দিতে প্রস্তুত হইয়া যাইবেন, কিন্তু তখন এক মুহূর্তের জন্যও সময় দেওয়া হইবে না। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন—

اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَايَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَايَسْتَقْدِمُوْنَ ○ "মানুষের নির্দিষ্ট সময় (মৃত্যু) আসিয়া পৌঁছিলে তাহা হইতে এক মুহূর্তও এদিক-ওদিক হইবে না।"

এই পরস্পর মেলামেশার দ্বারা সময় নষ্ট করা সম্বন্ধে আরও একটি প্রয়োজনীয় কথা আছে। এই শ্রেণীর ভয়ঙ্কর লোকদের জ্ঞানশক্তিকে ভয় করি, পাছে বিপরীত না বুঝেন। আজকাল জ্ঞানশক্তির বড়ই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। সোজা কথাকে উল্টা বুঝিয়া লয়। সুতরাং সেই জরুরী কথাটুকু বলিতে বাধ বাধ ঠেকিতেছে। কিন্তু যখন কথাটি মুখে আসিয়াই পড়িয়াছে, তখন আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াই ফেলিতেছি ঃ আজকাল কোন কোন মানুষ বিভিন্ন বুযুর্গ লোকের দর-বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আজ অমুক বুযুর্গের দরবারে, কাল আর এক বুযুর্গের দরবারে, পরশু অপর এক বুযুর্গের দরবারে। উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া দেখুন, আজকাল ইহাতেও ধর্মের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। কেননা, অধিকাংশ বুযুর্গের দরবারে সর্বশ্রেণীর লোক একত্রিত হইয়া সর্বপ্রকারের আলো-চনা করিয়া থাকে। এমন কি, গীবত বা অগোচরে দোষ ব্যক্ত করা পর্যন্ত। নবাগত লোকটি তাহা-দের হাঁ'র-সঙ্গে হাঁ মিলাইয়া পাপের ভাগী হইয়া থাকে। আজকালকার অধিকাংশ মজলিসেরই এই অবস্থা। শেষফল এই যে, এই লোকটি বুযুর্গান হইতে যত লাভবান হয় তাহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতি-গ্রস্ত হয়। বুযুর্গদের মজলিসেরই যখন এই অবস্থা, তখন অন্যান্য মজলিসসমূহের অবস্থা কেমন হইবে ভাবিয়া দেখুন। কিন্তু আজকাল স্থানে স্থানে মজলিস জমাইবার প্রথা ব্যাপক হইয়া দাঁড়াই-য়াছে। বৈঠকখানাসমূহ নির্মাণের উদ্দেশ্য ইহাই। অতঃপর তথাকার অবস্থা এই হয় যে, কয়েকজন মানুষ একত্রিত হইতেই গীবত এবং অনর্থক বাজে গল্প-গুজব আরম্ভ হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে পর-লোকের চিন্তার অভাবেই এ সমস্ত ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। কোন কাজ না থাকিলে আর কি করিবে —বৈঠকখানায় বসিয়া নানাবিধ গোনাহ্‌র কাজে সময় নষ্ট করা হয়। আজকাল বৈঠকখানাগুলি এই উদ্দেশ্যেই নির্মিত হইয়া থাকে। যেসমস্ত বস্তুর প্রতি দৃষ্টি করা হারাম, বৈঠকখানায় বসিয়া তৎ-প্রতিও দৃষ্টি করা হয়। এ সমস্ত বিষয় হইতে বাঁচিয়া থাকার অভ্যাসই লোপ পাইতে থাকে। এদিকে লক্ষ্যই থাকে না যে, অবৈধ দৃষ্টির জন্যও কঠিন শাস্তি হইবে। সুতরাং এ সমস্ত মজলিস হইতে পৃথক থাকাই অধিক নিরাপদ। ইহাতে অবৈধ কাজ হইতে রক্ষা পাওয়া সহজ হইতে পারে।

হযরত মাওলানা ইয়াকুব (রঃ) বলিতেনঃ আমাদের বুযুর্গীকে কলকারখানার কারিগরদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তাহারা কারখানার গণ্ডির মধ্যে থাকা পর্যন্ত বিচক্ষণ শিল্পী; কিন্তু কারখানা এলাকার বাহিরে তাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কেননা, কারখানায় তাহারা যাবতীয় কার্য মেশিন-এর সাহায্যে করিয়া থাকে। বাহিরে মেশিন অভাবে তাহারা কিছুই করিতে পারে না। আমাদেরও অনুরূপ অবস্থা। যতক্ষণ নির্জন কোণে অবস্থান করি, কিছু আমল এবং এবাদত করি এবং পাপ কার্য হইতে রক্ষিত থাকি। কিন্তু গৃহ হইতে বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিপদ আরম্ভ হয়। আমি পরিপক্ক বা কামেল লোকের কথা বলিতেছি না। কামেল লোকেরা অবশ্য ইহা হইতে স্বতন্ত্র। কামেল লোক আছেনই বা কয়জন? তাঁহাদের দৃষ্টান্ত আজকাল এইরূপ—যেন সহস্র সহস্র ছোলার মধ্যে একটি গমের বীজ।

আজকালকার মজলিসসমূহের অবস্থাঃ আজকালকার সাধারণ লোকের মজলিসসমূহের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। ইহারা পরলোকের চিন্তা ত্যাগ করিয়া কেবল দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হওয়ার কারণেই তাহাদের মজলিসসমূহের এই দুরবস্থা। যাহার অন্তরে পরলোকের চিন্তা বিদ্যমান থাকিবে সে ব্যক্তি দুনিয়াদারদের দৈনন্দিন কার্যকলাপ দেখিয়া বিরক্ত এবং পেরেশান হইবে। সে দেখিতে পাইবে, মানুষ ধর্মকে বিনষ্ট করিতেছে। দুনিয়ার মধ্যে এমনিভাবে মজিয়া গিয়াছে এবং উহা লাভ করিয়া এমনই নিশ্চিন্ত ও স্থিরচিত্ত হইয়াছে যে, ধর্মীয় কর্তব্য সম্বন্ধে একটুও চিন্তা করে না। সুতরাং যাহার হৃদয়ে ধর্মভাব বিদ্যমান, সে ব্যক্তি মানুষের ইত্যাকার অবস্থা দেখিয়া নির্জনতা অবলম্বন করিবে। আমি আপনাদিগকে কৃষিকার্য করিতে নিষেধ করিতেছি না। ক্রয়-বিক্রয় এবং দুনিয়ার অন্যান্য কাজকর্ম করিতেও বারণ করিতেছি না। আমার উদ্দেশ্য কখনও ইহা নহে যে, আপনারা দুনিয়ার যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া মসজিদের কোণে বসিয়া থাকুন; বরং আমার কথার উদ্দেশ্য এই যে, কাজকারবার সমস্তই চালু রাখুন; কিন্তু দুনিয়া হাসিল করিয়া পরলোক সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবেন না। পরকালকে প্রত্যেক কাজের লক্ষ্যস্থল করিয়া লউন। প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সমাধা করার পর যতটুকু সময় অবসর লাভ করেন তাহা বেহুদা কথাবার্তায় বিনষ্ট করিবেন না। শরীঅত বিগর্হিত কার্যসমূহে জড়িত হইবেন না; বরং যাহারা আজকালকার প্রচলিত মজলিসে অংশগ্রহণ না করিয়া হালের বলদের সাহচর্যে থাকে, তাহারা গল্প-গুজবে সময় নষ্টকারীদের চেয়ে বহুগুণে উত্তম। খুব বেশী হইলে এতটুকু হইবে যে, ইহারা বলদের সংসর্গে থাকিয়া বলদ হইবে, কিন্তু পরলোকের শাস্তি হইতে অবশ্যই রক্ষা পাইবে।

আমি এই জন্য কৃষিকার্যকে পছন্দ করি যে, কৃষকদের পাপ কার্য করিবার সুযোগ কম ঘটে। কেহ পানি ছিটাইতে ব্যস্ত, কেহ নূতন শস্য কর্তন করিতেছে, কেহ সুর তুলিয়াছে। কোন কোন আল্লাহ্‌র বান্দা এমনও আছে যে, সুর তুলিয়া আল্লাহ্‌র যেকেরই করিতেছে। এ সম্বন্ধে শরীঅতের দৃষ্টিতে কিছু আপত্তি থাকিলেও আমার উদ্দেশ্য তাহাদের রুচি বর্ণনা করা। যাহাহউক, যেকের না করিলেও তাহারা আজেবাজে কথাবার্তা এবং গীবত-শেকায়ত প্রভৃতি হইতে অবশ্যই রক্ষিত আছে।

কৃষকদের কার্যধারা এই যে, ভোর হইতেই কৃষিকার্যে লিপ্ত থাকে। দ্বিপ্রহরে বাড়ী হইতে খাবার আসিয়া পৌঁছিলে তাহা আহার করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে। অতঃপর পুনরায় কাজে লাগিয়া যায়। রাত্রে শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করে এবং নামায পড়িয়াই শয়ন করে। কোন বাজে আলাপে বা গীবত-শেকায়তে যোগদান করা হইতে রক্ষা পায়। কৃষকদের মধ্যে অহংকার এবং আত্মম্ভরিতা থাকে না। তাহাদের খুব অধিক দোষ থাকিলে এতটুকু হইতে পারে যে, নিজেদের

কাজে-কর্মে একটু শালীনতা বা বিচার-বুদ্ধি বিবর্জিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা শহুরেদের অশ্লীল আলোচনা, পরনিন্দা চর্চা প্রভৃতি জঘন্য পাপাচার অপেক্ষা হাজার গুণে ভাল। কিন্তু বিপদ এই যে, যাহারা এ সমস্ত নিন্দনীয় ও ঘৃণিত কার্য হইতে দূরে থাকে, তাহাদিগকে আজকাল পাগল বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু আসল ব্যাপার এইঃ

ما اگـر قلاش و گر دیـوانـه ایم ـ مست آں ساقی آں پیمـانـه ایم
اوست دیـوانـه که دیـوانه نه شد ـ مر عسش را دیـد و در خانه نه شد

"আমরা যদি মাতাল হই, কিংবা পাগল হই, তবে ঐ সাকী এবং ঐ পেয়ালার পাগল। বস্তুত যে ব্যক্তি পাগল হয় নাই সে-ই প্রকৃত পাগল।"....

নির্জনতা এবং উহার স্বরূপঃ নির্জনতা অর্থ মসজিদের নিভৃত কোণ নহে; বরং নিঃসঙ্গতা বা একাকিত্ব। উহা চাই গৃহেই হউক কিংবা জঙ্গলেই হউক। কেননা, যেকের- ফেকের বা তরীকতের শর্ত এই যে, নিজের অবস্থাকে বিশিষ্ট বা সম্মানিত পর্যায়ে রাখিও না। অথচ মসজিদের কোণ আজকাল বিশিষ্ট অবস্থার মধ্যে গণ্য হয়। নির্জনতা এমন হওয়া আবশ্যক যেন কেহ সন্ধানও না পায়। কেননা, সন্ধান পাইলে লোকে বিরক্ত করিয়া মারিবে। সুতরাং নির্জনবাসও কৌশলে করিবে। যেমন, কৃষিকার্যে লাগিয়া যান কিংবা অন্য কোন কাজে লাগিয়া থাকুন; কিন্তু সর্বপ্রকার মন্দ কার্য হইতে দূরে থাকুন। এই যুগে এই ধরনের নির্জনতাই উত্তম ব্যবস্থা।

মৌলবী যহীরউদ্দীন নামে একজন দরবেশ ছিলেন। তিনি আমার ফুফার ভাই। তিনি নির্জন-বাসের এক চমৎকার পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। জনসমাবেশের মধ্যে থাকিতেন, গৃহের দ্বার মুক্ত রাখিতেন, নফল নামায পড়িতে থাকিতেন, কেহ আসিলে সালাম ফিরাইয়া তাঁহার সহিত সুন্দর ব্যবহার করিতেন। হাল-অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেন। প্রয়োজনীয় কোন কথা থাকিলে তাহা শেষ করিয়া পুনরায় নামায আরম্ভ করিতেন। আবার সালাম ফিরাইয়া দুই এক কথা বলিয়া পুনরায় নামায আরম্ভ করিতেন। আমাদের মত কথা আরম্ভ করিলে কথার চরকা চলিতে থাকে এমন অবস্থা ছিল না। সাক্ষাৎকারী লোকেরা তাঁহাকে নীরস মনে করিয়া নিজেরাই তাঁহার নিকট যাতায়াত কমাইয়া দিত। কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগও করিত না যে, "বড়ই গর্বকারী এবং অহংকারী, কথাই বলেন না।" কেননা, তিনি নামাযেই থাকিতেন এবং নামাযে কেহ কথা বলে না। মানুষ ইহাই মনে করিত যে, মৌলবী ছাহেব অধিকাংশ সময় নামাযে থাকেন বলিয়াই অধিক কথা বলেন না। তিনি কখনও নির্জনে বসিতেন না, যাহাতে লোকে তাঁহাকে বিশিষ্ট লোক বলিয়া মনে করিতে পারে। তাঁহার নির্জনতার এই প্রণালী আমার খুবই ভাল লাগিয়াছিল। বাহিরে উহাকে নির্জনতা বলিয়া মনে হইত না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি নির্জন এবং নিঃসম্পর্ক ছিলেন।

কোন একজন বুযুর্গের অভ্যাস ছিল, রাত্রে কথা বলিতেন, দিনে বলিতেন না। কেননা, রাত্রে জনসমাবেশ কম হইত, কাজেই দূষণীয় কথাবার্তার সুযোগ হইত না। রাত্রেও তিনি এশার পূর্ব পর্যন্তই কথা বলিতেন। এশার নামায পড়িয়াই গৃহে যাইয়া শয়ন করিতেন। এই স্বল্পালাপের কারণে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইত না। আর এশার পরে এমনিই তো বিনা প্রয়োজনে কথাবার্তা বলা সুন্নতবিরোধী; কিন্তু আজকাল লোকে বুযুর্গগণকে এশার পরেও বিরক্ত করিয়া থাকে। তাঁহাদের দরবারে যাইয়া ভিড় করে। তাঁহারা ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলেন না বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহা-দের খুবই কষ্ট হয়। তথাপি মানুষ তাঁহাদিগকে বসিয়া থাকিতে বাধ্য করে। তাঁহাদিগকে বাধ্য

করিবার বা কষ্ট দিবার আপনাদের কি অধিকার আছে? তাঁহারা কত লোকের মন যোগাইবেন? আমার মতে এই শ্রেণীর লোকদিগকে বারণ করিয়া দেওয়া উচিত। কেহ তাহাতে নারায হইলে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন নাই।

মানুষের নহে, কেবল সৃষ্টিকর্তার সন্তোষের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেঃ শুধু এবিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, যেন খোদা ও রাসূল অসন্তুষ্ট না হন। সারাজগত বিগড়াইয়া যাউক, কোন পরোয়া নাই। মানুষকে কেহ সন্তুষ্ট করিতে পারেও না। আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখাই সমধিক কর্তব্য। وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ "আল্লাহ্ এবং রাসূলের সন্তুষ্টিকে অগ্রগণ্য রাখা অধিক কর্তব্য।" তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলেই তিনি মানুষের ঘাড়ে ধরিয়া তাহাদিগকে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট করিয়া দিবেন। কিন্তু সাবধান! আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার মধ্যে এরূপ নিয়ত কখনও পোষণ করিবেন না যে, তাঁহাকে রাযী করিতে পারিলে মানুষেরও সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারিব। মনে করুন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু মানুষ রাযী হইল না—তাহাতেই বা আপনার ক্ষতি কি? আল্লাহ্‌র সন্তোষকেই অগ্রগণ্য মনে করা কর্তব্য। মানুষ সন্তুষ্ট হউক বা না হউক তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। স্মরণ রাখিবেন, সন্তুষ্ট রাখার জন্য সকলের খোশামোদ-তোষামোদ করিলে নিজের ধর্ম বিনাশ করিয়া ফেলিবেন।

আমার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, মানুষের সহিত কঠোর ব্যবহার করুন; বরং যখনই মনে করিবেন যে, মানুষের সহিত মেলামেশা করিলে ধর্মভাবের ক্ষতি হইবে, তখন নম্রতার সহিত তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন যে, এই শ্রেণীর কথাবার্তা, আলাপ-ব্যবহারে ধর্মের ক্ষতি হয়। এই কারণে আমি দূরে সরিয়া থাকিতে ইচ্ছা করি। আপনার এই কথায় মানুষ অসন্তুষ্ট হইবে বটে, কিন্তু তাহাদের জন্য উপদেশ হইবে এবং ভবিষ্যতের জন্য তাহাদের সাহস কমিয়া যাইবে। পুনর্বার আপনার সম্মুখে কোন বাজে গল্প-গুজব উত্থাপনই করিতে সাহস পাইবে না। আজকাল বে-মুরুওত না হইলেও কিছুটা কঠোর আচরণ ছাড়া কাজ চলে না। আমি আপনাদিগকে অভদ্রোচিত আচরণ করিতে বলিতেছি না। কিন্তু মানুষের সঙ্গে শালীনতা রক্ষা করিতে যাইয়া যদি আপনি খোদার নাফরমানী করিলেন, তবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কি জবাব দিবেন? কেমন করিয়া মুখ দেখাইবেন?

বাজে বকিয়া সময় নষ্ট করাতে কি লাভ? সময়ের খুব সদ্ব্যবহার করা একান্ত কর্তব্য। উহার উত্তম উপায় এই যে, মেলামেশা কমাইয়া দিন। দোকানদারী প্রভৃতি সাংসারিক কাজকর্ম নির্জনতা বা নিঃসম্পর্কতার বিরোধী নহে। দোকানদারী শুধু এতটুকু কাজ—কেহ জিনিসের দর জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া দিন। যদি ক্রেতা বলে—'দিন,' বস্ সংক্ষেপে কাজ সমাধা হইয়া গেল। 'প্রয়োজন-ক্ষেত্রে শরীঅত কোন বাধা প্রদান করে নাই।'

অনুধাবন করুন, ফেরিওয়ালা তাহার জিনিস বিক্রয়ের জন্য যে ধ্বনি করিয়া বেড়ায়, "সোব্‌হা-নাল্লাহ্" বলিলে অন্তরে যতটুকু নূর উৎপন্ন হয়, সেই ধ্বনিতেও ততটুকু নূর উৎপন্ন হইবে। কেননা, ইহাও প্রয়োজনীয়।

মুসলমানের প্রত্যেকটি কাজই এবাদতঃ সৎ উদ্দেশ্যে মুসলমান যত কাজই করিয়া থাকে, সব কিছুই শরীঅত অনুযায়ী এবাদত বলিয়া গণ্য হয়। বাহিরে তাহা দুনিয়াবী কাজ বলিয়া অনুমিত হইলেও তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু যে কথায় ধর্মভাবের ক্ষতি হয়, তাহা একটিমাত্র কথা হউক না কেন, উহা হইতে অবশ্যই নিবৃত্ত থাকিবেন।

আমি বলি, যদি দুনিয়ার সহিত সম্পর্ক কম করার বরকত দেখিতে চান, তবে অন্তত দশ দিনের জন্য নিজের গৃহকর্মের ব্যবস্থা করিয়া নির্জনতা এবং নিঃসম্পর্কতা অবলম্বন করুন। দেখুন, ফল কি হয়। ইহাতে আপনি 'জুনাইদ বাগদাদী' হইতে পারিবেন না সত্য; কিন্তু আল্লাহ্ চাহে তো আপনার মধ্যে অনুভূতি উৎপন্ন হইবে। প্রথমে মন একটু বিচলিত হইবে বৈকি; কিন্তু পরিশেষে সবকিছুই সহজ হইয়া আসিবে। অতঃপর নিঃসম্পর্ক কাল যাপনের ফলে আপনি অনুভব করিতে পারিবেন যে, "অযথা মেলামেশা করিয়া যেই বৃথা গল্প-গুজবে সময় নষ্ট করিয়াছি, তাহা আমার হৃদয়কে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে।" ইতঃপর মরযীর খেলাফ সামান্য কিছু ঘটিতে দেখিলেই আপনার মনের অবস্থা এইরূপ হইবে

بر دل سالك هزاراں غم بود - گر زباغ دل خلائے كم بود

"হৃদয়োদ্যানের একটি অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিলে তরীকতপন্থীর অন্তরে সহস্র চিন্তা আসিয়া পড়ে।" অনুভূতি বিশুদ্ধ হওয়ার পর ইহার অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে সক্ষম হইবেন। এখন তো আমাদের অনুভূতিই শুদ্ধ নহে। অনুভূতি শুদ্ধ হওয়ার ফলে অবস্থা এই পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিবে যে, এক মিনিটের জন্যও হাল্কার বাহিরে আসিলে যদি একটিমাত্র অনর্থক বাজে কথাও অনিচ্ছা-ক্রমে মুখ হইতে নির্গত হয়, তবে নিজের শ্রমার্জিত সমস্ত কর্ম বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে। প্রত্যক্ষ গোনাহ্র কাজ হইয়া গেলে তো আর কথাই নাই।

বর্তমানে আমাদের অনুভূতির অবস্থা এই যে, সর্পদষ্ট ব্যক্তির মুখে যেমন নিমের পাতার স্বাদ মিষ্ট মনে হয়, তদ্রূপ আমাদের মুখেও হলাহলতুল্য পাপ কার্যসমূহ বড়ই সুস্বাদু মনে হয়। সুতরাং অতি সত্বর এই বিকৃত অনুভূতির চিকিৎসা করুন এবং এই উদ্দেশ্যে কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অনুসন্ধান করুন। চিকিৎসকের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত এক বড় চিকিৎসা এই,যাহা আমি পূর্বে বলিয়াছি;—চিন্তা করিতে আরম্ভ করুন। পরলোকের যাবতীয় বিষয়ে চিন্তা করুন—"আমার মৃত্যু ঘটিলে কবরে যাইতে হইবে। প্রশ্নকারী ফেরেশ্তাদিগকে সঠিক উত্তর প্রদান করিতে পারিলে শান্তি পাইব, অন্যথায় শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। অতঃপর আমাকে পুনরায় জীবিত করা হইবে। এইরূপে হাশরের ময়দানের যাবতীয় বিপদ ও দুঃখ-কষ্টের কথাও চিন্তা করুন— আল্লাহ্ পাকের সম্মুখে দাঁড় করান হইবে, অতঃপর পুলসেরাত অতিক্রম করিতে হইবে। ইহার পরে হয়তো বেহেশ্তে প্রবেশ করিব, নচেৎ দোযখে নিক্ষিপ্ত হইব। দোযখে সহায়-সহানুভূতি কিছুই থাকিবে না। মোটকথা, পরলোকের আদ্যন্ত চিন্তা করিতে থাকুন।

আমলের উপযোগী একটি কথা ঃ ইহার সঙ্গে সঙ্গে কোন কামেল বুযুর্গের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করুন। সম্ভব হইলে তাঁহার সংসর্গে বসুন। সংসর্গের যাবতীয় হক্ আদায় করিতে পারিবেন না মনে হইলে দূরে থাকিয়া চিঠিপত্রের সাহায্যে তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী নিজের আমলের হেফাযত করুন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তত্ত্বাবধান রাখুন। রসনা কিরূপ কথাবার্তায় লিপ্ত আছে? কর্ণ কিরূপ কাজে মগ্ন রহিয়াছে? মোটকথা, শরীরের সমস্ত অঙ্গগুলির কোন্টি কিরূপ কাজে লিপ্ত আছে উত্তমরূপে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখুন এবং যথাকর্তব্য উহাদিগকে সংযত রাখিতে চেষ্টা করুন। নিজের অবস্থা সম্বন্ধে পীরকে সর্বদা অবহিত করিতে থাকুন এবং সংশোধনের জন্য তিনি যাহাকিছু নির্দেশ প্রদান করেন যথারীতি পালন করুন। কেননা, আভ্যন্তরীণ যাবতীয় রোগের ধরন-করণ সম্বন্ধে তিনি খুবই অভিজ্ঞ। কামেল পীর আত্মিক রোগসমূহের চিকিৎসক হিসাবে বিজ্ঞ এবং জ্ঞানী। এই রোগসমূহের

চিকিৎসা তিনি ভালরূপে জানেন। ফলকথা, আমাদের অভ্যন্তরস্থ ব্যাধি এই যে, আমরা পরলোক হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া দুনিয়াতেই তৃপ্ত এবং সন্তুষ্ট রহিয়াছি।

দুনিয়া লইয়া তৃপ্ত ও স্থির চিত্ত থাকা একটি ক্ষুদ্র ব্যাপার, কিন্তু সর্ববিধ রোগের মূল। ইহার চিকিৎসা হইয়া গেলে অপর সমস্ত রোগেরই চিকিৎসা হইয়া যাইবে। আখেরাতের জন্য মন অস্থির না হইয়া দুনিয়ার প্রতি সন্তুষ্ট এবং স্থির চিত্ত থাকাই যখন সমস্ত রোগের মূল, তখন সর্বপ্রথম এই তৃপ্তি ও স্থির চিত্ততাকে অন্তর হইতে বাহির করিয়া ফেলুন এবং খোদার এবাদত নিজের জন্য কর্তব্য করিয়া লউন। প্রথমতঃ নিজের নফ্‌সের উপর এবিষয়ে বল প্রয়োগ করিতে হইবে বৈকি? আল্লাহ্‌র এবাদতের বিশেষ ফল এই যে, উহাতে অন্তরে চিন্তার উদ্ভব হইয়া থাকে। চিন্তা উৎপন্ন হইলে অন্য সমস্ত কাজ আপনাআপনি ঠিক হইয়া যাইবে। আরও একটি বিষয় নিজের জন্য অবশ্য করণীয় করিয়া লউন। মনে যাহা চায় তৎক্ষণাৎ তাহা করিবেন না; বরং প্রথমে আলেমদের নিকট হইতে উহার বিধান জানিয়া লউন। তাঁহারা 'না-জায়েয' বলিলে সে কাজ কখনও করিবেন না। নিজকে সর্বদা ওলামায়ে কেরামের মুখাপেক্ষী মনে করুন। আলেমদের সম্মান করুন। নিজের কার্যধারা এইরূপ করিয়া লইলে অন্তর পুনরায় কখনও দুনিয়ার প্রতি তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হইবে না।

আর ইহাও স্মরণ রাখিবেন যে, নিজে আলোড়ন সৃষ্টি না করিলে কখনও আপনাআপনি জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। নিজে মনোযোগ প্রদান না করিয়া কেবল তাওয়াক্কুলের উপর বসিয়া থাকিলে কোন লাভ হইবে না। আপনি ইচ্ছাশক্তিতে আলোড়ন সৃষ্টি করিলে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতেও অনুগ্রহ দৃষ্টি অর্পিত হইবে। যেমন, হযরত ইউসুফ (আঃ) জোলায়খার কুঠি হইতে পলায়নের ইচ্ছা করিতেই উহার কোঠাগুলির তালাসমূহ আপনাআপনি খুলিয়া গেল। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহপ্রার্থী হওয়ার জন্য স্বভাবত ইচ্ছা করা শর্ত। আমাদের অবস্থা এই যে, আমরা 'আহাদী' অর্থাৎ, খোদাগত প্রাণ হইয়া পড়িয়াছি। কোন প্রকারের গতিশীলতাই আমাদের নাই। কোন প্রকার আলোড়নই নাই।

এখন আমি বক্তব্য সমাপ্ত করিতেছি। পুনরায় বলিতেছি, আপনাদের সারাজীবনের জন্য ব্যবস্থাপত্র হইল চিন্তা করা। ইহাতে কখনও গাফলতি করা চলিবে না। তাহাতেই অপর সমস্ত কাজের ত্রুটি সংশোধিত হইয়া যাইবে। আমি চিকিৎসার সহজ ও সংক্ষিপ্ত উপায় বলিয়া দিলাম। কেহ যদি তদনুযায়ী আমল না করেন, তবে উহার কি চিকিৎসা আছে? বর্তমানে ইহা অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় কোন বিষয়বস্তু স্মরণপটে উপস্থিত নাই। অবশ্য যাহাকিছু বর্ণনা করিয়াছি, তাহাতে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। কিন্তু যতটুকু বলিয়াছি তদনুযায়ী আমল করিতে থাকিলে বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিজেরাই চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিবেন। যতটুকু বলিয়াছি তদনুযায়ী আমল আরম্ভ করিয়া দিন। এখন এই দো'আ করিতেছি—আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে আমলের তাওফীক্ দান করুন।

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَآ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

■

'উজ্‌ড়াড়াহ্' জেলাঃ মীরাঠ

১৩২৬ হিজ্‌রী, ১৪ই রজব

মাতাউদ্‌দুনিয়া

[পার্থিব-উপকরণ বা উপভোগ্য বস্তু]

■

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ـ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَالَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ط اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ط فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ○

ভূমিকা

উদ্দিষ্ট বিষয়বস্তুর নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয়তা ঃ এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাগণকে ধর্মের এক বিশেষ কাজে গাফলতির জন্য তিরস্কার করিতেছেন। কিন্তু এখন সেই বিশেষ কাজের বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নহে; বরং এই তিরস্কারের ভিত্তি ও কারণ হিসাবে যে কথাটি উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা اَرَضِيْتُمْ শব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাই বর্ণনার উদ্দেশ্য। কারণটি ব্যাপক বলিয়া আলোচ্য বিষয়ও ব্যাপক হইবে। অর্থাৎ, ইহাতে ধর্মীয় প্রত্যেক কাজের ত্রুটিই বর্ণিত হইয়াছে। তোমরা যে ধর্ম-কর্মে গাফলতি করিতেছ, তোমরা কি দুনিয়ার জীবনেই সন্তুষ্ট এবং তৃপ্ত হইয়া গেলে? এই গাফলতি যে তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করিল, তবে কি তোমরা পরলোক সম্বন্ধে চিন্তা কর না এবং উহার প্রয়োজন বোধ কর না? অতঃপর বলিতেছেন, "পরলোকের তুলনায় দুনিয়াবী জীবনের উপকরণ বা উপভোগ্য বস্তুসমূহ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর; বরং কিছুই নহে, এতদ্‌সত্ত্বেও তোমরা পরলোকের খেয়াল ত্যাগ করিয়া দুনিয়া লইয়া সন্তুষ্ট রহিয়াছ?" অর্থাৎ, উহার প্রতি এত গভীর অনুরাগ পোষণ করিতেছ যে, একেবারে উহাকে নিজের স্থায়ী নিবাসরূপে গ্রহণ করিয়াছ এবং এই কারণেই এই ধর্মীয় কাজে ঘাবড়াইয়া যাও। পক্ষান্তরে দুনিয়া এমন লোভনীয় কিছু নহে যে, মানুষ তথাকার জীবনের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে। ইহাই তিরস্কারের কারণের বিষয়বস্তু এবং ইহা বর্ণনা করাই অদ্যকার ওয়াযের উদ্দেশ্য। আয়াতের তরজমা হইতে আপনারা ইহার সারমর্ম

উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। খোদা তা'আলা এস্থলে ঐসমস্ত লোককেই তিরস্কার করিতেছেন, যাহারা দুনিয়া লইয়া তৃপ্ত এবং স্থিরচিত্ত হইয়া রহিয়াছে এবং আখেরাতকে ভুলিয়া দুনিয়াকে প্রিয় মনে করিতেছে। মুসলমান সম্প্রদায়ে এমন কেহ নাই, যাহার বিশ্বাস ঃ "আখেরাত কিছুই নহে।"

মুসলমানের আচরণ অবিশ্বাসীর ন্যায় ঃ কিন্তু তাহাদের আচার-ব্যবহার দেখিলে মনে হয়, তাহারা যেন পরলোকে বিশ্বাসী নহে। কেননা, তাহাদের মধ্যে সংসারানুরাগ যতটুকু দেখা যায়, আখেরাতের প্রতি ততটুকু অনুরাগ এবং আগ্রহ দৃষ্ট হয় না। আমাদের হৃদয়-কন্দরে অনুসন্ধান চালাইলে দেখা যাইবে, ইহলোকের জীবনের জন্য আমরা কত রং-বেরং-এর কল্পনা রচনা করি-তেছি আমরা এইরূপে অবস্থান করিব, এইরূপে বসতি করিব, অমুক জায়গায় বিবাহ করিব, অমুক সম্পত্তি খরিদ করিব, এই উপায়ে চাকুরীতে ডিপুটি কালেক্টর হইব ইত্যাদি। এখন ন্যায় দৃষ্টিতে বিচার করিয়া দেখুন, কোন সময় পরলোক সম্বন্ধেও এরূপ আশা এবং কল্পনা করা হইয়াছে কিনা —আমাদিগকে অবশ্যই একদিন মরিতে হইবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে হিসাব-নিকাশের জন্য দাঁড়াইতে হইবে। পরলোকে সুরম্য বেহেশ্‌ত আছে, মনোরম বাগান এবং সুদৃশ্য অট্টালিকা আছে, তাহাতে অপূর্ব সুন্দরী হূরগণ রহিয়াছেন ইত্যাদি। খুব সম্ভব, এরূপ আশা হৃদয়ে কখনও উদিত হয় না; বরং ইহার কল্পনা মনে খুব কমই উদিত হয়। ফলকথা, দুনিয়ার প্রতি যত অনুরাগ এবং আসক্তি হৃদয়ে বিদ্যমান, পরলোকের প্রতি তত অনুরাগও নাই, তত আগ্রহও নাই। কেননা, যদি থাকিত, তবে যেরূপ ইহলোকে অবস্থান সম্বন্ধে যত রকমের আশা ও কল্পনা মনে উদিত হয়, পরলোকের জন্য তদ্রূপ আশা এবং কল্পনা মনে উৎপন্ন হইত।

আর পার্থিব কাজকর্মের জন্য যত চিন্তা-ভাবনা করিয়া থাকে এবং ইহলোকের আমোদ-আহ্লাদে যেরূপ নিমজ্জিত হইয়া থাকে, পারলৌকিক বিষয়ের জন্যও কিছু না কিছু অবশ্যই হইত। আমাদের মধ্যে কতক লোক তো এমন আছে যে, দুনিয়ার আমোদে মত্ত থাকে, অথচ স্বপ্নেও আখেরাতের কথা কল্পনা করে না। আর কতক লোক এমন আছে যে, তাহাদের নিকট দুনিয়ার আমোদ- আহ্লাদের কোন উপকরণ নাই এবং এই কারণে তাহারা সর্বদা চিন্তিত ও বিষণ্ণ থাকে, আমোদ-আহ্লাদ তাহাদের ভাগ্যে কখনও হয় না। আমার কথার উত্তরে তাহারা হয়তো বলিবেন, "আমরা তো কখনও দুনিয়ার আমোদ উপভোগ করিতে পারি না। আমরা তো কেবল ইহাই চিন্তা করিয়া থাকি, আমাদের কোন ওলী-ওয়ারিস নাই। আমাদের জীবনযাত্রা কেমন করিয়া নির্বাহ হইবে। আমি তাহাদের কথার প্রতি-উত্তরে বলিব, তোমরা তোমাদের ইহজীবনের নিঃসহায়তা এবং নিঃসঙ্গতার বিষয় যেমন করিয়া চিন্তা করিয়া থাক, আখেরাতের বিষয়ও কোনদিন তেমন করিয়া চিন্তা করিয়াছ কিনা এবং তথাকার ভীষণ বিপদের কথা কল্পনা করিয়াছ কিনা যে, তথাকার জীবন কেমন করিয়া অতিবাহিত হইবে? দোযখে যাইতে হইবে, তখন উহার যন্ত্রণাময় শাস্তি কিরূপে বরদাশ্‌ত করা যাইবে? ইহলোকের কোন বিপদ বা দুঃখ-কষ্টের কথা চিন্তা করিয়া যেমন উহা লাঘব করার উপায়ও চিন্তা করিয়া থাক যে, সম্ভবত অমুক উপায় অবলম্বন করিলে এই বিপদ কাটিয়া যাইবে। কিংবা অমুক তদবীর করিলে এই বিপদ সহজসাধ্য হইয়া যাইবে। এইরূপে কখনও আখেরাতের বিপদসমূহের কথাও চিন্তা করিয়াছ কি?

অথচ পার্থিব বিপদসমূহের মধ্যে কতক এমনও আছে, যাহা লাঘবের কোন উপায় নাই। অতএব, সে সম্বন্ধে চিন্তা করাও নিষ্ফল। তথাপি তোমরা তাহা লইয়া চিন্তা-ভাবনা করিয়া থাক।

পক্ষান্তরে আখেরাতের কোন বিপদই উপায়বিহীন নহে; বরং আখেরাতের প্রত্যেক বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় রহিয়াছে। তথাপি উহার কথা স্মরণও কর না, চিন্তাও কর না।

আখেরাত সংশোধনে তদবীরের প্রয়োজনীয়তাঃ যদিও কেহ কেহ এমন আছেন যে, আলোচনাস্বরূপ কখনও কখনও আখেরাতের কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন এবং তাহাতে মনে করেন যে, ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা আছে; কিন্তু ইহাতে কোন ফলোদয় হইবে না।

দেখুন, কাহারও নিকট আটা, তাওয়া এবং খড়ি সবকিছুই আছে, অথচ রুটি প্রস্তুত করে না। কিন্তু এ সমস্ত সরঞ্জাম সম্বন্ধে খুব আলোচনা করে এবং চিন্তা করিতে থাকে। বলুন তো, তাহার এই আলোচনা এবং চিন্তার কি ফল হইবে? প্রকৃত উপায় এই যে, সাহস করিয়া উঠুক এবং রুটি প্রস্তুত করুক। যখন ক্ষুধা বোধ করিবে তৃপ্তির সহিত ভক্ষণ করিবে। আখেরাতের চিন্তাও ঠিক এইরূপই বটে। মনে করিবে যে, আমাকে মরিতে হইবে, আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে, এমন এমন আযাব হইবে। এতটুকু চিন্তার পরেই আযাব হইতে রক্ষা ও পরিত্রাণ পাওয়ার তদবীর আরম্ভ করিয়া দিবে। কিন্তু শয়তান অনেক লোককে ধোঁকায় ফেলিয়া রাখিয়াছে এবং তাহাদের মনে জাগাইয়াছে যে, যখন সময় সময় তোমাদের মনে এরূপ কল্পনা উদয় হয়, তখন তোমাদের মনে ধর্ম ও পরকাল সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তা আছে।

বন্ধুগণ! তোমাদের নিকট তদবীরের উপকরণ না থাকিলে এতটুকু চিন্তাই যথেষ্ট ছিল। খোদা তোমাদিগকে ইচ্ছা-শক্তি প্রদান করিয়াছেন, সাহস দান করিয়াছেন, ভালমন্দ তারতম্য করার বিচার ক্ষমতা দিয়াছেন। অতএব, ইহার কারণ কি যে, দুনিয়ার ব্যাপারে কেবল চিন্তা করিয়াই ক্ষান্ত হও না; বরং তদবীরেরও প্রয়োজন হয়। আর আখেরাতের বেলায় কেবল মনে চিন্তা থাকাই যথেষ্ট মনে করা হয়। অতএব, বুঝা যায়, কেবল কথার ছড়াছড়ি, প্রকৃতপক্ষে মনে আখেরাতের চিন্তাই নাই।

আখেরাতের প্রতি সমধিক গুরুত্বদান আবশ্যকঃ যাহাহউক, যদি কেহ ইহলোকে আমোদ-আহ্লাদ করে, তবে তাহার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ এই যে, আখেরাতের আমোদ করে না কেন? আবার যদি কেহ দুনিয়ার চিন্তায় বিষণ্ণ থাকে, তবে আমি তাহাকে বলিব, "পরলোকের বিপদ ভাবিয়া চিন্তিত হও না কেন?" যদি দুনিয়ার আমোদ-আহ্লাদকারী কোন ব্যক্তি বলে, আখেরাতের জন্য আমোদ-আহ্লাদ কোথা হইতে করিব? ইহার আশাই বা আমাদের কোথায়? আমরা তো পাপী। পক্ষান্তরে দুনিয়ার আমোদ নগদ এবং সম্মুখে উপস্থিত। ইহা উপভোগ করিব না কেন? আমি বলিব, ইহা শয়তানের ধোঁকা। তাহাদের এই উক্তিটি দুইটি দাবী সম্বলিত এবং উভয় দাবীই ভুল। প্রথম দাবী—দুনিয়ার খুশী নগদ। দ্বিতীয় দাবী—আখেরাতে আনন্দ কোথায়? প্রথম দাবী ভুল হওয়ার কারণ এই যে, দেখুন, আপনারা বলিয়া থাকেন, আমার পুত্র-সন্তান হইবে। এইরূপে খুশী ও আমোদ উপভোগ করিব। এস্থলে যে কাল্পনিক সম্ভাবনার উপর আপনারা আমোদ বা খুশী উপভোগ করিয়া থাকেন—তাহাতে আপনাদের ক্ষমতা বা অধিকার কোথায়? সহস্র সহস্র মানুষ এমন রহিয়াছে, যাহারা ভাবে এক হয় আর। যদিও কদাচ কোন ক্ষেত্রে কাল্পনিক খুশী কার্যকরী হইয়াও যায়, তথাপি অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, আকাঙ্ক্ষার সংখ্যা সর্বদাই ইহার সফলতা অপেক্ষা বহুগুণে অধিক হইয়া থাকে। অর্থাৎ, আকাঙ্ক্ষা হয় অনেক, পূর্ণ হয় কম। সুতরাং যাহার আকাঙ্ক্ষা যতই অধিক হইবে, সে সর্বদা চিন্তা ও দুঃখে তত অধিক নিমজ্জিত থাকিবে।

আল্লাহ্ওয়ালাগণ অবশ্য সকল অবস্থাতেই খুশী থাকেন। কেননা, তাঁহারা দুনিয়ার কোন আকাঙ্ক্ষাই করেন না। সন্তান জন্মিলেও খুশী, না জন্মিলেও খুশী, সর্বদাই সন্তুষ্ট থাকেন। দুনিয়া-দারদের খুশী কোথায়? আল্লাহ্র কসম, শান্তি যাহাকে বলে, যদি তাহাই হাসিল না হয়, তবে ইহার উপকরণ যতই বেশী হইবে, অশান্তি ও দুঃখের কারণ ততই অধিক হইবে।

মানুষ টাকা-পয়সাকে শান্তির উপকরণ মনে করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাহা ঠিক নহে। অন্যথায় সিন্দুকও ইহার স্বাদ উপভোগ করিত। কিন্তু ইহারা সিন্দুকের চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট। কেননা, সিন্দুকের তো দুঃখ-কষ্টের যন্ত্রণানুভূতি নাই। অথচ ইহারা যন্ত্রণার মধ্যে লিপ্তই রহিয়াছে। অতএব, বুঝা যায়—দুনিয়াদার অতি অল্প সুখ-শান্তিই উপভোগ করিয়া থাকে। ফলকথা, ইহলোকে কোথাও আনন্দ নাই। দ্বিতীয় দাবী—আখেরাতে খুশী কোথায়? ইহা এই কারণে ভুল যে, আল্লাহ্ পাকের নিকট হইতে উহার প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর উহা সম্পূর্ণ তোমাদের আয়ত্তে রহিয়াছে।

যেমন দেখুন, দুনিয়ার আনন্দ কোন কোন সময় হাসিলও হয় না। এমনও হয় যে, সারাজীবন ব্যাপিয়া আকাঙ্ক্ষা করিলেন কিন্তু পূর্ণ হইল না। তখন আর আনন্দের সুযোগ কোথায়? অথচ পরলোকের কোন আনন্দই এমন নহে যে, উহা ইচ্ছাধীন নহে। ইহা আল্লাহ্ তা'আলার অসীম অনুগ্রহ যে, পরলোকের আকাঙ্ক্ষা যতই উচ্চ হউক না কেন, নুবুওয়তের আকাঙ্ক্ষা ছাড়া নিয়ম পালন করিলে অবশ্যই পূর্ণ হইয়া যায়। যেমন, কোন নিকৃষ্ট স্তরের পাপী যদি হযরত জুনাইদ রাহেমাহুল্লাহ্র মত উচ্চস্তরের ছালেহীনের পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে, তবে সে অবশ্যই নিজের আমলকে উন্নত করিলেই সে পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে।

অতএব, দেখুন, পরলোকে কেবল আনন্দই আনন্দ। তাহা সম্পূর্ণরূপে নিজের ইচ্ছাধীন, তবে ইহারই চিন্তা করুন ও অন্তরে ইহার জন্য আকাঙ্ক্ষা উৎপাদন করুন এবং ইহার উপায় অবলম্বন করুন। অর্থাৎ, গোনাহ্র কাজ ত্যাগ করুন, নামায পড়ুন, যে নামায এ পর্যন্ত পড়া হয় নাই উহার ক্বাযা আদায় করুন। যাকাত আদায় করুন। অতঃপর সমস্ত আনন্দ আপনারই জন্য। তখন আপনার পূর্ণ আমোদ ও আনন্দ করার অধিকার হইবে।

এইরূপে যদি কোন বিপন্ন ব্যক্তি মনে করে যে, ইহলোকের বিপদ উপস্থিত। কাজেই ইহার প্রতিকারের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করিতেছি। আর আখেরাতের বিপদের জন্য আল্লাহ্ ক্ষমাকারী ও দয়ালু আছেন; কাজেই চিন্তা কিসের? স্মরণ রাখুন, ইহাও শয়তানের ধোঁকা। ক্ষমাকারী ও দয়ালু আল্লাহ্ এরূপ প্রতিশ্রুতি কোথায় দিয়াছেন যে, তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা করিলেও আমি তোমাকে শাস্তি প্রদান ব্যতীত প্রথমবারেই বেহেশ্তে দাখিল করিব? ফলকথা, পরলোকের নেয়ামতের কথাও কেহ চিন্তা করে না, তথাকার বিপদ এবং শাস্তির কথাও না। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায়—মানুষ দুনিয়াকে চিরস্থায়ী বাসগৃহ করিয়া লইয়াছে।

হে মুসলমান! তোমাদের প্রকৃত বসতবাড়ী পরলোকে। কিন্তু তোমরা দুনিয়াকে নিজের বাসস্থান করিয়া লইয়াছ এবং নিজের জন্য ও নিজের আত্মীয়-স্বজনের জন্য কেবল দুনিয়া কামনা করিতেছ। আমার বংশগত আত্মীয় এক মহিলা একবার আমার জন্য দো'আ করিলেনঃ আল্লাহ্ ইহাকেও দুনিয়ার সাথী বা শরীক দান করুন। কত নিকৃষ্ট ধরনের দো'আ করিলেন! ইহার সারমর্ম এই হয় যে, এখন তো সে কেবল ধর্মই ধর্ম লইয়া ব্যস্ত। দুনিয়ার কোন আকর্ষণ নাই, আল্লাহ্ তা'আলা করুন, সে যেন দুনিয়ার মধ্যে জড়াইয়া পড়ে। ইহাতে বুঝা যায়—তাঁহার দৃষ্টিতে দুনিয়াই শ্রেষ্ঠ বস্তু ছিল। এই কারণে তিনি কামনা করিয়াছিলেন—আমার স্নেহভাজনও ইহাতে জড়িত

হউক। إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ কি সর্বনাশের কথা! এতদ্‌সঙ্গে ইহাও বুঝিতে চেষ্টা করুন যে, দুনিয়াকে তাহারা স্থায়ী বাসস্থান বলিয়া মনে করে। যদি তাহা মনে না করিত, তবে দুনিয়ার জন্য কোন চিন্তাই হইত না।

দুনিয়া ও আখেরাতঃ দেখুন, সফরে গমন করিয়া যদি কোন মুসাফিরখানায় অবস্থান করিতে হয়, তবে তথাকার চৌকিতে কেমন ছারপোকা দেখা যায়। কোন সময় চৌকিগুলি ভাঙ্গাচুরাও থাকে। তখন মুসাফির মনে করে—একটি রাত্রিই তো এখানে যাপন করিতে হইবে। যেমন তেমন করিয়া কাটিবেই, এক রাত্রের কষ্টে কি আসে যায়? পরের দিনই তো ঘরে পৌঁছিয়া যাইতেছি। মোটকথা, মুসাফিরখানার কষ্টকে এই জন্য কষ্ট মনে করা হয় না যে, উহাকে স্থায়ী বাসস্থান মনে করা হয় না। দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টের অবস্থাও তদ্রূপ। আপনি যদি দুনিয়াকে স্থায়ী বাসস্থান মনে না করিতেন, তবে দুনিয়ার সঙ্গে মুসাফিরখানার ন্যায়ই ব্যবহার করিতেন। সদাসর্বদা কেবল দুনিয়ার আলোচনাই করিতেন না। দুনিয়ার এত জেরও টানিতেন না; বরং প্রত্যেক বিষয়ে আপনার মুখে এই রব থাকিত—"আমাদের বাসস্থান পরলোক।" এখানে অল্প দিনের কষ্টে কি আসে যায়। পরলোকে নিজের আসল বাসস্থানে প্রত্যাবর্তন করিয়া আরাম করিব। অথচ আমরা কখনও এরূপ কল্পনাও করি না। বিশেষ করিয়া মেয়েরা যদি কোন চিন্তায় পতিত হয়, তবে তাহাদের অবস্থা এরূপ হয়, যেন আল্লাহ্ তা'আলা কখনও তাহাদিগকে কোন নেয়ামত বা সুখ-শান্তি প্রদান করেন নাই। তখন এই দুঃখ-কষ্টের আলোচনা ব্যতীত অন্য কোন কাজই থাকে না। মনে হয়, যেন ইহাই তাহাদের দ্বীন এবং দুনিয়া। পুরুষেরাও অল্প-বিস্তর এরূপ অবস্থায় লিপ্ত। কেননা, বিপদকালে তাহাদের মধ্যে অনেকেরই আখেরাতের কথা স্মরণ থাকে না। যদি তাহা স্মরণ থাকিত, তবে দুনিয়ার কোন বিপদই মুসাফিরখানার দুই দিনের কষ্ট অপেক্ষা তাহাদিগকে অধিক বিচলিত করিতে পারিত না এবং বিপদ যতই সাংঘাতিক হউক না কেন, নিজের প্রকৃত বাসস্থান পরলোকের শান্তির কথা স্মরণ করিয়াই শান্ত হইয়া যাইত। যেমন, তাহার পরম স্নেহের কোন সন্তানের বিয়োগ ঘটিলেও সে অস্থির হইত না।

মনে করুন, কোন ব্যক্তি সপুত্রক সফর করিতেছিল। হঠাৎ পথিমধ্যে পুত্রটি নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। অনন্তর মুসাফির ব্যক্তি অনুসন্ধানে জানিত পারিল যে, তাহার ছেলে স্থায়ী বাসস্থানে চলিয়া গিয়াছে, আমিও তথায় যাইতেছি। এমতাবস্থায় সে কি পুত্রের জন্য কান্নাকাটি করিবে? কখনও করিবে না; বরং এই সংবাদ শুনামাত্র তাহার মন শান্ত হইবে এবং মনে করিবে, কিছুদিনের মধ্যেই বাড়ী ফিরিয়া ছেলের সহিত মিলিত হইব। অতএব, আমরা যদি পরলোককে আমাদের আসল বাসস্থান মনে করিতাম, তবে সন্তানের বিয়োগে এত হা-হুতাশ করিতাম না। তবে হাঁ! বিচ্ছেদের জন্য কিছু শোক হয় বৈকি, তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই, মামুলি শোক করার অনুমতি আছে। কিন্তু যেমন বিচ্ছেদে দুঃখ হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই ভাবিয়া সান্ত্বনাও গ্রহণ করা উচিত যে, সে তাহার শান্তি-নিকেতনে চলিয়া গিয়াছে। নিজের প্রকৃত বাসস্থানে গিয়া পৌঁছিয়াছে, আমাদেরও তথায় যাইতে হইবে। সেখানে তাহার সহিত মিলিত হইব। এই বিষয়টিই আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের আর একটি বাক্যে বলিয়া দিয়াছেনঃ إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ইহার সারমর্ম এই যে, যে বস্তু চলিয়া গিয়াছে উহা খোদার সমীপেই গিয়াছে। আমরাও তাঁহার দরবারে যাইয়া পৌঁছিব এবং সকলে তথায় যাইয়া একত্রিত হইব। যদি আখেরাতকে নিজের ঘর মনে করিত,

তবে এরূপ ভাবিয়া সান্ত্বনা গ্রহণ করিত। সন্তান বিয়োগে কখনও ধৈর্যহারা হইয়া পড়িত না। কিন্তু আজকাল তো আপদে-বিপদে বা আত্মীয়-স্বজনের বিয়োগে এমন কান্নাকাটি ও বিলাপ আরম্ভ হইয়া যায়, যেন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের বাস্তুভিটা কাড়িয়া লইয়াছেন। ফলকথা, আপদে-বিপদে এবং শোকে-দুঃখে আমাদের অবস্থা ঠিক সেইরূপ হওয়া উচিত, যেমন পার্থিব দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যখন তদ্রূপ হয় না, কাজেই বুঝিতে হইবে যে, সন্তান বিয়োগে এমন ধৈর্যহারা শোক দুনিয়াকে আমরা নিজের স্থায়ী বাসস্থান মনে করি বলিয়াই হইয়া থাকে।

দুনিয়াদার লোকের মৃত্যু-ভয়ঃ সুতরাং আমাদের প্রধান ভুল এই যে, আমরা দুনিয়াকে নিজের স্থায়ী বাসস্থানরূপে মনে করিয়া রাখিয়াছি। এই কারণেই ইহা ত্যাগ করিয়া যাইতে দুঃখ ও চিন্তা হয়। অন্যথায় মানুষ যখন সফরে থাকে, তখন যতই সে বাড়ীর নিকটবর্তী হইতে থাকে ততই তাহার মন আনন্দে নাচিতে থাকে। পক্ষান্তরে আমাদের অবস্থা এই যে, যতই মৃত্যুর দিন ঘনাইয়া আসে, ততই প্রাণ মুসড়াইয়া পড়িতে থাকে। এই অবস্থা অবশ্য দুনিয়াদারদেরই হইয়া থাকে। কেননা, তাহারাই দুনিয়াকে নিজের বাসস্থান মনে করে। পক্ষান্তরে আল্লাহওয়ালাগণ মৃত্যুর জন্য একটুও চিন্তিত হন না, তাঁহারা নিজেদের মৃত্যুর জন্যও বিন্দুমাত্র পরোয়া করেন না, সন্তানের মৃত্যুর জন্যও তাঁহাদের কোন পরোয়া নাই। এমন কি, কোন কোন সময় মূর্খ লোকেরা তাঁহাদিগকে নিষ্ঠুর বলিয়া সন্দেহ করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা নিষ্ঠুর নহেন। বাস্তবিকপক্ষে তাঁহাদের চেয়ে অধিক কোমলপ্রাণ কেহই নহে। সন্তানের মৃত্যুর বা নিজের মৃত্যুর জন্য তাঁহাদের অস্থির বা বিচলিত না হওয়ার কারণ শুধু এই যে, তাঁহারা আখেরাতকে নিজের প্রকৃত বাসস্থান মনে করিয়া থাকেন। এই কারণেই সন্তান বিয়োগে তাঁহারা ততটুকুই চিন্তিত হন—সপুত্রক সফরকারী পিতার পুত্র মুসাফিরখানা হইতে বাড়ী চলিয়া গেলে যতটুকু চিন্তিত হইয়া থাকে। বলাবাহুল্য, এরূপ পুত্রের সাময়িক বিচ্ছেদের জন্য পিতা সামান্য অস্থিরতা অনুভব করেন মাত্র, ইহা অপেক্ষা অধিক নহে। কেননা, তাঁহারা আখেরাতকেই নিজের প্রকৃত বাসস্থান মনে করেন। এই কারণেই তাঁহারা মৃত্যুর নিকটবর্তী হইলে আনন্দিত হন। যেমন, মুসাফিরের অভ্যাস—স্থায়ী বাসস্থানের নিকটবর্তী হইলে প্রফুল্ল ও আনন্দিত হইয়া থাকে। কোন কবি এ সময়ের আনন্দকে নিজের কবিতায় প্রকাশ করিতেছেনঃ

خرم آں روز که زیں منزل ویراں بروم ـ راحت جانِ طلبم وزپے جاناں بروم
نذر کردم که گر آید بسر ایں غم روزے ـ تا در میکده شاداں و غزل خواں بروم

"সেদিন কতই না আনন্দের হইবে যেদিন এই ক্ষণস্থায়ী বাসস্থান দুনিয়া পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়ালয়ের পথে যাত্রা করিব এবং প্রিয়জনের অন্বেষণ করিব। আমি মানত করিয়াছি যে, যেদিন এই দূরত্বের চিন্তার অবসান হইবে সেদিন আমি আনন্দ করিতে করিতে এবং মিলন সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে শরাবখানার দ্বার পর্যন্ত যাইয়া পৌঁছিব।"

এক ব্যক্তি হযরত মাওলানা মুযাফ্ফার হুছাইন কান্ধলবীকে (রঃ) বলিল, হযরত! আপনি এখন বেশ বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। তিনি স্বীয় পাকা দাড়ির উপর হাত ফিরাইয়া বলিলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه এখন সময় নিকটবর্তী হইয়াছে। এই ঘটনা হইতে কেহ মনে করিবেন না যে, তিনি নিজের আমলের প্রতি কিংবা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মকবুল হওয়ার উপর গর্ববোধ করেন; সুতরাং শাস্তি না হওয়ার সম্ভাবনায় উৎফুল্ল ও আনন্দিত থাকেন। اَسْتَغْفِرُ اللّٰه গর্ব করার ক্ষমতা কাহার

আছে? বরং উক্ত আনন্দ শুধু এই কারণে যে, তাঁহারা আখেরাতকে নিজেদের বাসস্থান মনে করিয়া থাকেন। প্রবাস হইতে বাসস্থানের দিকে যাইতে কাহার মনে আনন্দ না হয়? একটি কথা এই থাকিয়া যায় যে, তাঁহাদের মনে ধর-পাকড়ের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা হয় কিনা? ইহার উত্তরে বলিতেছি যে, আশঙ্কা অবশ্যই হয়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র রহমতের প্রত্যাশাও হইয়া থাকে যে, সম্মুখীন হইলেও ইন্‌শাআল্লাহ্, আবার মুক্ত হইয়া যাইব।

মনে করুন, যেমন কাহারও বসতবাড়ী ভাঙ্গা-চুরা অবস্থায় পতিত রহিয়াছে এবং মুসাফিরখানা খুব পাকা ও মজবুত। এমতাবস্থায় মুসাফির নিজের ভাঙ্গা বাড়ীকেই মুসাফিরখানার পাকা বাড়ীর চেয়ে অধিক পছন্দ করিবে এবং সে মনে করিবে, যদিও এখন আমার ঘর ভাঙ্গা-চুরা, কিন্তু অচিরেই ইন্‌শাআল্লাহ্, আমি উহা পাকা করিয়া ফেলিব। এইরূপে আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ যদিও শাস্তির আশঙ্কা করেন, কিন্তু তাঁহারা জানেন, ঈমান নিরাপদ থাকিলে নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রহমত হইবে। ফলকথা, স্থায়ী বাসস্থানের সহিত স্বাভাবিক মহব্বত হইয়া থাকে, যদিও সেখানে কিছু কষ্টও হয়। অতএব, তাঁহাদের সম্বন্ধে এরূপ সন্দেহ করার কারণ নাই যে, তাঁহারা নিজেদের আমলের জন্য গর্বিত।

দুনিয়ার স্বরূপ সামনে রাখার ফলঃ মোটকথা, উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহাই দুনিয়ার প্রকৃত স্বরূপ। ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে সহস্র চিন্তার লাঘব হইবে এবং দুনিয়ার যাবতীয় কামনাই লোপ পাইবে। আমরা যে দুনিয়াতে কামনা করিয়া থাকিঃ এটাও হউক, ওটাও হউক। ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ মনে করুন। যেমন, কেহ কেহ মুসাফিরখানায় আকাঙ্ক্ষা করে, এখানে বাতির ঝাড় লাগাইয়া দেওয়া হউক। অতঃপর নিজের অর্জিত পয়সায় তাহা লাগাইয়াও দিল। বলাবাহুল্য, ইহা মূর্খতা এবং বোকামি ছাড়া আর কিছুই নহে। বিশেষত যখন এরূপ নির্দেশও আছে যে, এই মুসাফিরখানায় কোন যাত্রী চারি দিনের অধিক কাল অবস্থান করিতে পারিবে না, এমতাবস্থায় নিজের অর্জিত পয়সায় এরূপ মুসাফিরখানার সাজসজ্জা করা পূর্ণ মস্তিষ্ক বিকৃতিরই পরিচায়ক হইবে। দুনিয়াও একটি নির্দিষ্টকাল অবস্থানের মুসাফিরখানা ছাড়া আর কিছুই নহে। উক্ত নির্দিষ্ট-কাল অতীত হইয়া গেলে বাধ্যতামূলকভাবে এখান হইতে স্থানান্তরিত হইতে হইবে। প্রথমতঃ মুসাফিরখানায় অবস্থান ইচ্ছাধীন হইলেও সেখানে নিজ গৃহের ন্যায় আচার-ব্যবহার করা উচিত হইবে না। পরন্তু ইচ্ছাধীন না হইলে তো উহাতে মন লাগান আদৌ উচিত নহে; বরং উহার প্রতি অমনোযোগ এবং সঙ্কীর্ণ মনোভাবই পোষণ করা কর্তব্য।

দুনিয়া মু'মিনের জন্য কারাগারঃ হাদীসে বর্ণিত এই নীতিবাক্যটির অর্থ বিভিন্ন টীকাকার বিভিন্নরূপ বলিয়াছেন। আমার মতে اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ 'দুনিয়া মু'মিনের জন্য কারাগার' বাক্যটির অর্থ ইহাই। দুঃখ-কষ্টের পরিপ্রেক্ষিতে দুনিয়াকে মু'মিনের জন্য কারাগার বলা হয় নাই। কেননা, কোন কোন মু'মিনকে দুনিয়াতে কোন প্রকার কষ্টই ভোগ করিতে হয় না; বরং ইহাকে মু'মিনের কারাগার এই হিসাবে বলা হইয়াছে যে, জেলখানায় যত শান্তি ও আরামের ব্যবস্থাই থাকুক না কেন, তথায় কোন বন্দীরই মন বসে না। দুনিয়াতে মু'মিন লোকের অবস্থাও তদ্রূপ হওয়া উচিত। অর্থাৎ, যত প্রকার আমোদ-আহ্লাদ এবং সুখ-শান্তির ব্যবস্থাই দুনিয়াতে থাকুক না কেন— এখানে মু'মিন লোকের মন যেন কখনও না বসে। কেননা, মন আকৃষ্ট হইবার স্থান বাসগৃহ; অথচ ইহা নিজ বাসগৃহ নহে। সুতরাং এখানে থাকিয়া নানাবিধ বাসনা-কামনা কেন হইবে? কেন

লোকেরা এখানে এরূপ আকাঙ্ক্ষা করিবে যে, এটা হউক ওটা হউক ; বরং এই কল্পনা করিবেঃ দুনিয়া কারাগার, পরের দেশ, যে প্রকারেই এখানে কয়েকটা দিন কাটিয়া যায় আপত্তি নাই। দুনিয়ার চিন্তা ছাড়িয়া এখানে বসিয়া আখেরাতের চিন্তা করিবে যে, আখেরাতের জন্য এই সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন, এই সম্বল আবশ্যক ইত্যাদি। আখেরাতের উপযোগী হওয়ার জন্য নিজের নফ্‌সের সংশোধন আবশ্যক। আবার এরূপ চিন্তাও করিবে যে, পূর্ণ সাজ-সরঞ্জাম সঙ্গে লইতে পারিলে আখেরাতে এরূপ আনন্দ হইবে, এরূপ শান্তি হইবে। অন্যথায় এই বিপদ হইবে, এই অশান্তি হইবে।

এখন গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখুন, এরূপ চিন্তা করে কয়জন লোকে? আমি বলি, দুনিয়াদারের কথা ছাড়িয়াই দিন। দ্বীনদার লোকের মনেও আখেরাতের জন্য কামনা-বাসনা নাই। শাস্তির আশঙ্কাও করে না। আল্লাহ্ তা'আলা পরিষ্কার বলিয়াছেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ط وَاتَّقُوا اللهَ

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং প্রত্যেক লোকেরই লক্ষ্য রাখা উচিত আগামীকল্যের জন্য পূর্বাহ্নে সে কি কি করিয়াছে? আবার বলি, আল্লাহ্‌কে ভয় কর।" দেখুন, একদিনের জন্যও যদি কোন স্থানে সফরে বাহির হন, তবে সঙ্গে প্রয়োজনীয় নাশ্‌তা এবং সাজ-সরঞ্জাম ও পাথেয়-সম্বল লইয়া থাকেন। আখেরাতের এই সীমাহীন সফরের জন্য কি পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছেন? বিশেষত উহা আপনাদের স্থায়ী বাসস্থান। এমতাবস্থায় তো তথাকার জন্য আরও অধিক পরিমাণে স্থায়ী সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন ছিল। অর্থাৎ, সফরের পথ অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে নাশ্‌তা ও পথের সম্বলের এবং ঘর-বাড়ীতে স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য উপার্জিত অর্থের ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রয়োজন ছিল। আখেরাতকে নিজের স্থায়ী বাসস্থান মনে করার এক লক্ষণ ছিল ইহা। আর এক লক্ষণ ইহাও ছিল যে, দুনিয়ার বিপদে-আপদে নিজের জন্যও কোন প্রকার শোক-চিন্তা হওয়া উচিত ছিল না, নিজের আত্মীয়-স্বজনের জন্যও না। কেননা, বাসস্থান তো আমাদের আখেরাতে, দুনিয়ার আপদ-বিপদে বিচলিত কেন হইব? কিন্তু আমরা তো আখেরাতকে বাসস্থান মনে করি না। ইহার লক্ষণ এই যে, আমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু আসিলে মনে হয়, যেন আমাদিগকে কারাগারে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

কোন এক বৃদ্ধ একদিন হযরত হাজী ছাহেব রাহেমাহুল্লাহ্‌র নিকট আসিয়া বলিলঃ হুযূর! আমার স্ত্রী মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত। তিনি বলিলেনঃ ভাল হইয়াছে। কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিতেছে। আরও বলিলেনঃ চিন্তা কেন করিতেছ, অচিরেই তোমারও যাইতে হইবে। সে ব্যক্তি বলিলঃ আমার রুটি পাকাইবে কে? হুযূর বলিলেনঃ সে কি মাতৃগর্ভ হইতেই রুটি পাকাইতে পাকাইতে আসিয়াছে? মোটকথা, মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের গেঁহু-চিন্তার একমাত্র কারণ এই যে, আমরা আখেরাতের কথা ভুলিয়াই গিয়াছি। নচেৎ এত অন্ন-চিন্তা হইত না। আখেরাতকে নিজের বাসস্থান মনে করার আর একটি লক্ষণ এই হওয়া উচিত যেন কাহারও সঙ্গে শত্রুতা ও মনোবাদ না হয়, যদিও কোন ব্যাপারে মামুলি ধরনের ঝগড়া-বিবাদের উৎপত্তি হইয়া যায়। রেলগাড়ীতে যাত্রীদের মধ্যে পরস্পর সাধারণ তর্ক-বিতর্ক অবশ্য হয়, কিন্তু এমন কখনও হয় না যে, নিজের তল্পিতল্পা ছাড়িয়া কাহারও সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। কেননা, প্রত্যেকেই বুঝে যে, ইহাতে সফরে বৃথা বিলম্ব হইবে ও অযথা সময় নষ্ট হইবে। ভাবিয়া দেখুন, এইরূপে দুনিয়ার বৃথা ঝামেলা

সম্বন্ধে কেহ কোনদিন চিন্তা করিয়াছেন যে, ইহাতে লিপ্ত বা জড়িত হইলে অনর্থক আখেরাতের সফরে ব্যাঘাত হইবে। বৃথা সময় নষ্ট হইয়া আখেরাতের কাজের ক্ষতি হইবে। কিন্তু মানুষ যখন বৃথা দুনিয়ার ঝগড়া-বিবাদে জড়িত হইতেছে, তখন মনে হইতেছে আখেরাতকে তাহারা নিজের বাড়ী বলিয়া মনে করে না। এতদ্ভিন্ন আখেরাতকে নিজের প্রকৃত ঘর-বাড়ী মনে করিলে দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জাম ও আসবাব-উপকরণ লইয়া এমন গর্ববোধ করিত না। যেমন, সফরকালে হোটেল বা মুসাফিরখানায় যদি কেহ শয়ন করিবার জন্য জাজিমযুক্ত পালং পায়, তজ্জন্য সে কখনও গর্বিত হয় না। কেননা, সে ভাল করিয়াই জানে যে, ইহা তো চাহিয়া লওয়া হইয়াছে, ইহা ক্ষণ-স্থায়ী। কাজেই ইহাতে গর্বিত হওয়ার কিছুই নাই। অথচ আমাদের অবস্থা এই যে, চারিটি পয়সার মালিক হইলেই তাহা লইয়া গর্ববোধ করি। ইহাতে প্রমাণ হয়, আমরা দুনিয়াকেই নিজের ঘর-বাড়ী মনে করিতেছি। আমাদের আরও অনেক কাজের দ্বারাও প্রমাণ হয় যে, আমরা দুনিয়াকেই নিজেদের স্থায়ী বসতবাটি মনে করিয়া থাকি। ইহাই আমাদের মধ্যে প্রধান দোষ। ইহার কারণেই আমাদের আখেরাতের কাজে অলসতা এবং গাফলতি পরিলক্ষিত হইতেছে। এই তো হইল আমাদের অবস্থা, যাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, আমরা আখেরাতকে নিজের স্থায়ী বসতি মনে করি না। ছাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) প্রতি লক্ষ্য করুন, তাঁহারা কেমন কষ্ট সহ্য করিয়াছেন! কিন্তু কোন সময় তাঁহারা ঘাবড়াইয়া পড়েন নাই। পার্থিব এ সমস্ত খুঁটিনাটি বিপদ-আপদ তাঁহাদের কি বিচলিত করিবে? সকলের সেরা বিপদ মৃত্যুর প্রতিই তাঁহারা আগ্রহান্বিত থাকিতেন। কখন তাঁহারা এই দুনিয়ার কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিবেন সেই প্রতীক্ষায় থাকিতেন। একান্ত বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করার মত নিতান্ত নিরুপায়ের অবস্থাতেই তাঁহারা দুনিয়ার উপার্জনও করিতেন। অতএব, বুঝা যায়, তাঁহারা আখেরাতকেই নিজেদের প্রকৃত বাসস্থান বলিয়া মনে করিতেন। ইহাই ছিল উহার লক্ষণ।

দুনিয়ার সহিত কি পরিমাণ সম্পর্ক রাখা উচিতঃ আমি যে বলি, দুনিয়াকে নিজের বাসগৃহ মনে করিও না। ইহার অর্থ এই নহে যে, দুনিয়া মোটেই উপার্জন করিও না। দুনিয়া উপার্জনে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু এমন যেন না হয় যে, উহাতে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হইয়া যাও। যেমন, আমাদের অবস্থা দেখিলে মনে হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্কই নাই। দোকানে কাপড় পছন্দ করিতে গেলে মনে হয় যেন ইহাই আমাদের দ্বীন, ইহাই আমাদের ঈমান অর্থাৎ, যথাসর্বস্ব। অলঙ্কারের পাছে পড়িলে তো উহার কল্পনাই সর্বক্ষণ মন জুড়িয়া থাকিবে। আমি আবার বলি, দুনিয়ার কাজ-কর্ম করিতে আমি নিষেধ করিতেছি না। শুধু এতটুকু বলি যে, ইহাতে আকৃষ্ট হইবে না। সমস্ত কাজই কর, কিন্তু উহা হইতে নিঃসম্পর্ক থাক। মনকে দুনিয়ার কাজে মত্ত করিয়া দেওয়াই বিষতুল্য। ইহা এমন একটি "বালা", মৃত্যুকালে ইহাই তোমার হৃদয়ে প্রবল হইয়া তোমাকে আল্লাহ্ ও রাসূলের নাম হইতে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন করিয়া দেওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। সুতরাং যথাসাধ্য চেষ্টা কর যেন দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট না হও। অন্তরকে আল্লাহ্‌র প্রতি আকৃষ্ট রাখ এবং হাতে সর্বপ্রকারের কাজ করিতে থাক, কোনই ক্ষতি নাই।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ স্বয়ং হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহের যাবতীয় কাজকর্ম নিজের হাতে করিতেন। কিন্তু মসজিদে আযান হওয়ামাত্র তাঁহার অবস্থা এরূপ হইত যে, قَامَ كَانَّهٗ لَايَعْرِفُنَا "উঠিয়া দাঁড়াইতেন, যেন তিনি আমাদিগকে চিনেনই না।" অথচ

আমাদের অবস্থা এইরূপ—বিশেষত মেয়েদের অবস্থা; সেলাইর কাজে লিপ্ত হইলে নামাযের চিন্তাও থাকে না। এইরূপে দুনিয়ার যাবতীয় কাজে মগ্ন হইলে বুঝা যায় যে, তাহারা ধর্ম-কর্মের কোন খবরই রাখে না এবং ধর্ম-কর্মের প্রতি তাহারা কোনই গুরুত্ব প্রদান করে না। আফসোস, ধর্ম কি এতই অবহেলার বস্তু? এরূপ আচরণ দুনিয়ার কাজে করিলেই সঙ্গত হইত। কবি কেমন সুন্দর বলিয়াছেনঃ

غم دین خور غم غم دین ست ـ همـه غمها فروتـراز ایں ست
غم دنیا مخور که بیهوده است ـ هیـچ کس در جهاں نیاسوده ست

"ধর্মের চিন্তা কর, ইহাই প্রকৃত চিন্তা, ইহার সম্মুখে অন্যান্য চিন্তা কিছুই নহে। দুনিয়ার চিন্তা করিও না, ইহা নিষ্ফল, দুনিয়াতে কেহই কোনদিন তৃপ্ত হইতে পারে নাই।" বাস্তবিকপক্ষে দুনিয়ার চিন্তার অবস্থা যেন স্বপ্নের চিন্তা। স্বপ্নে যদি কাহাকেও সাপে দংশন করে, তৎক্ষণাৎ ভীত-চকিত হইয়া তাহার নিদ্রা ছুটিয়া যায় এবং দেখিতে পায়, কোমল 'জাজীম'যুক্ত পালঙ্কের উপর শায়িত রহিয়াছে, বিরাট অট্টালিকা, চতুর্দিকে লোকজন মস্তক অবনত করিয়া তাহাকে নমস্কার করিতেছে। এমতাবস্থায় তাহার হৃদয়ে স্বপ্নযোগে সর্প দংশনের চিন্তা থাকিবে কি? কখনই থাকিবে না।

অনুরূপভাবে ইহজগতের আনন্দও স্বপ্নের আনন্দেরই সমতুল্য। মনে করুন, কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিল সে রাজসিংহাসনে সমাসীন, একটু পরেই নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, দেখিতে পাইল তাহার চতুর্দিকে হাতকড়া হস্তে পুলিসের সারি দণ্ডায়মান, তাহাকে বন্দী করিয়া জেলখানাভিমুখে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। এমতাবস্থায় স্বপ্নে দৃষ্ট রাজত্বে সে আনন্দিত হইতে পারিবে কি? কখনই নহে।

দুনিয়ার চিন্তা এবং আনন্দের অবস্থাও ঠিক এইরূপই মনে করিবেন। খোদার দরবারে যদি আনন্দের সহিত গমন করিতে পারিল, তবে ইহজগতের সারাজীবনের চিন্তা বা দুঃখ-কষ্ট কিছুই নহে। পক্ষান্তরে যদি বিষণ্ণ এবং চিন্তিত অবস্থায় আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হইল, তবে ইহ-জগতের সারা জীবনের আনন্দ এবং আহ্লাদ সবই মাটি। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আপনারা এই স্বপ্নবৎ দুঃখ-কষ্ট এবং আনন্দকে সত্যিকারের দুঃখ-কষ্ট ও আনন্দ মনে করিতেছেন। ইহার কারণ তাহাই, যাহা অদ্যকার সভায় আমার আলোচ্য বিষয়। অর্থাৎ, আপনারা দুনিয়াকে নিজেদের স্থায়ী বাসস্থান মনে করিয়া রাখিয়াছেন। ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কখনও তাহা মনে করেন নাই। কাজেই তাঁহাদের মধ্যে অহংকার ছিল না, আস্ফালন ছিল না এবং তাঁহারা কোন মানুষকে ভয়ও করিতেন না। কেননা, তাঁহারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আসক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন, সদাসর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষমাণ থাকিতেন। ছাহাবায়ে কেরাম তো অনেক উচ্চ স্তরের লোক, ওলীআল্লাহ্‌গণের অবস্থাও তদ্রূপই হইয়া থাকে।

হযরত শায়খ আবদুল কুদ্দুস গঙ্গোহী (কুদ্দেসা সিররুহু) যখন রিক্তহস্ত এবং ক্ষুধাপীড়িত হইতেন এবং তাঁহার স্ত্রী কয়েক বেলা ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করার পর যখন অস্থির হইয়া ক্ষুধার অভিযোগ করিতেন, তখন তিনি বলিতেনঃ "অদূর ভবিষ্যতে আমরা বেহেশ্‌তে যাইতেছি। তথায় আমাদের জন্য বিভিন্ন রকমের সুস্বাদু ও উত্তম খাদ্য প্রস্তুত হইতেছে।" ধর্মপ্রাণ স্বামীর স্ত্রীও ধর্মপ্রাণই ছিলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি মানিয়া যাইতেন আর 'টঁ'শব্দটি করিতেন না। তিনি আজকাল-কার স্ত্রীদের ন্যায় ছিলেন না। আজকালের স্ত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ এরূপও আছে, তাহাদের পক্ষে

এমতাবস্থায় বলিয়া ফেলা বিচিত্র নহে যে, "বেহেশ্‌তের সেসমস্ত নেয়ামত তুমিই গ্রহণ করিও; আমার খাদ্য এখানে আনিয়া দাও, সর্বাগ্রে ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করি।" কিন্তু শায়খ ছাহেবের স্ত্রীর অবস্থা এইরূপ ছিল যে, তাঁহার নিকট অলঙ্কার-পত্র আর কি থাকিবে? কেবলমাত্র এক ছড়া চাঁদির হার ছিল, তাহাও এই উদ্দেশ্যে রাখা হইয়াছিল যে, পুত্র মাওলানা রুক্‌নুদ্দীনের বিবাহে দুই-চারি জন মেহ্‌মান আসিলে উহা বিক্রয় করিয়া দুই-এক বেলা তাঁহাদের মেহমানদারী চলিবে। কিন্তু হযরত শায়খের নিকট এই সামান্য অলঙ্কারটুকুও অপছন্দনীয় ছিল, কাজেই তিনি সর্বদা উহা হাতছাড়া করিয়া ফেলার জন্য বিবি ছাহেবাকে তাগাদা করিতেন। বিবি ছাহেবা তখন উপরোক্ত কারণ দর্শাইতেন। দেখুন, কেমন আল্লাহ্‌র বাঁদী! তবুও একথা বলেন নাই যে, "আমার নাকে-কানেও ও সামান্য কিছু অলঙ্কার থাকা দরকার, আমি তো মেয়ে মানুষ।" সোব্‌হানাল্লাহ্‌! কেমন অল্পে তুষ্ট এবং সহিষ্ণু ছিলেন তাঁহারা।

এ সমস্ত মহামানব এই কারণে এত দুঃখ-কষ্ট অম্লান-বদনে সহ্য করিতে পারিতেন যে, তাঁহারা দুনিয়াকে নিজেদের স্থায়ী বাসস্থান মনে করিতেন না এবং এই জন্যই কোন সময় কোন কিছু ক্ষতি হইয়া গেলে তজ্জন্য তাঁহারা বিন্দুমাত্র চিন্তা করিতেন না। বস্তুত আশা ও আকাঙ্ক্ষার বিপরীত কিছু ঘটিলেই মানুষের মনে দুঃখ ও চিন্তা হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন বস্তু সম্বন্ধে এরূপ আশা পোষণ করে যে, ইহা কখনও আমার হস্তচ্যুত হইবে না, হাতছাড়া হইলে সেই বস্তুর জন্যই দুঃখ হইতে পারে। অন্যথায় কোনই চিন্তা হওয়া উচিত নহে। তবে হাঁ, অধিকৃত কোন বস্তু হাতছাড়া হইলে স্বভাবত একটু চিন্তা হয় বৈকি? তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা, আমি অধীরতা ও অস্থিরতামূলক চিন্তা হইতে বারণ করিতেছি। দুনিয়াকে নিজের বাসস্থান বলিয়া যাহারা মনে করে এবং যাহারা মনে করে না তাহাদের মধ্যে ইহাই হইল পার্থক্য। এই মর্মে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ

أَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ○

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে সম্ভবত আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, যাবতীয় অনর্থের মূল দুনিয়ার প্রতি আসক্তি ও অনুরাগ, উহা অন্তর হইতে বাহির করিয়া ফেলা আবশ্যক।

দুনিয়ার মহব্বত কমাইবার উপায়ঃ উহার পন্থা এই যে, অধিক পরিমাণে আখেরাতের কথা স্মরণ করুন, তাহাতেই দুনিয়ার মহব্বত অন্তর হইতে দূরীভূত হইবে। আবার আখেরাতের নেয়ামতের প্রতি মহব্বত এবং তথাকার শাস্তির ভয় এইরূপে হৃদয়ে উৎপন্ন করুন যে, নির্জন স্থানে বসিয়া চিন্তা করুন, আমাকে মরিতে হইবে এবং আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হইতে হইবে। অতঃপর একদিন যাবতীয় কাজ-কর্মের নিকাশ দিতে হইবে। যদি নিকাশের অবস্থা ভাল হয়, তবে বহু উচ্চস্তরের নেয়ামতসমূহ পাওয়া যাইবে। অন্যথায় ভীষণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। আর নফ্‌সকে বলুন, হে নফ্‌স! তোমাকে এই দুনিয়া ত্যাগ করিয়া পরজগতে গমন করিতে হইবে। কবরে তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। ভাল উত্তর দিতে পারিলে তোমার ভাগ্যে অনন্ত শান্তি আছে, অন্যথায় অনন্তকালের জন্য কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। অতঃপর কিয়ামতে তোমাকে পুনরায় হাশরের মাঠে যাইতে হইবে। তথায় সেদিন আমলনামাসমূহ উড়াইয়া দেওয়া হইবে। (যাহা নিজ নিজ হাতে যাইয়া পড়িবে।) তোমাকে পুলসেরাত অতিক্রম করিতে হইবে। অতঃপর তোমার সম্মুখে হয়তো বেহেশ্‌ত হইবে অথবা দোযখ হইবে। এইরূপে প্রত্যহ চিন্তা করিতে থাক, ইহাতেই আখেরাতের সহিত মনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবে এবং দুনিয়ার মহব্বত ক্রমশ কমিতে

থাকিবে। কেহ মনে করিতে পারেন, মৃত্যুর ধ্যান করিলে উহাতে মন ভীত হইবে এবং ঘাবড়াইয়া যাইবে। তজ্জন্য এই উপায় অবলম্বন করিবেন; মন ঘাবড়াইতে আরম্ভ করিলে খোদার রহমতের কথা স্মরণ করিবেন এবং একথা চিন্তা করিবেন যে, বান্দাকে আল্লাহ্ তা'আলা এত ভালবাসেন যে, মাতাও তাহার শিশুকে তত ভালবাসেন না। সুতরাং তাঁহার নিকট যাইতে ভয় করিবার বা ঘাবড়াইবার কিছুই নাই।

এরূপ ধ্যানের পরেও যদি কোন সময় দুনিয়ার প্রতি অন্তরে আগ্রহ উৎপন্ন হইয়া গোনাহের কাজ করিবার ইচ্ছা হয় এবং কোন পাপ কার্য অনুষ্ঠিত হইয়া যায়, তবে উক্ত পাপ কার্য হইতে তওবা করিয়া পুনরায় নূতনভাবে চিন্তা আরম্ভ করিয়া দিন। তওবাকে পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য ইহাও আবশ্যক যে, কাহারও কোন হক দেনা থাকিলে অতিসত্বর উহা পরিশোধ করিয়া ফেলুন। ইহাতে ইন্‌শাআল্লাহ্, সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

অতঃপর ইন্‌শাআল্লাহ্, আপনারা পরলোকের অনন্ত শান্তি ও আনন্দ ভোগ করিতে থাকিবেন। আখেরাতের আগ্রহ অন্তরে উৎপন্ন হওয়ার জন্য আমি "শওকে ওয়াতান" নামে একটি কিতাব রচনা করিয়াছি, তাহা পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন।

অদ্যকার পূর্ণ বক্তব্যের সারমর্ম এই হইল যে, সংসারাসক্তি একটি মারাত্মক ব্যাধি। ইহার এক-মাত্র ঔষধ মৃত্যুর ধ্যানকালীন ভয় হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার রহমত স্মরণ করা এবং আখেরাতের আকর্ষণ শক্তিশালী করার জন্য "শওকে ওয়াতান" নামক কিতাবটি পাঠ করা।

এখন আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি, আশা করি প্রত্যেকে নিজের আভ্যন্তরীণ ব্যাধি সম্বন্ধে সজাগ হইয়াছেন। উহা অতিসত্বর দূরীভূত করিয়া দিন এবং আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে দো'আ করুন, তিনি যেন সাহস প্রদান করেন।

اٰمِيْنَ — اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

■

থানাভুন শহর, মুন্সী আকবর আলী ছাহেবের বাড়ী
১৩৩০ হিজরী, ১১ই শাবান

আল-ফানী

[ধ্বংসশীলতা]

■

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ نَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ - اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مَا عِنْدَ كُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ ط وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ○

কোরআন ও হাদীসের মহত্ত্ব

আমি যাহা আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করিলাম, ইহা কোরআন পাকের একটি সংক্ষিপ্ত আয়াত। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে একটি বড় কাজের কথা শিক্ষা দিয়াছেন। ইহা দ্বারা আমাদের সর্ববিধ পেরেশানীর অবসান হইয়া যাইবে। এই বিষয়টি অতি সুস্পষ্ট, ইহাতে কোন প্রকারের জটিলতা নাই। পবিত্র শরীঅতের শিক্ষা বড় স্পষ্ট শিক্ষা। কেননা, কোরআন মজীদ বিভিন্ন গোত্র এবং বিভিন্ন অবস্থার লোকের প্রতি নাযিল হইয়াছে। সুতরাং কোরআনের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি অতি সহজ এবং উহার বর্ণনা অতিশয় চিত্তাকর্ষক। ইহাতে কোরআন সকল শ্রেণীর লোকেরই বোধগম্য হইয়াছে; কাজেই কোরআন দ্বারা একজন সাধারণ লোক যতটুকু উপকার লাভ করিতে পারে, একজন দার্শনিকও ততখানি উপকৃত হইতে পারে, সাধারণ লোক হউক কিংবা আলেম হউক, প্রত্যেকে ইহা দ্বারা সমান উপকার পাইতে পারে। অবশ্য উপকারলাভের স্তর বিভিন্ন হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মর্যাদা অনুযায়ী ইহা দ্বারা উপকৃত হইয়া থাকে। কোরআনের মর্যাদা এইরূপঃ

بهار عالم حسنش دل و جاں تازه مى دارد - برنگ اصحاب صورت رابـربوارباب معنى را

"উহার অপরূপ সৌন্দর্য মন-প্রাণকে সতেজ করিয়া রাখে—বহিরাকৃতি দর্শকদিগকে বর্ণ দ্বারা এবং মর্ম উপলব্ধিকারীগণকে স্বীয় সুগন্ধি দ্বারা।"

এই কারণেই কেহ কেহ কোরআন শরীফকে বৃষ্টির সহিত তুলনা করিয়াছেন। কেননা, বৃষ্টি হইতে প্রত্যেক প্রকারের ভূমি নিজ নিজ শক্তি অনুসারে সরসতা ও সতেজতা লাভ করিয়া থাকে। এই গুণটি যেমন কোরআন শরীফের মধ্যে রহিয়াছে, তদ্রূপ কোরআনের প্রচারক রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যেও রহিয়াছে। এইরূপে হাদীস শরীফের শিক্ষণীয় বিষয়-গুলির অবস্থাও কোরআনের বিষয়গুলির অনুরূপ। কেননা, হাদীস শরীফও কোরআনের ন্যায় আল্লাহ্‌রই ওহী ; তবে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, কোরআনকে 'ওহীয়ে মতলু' বলা হয় (যাহা শব্দ ও বাক্যসহ অবতীর্ণ হইয়াছে এবং নামায ইত্যাদিতে হুবহু পাঠ করা হয়) এবং হাদীসকে 'ওহীয়ে গায়রে মতলু' বলা হয়। (অর্থাৎ, শব্দ ও বাক্য ব্যতীত ভাব ও বিষয়বস্তু হিসাবে অবতীর্ণ হইয়াছে, নামায ইত্যাদিতে পঠিত হয় না।) সুতরাং কোরআনের ন্যায় হাদীস শরীফের বিষয়গুলিও নিজে বুঝা এবং অপরকে বুঝান খুবই সহজ। কেন সহজ হইবে না? ইহা এমন মহাশক্তিমানের কালাম, যাঁহার পক্ষে সমস্ত জটিলকে সহজ করিয়া দেওয়া অতি সহজ। অতএব, কোরআন এবং হাদীস সহজবোধ্য হওয়া বিচিত্র কিছুই নহে। অবশ্য কোরআন উপদেশ গ্রহণ হিসাবে সর্বশ্রেণীর লোকের জন্য সহজবোধ্য ; কিন্তু উহা হইতে শরীঅতের বিধানসমূহ আবিষ্কারের ব্যাপার শুধু মুজ্‌তাহিদগণের কাজ। এই কারণেই يَسَّرْنَاهُ 'আমি উহাকে সহজ করিয়াছি'-এর সঙ্গে لِلذِّكْرِ 'উপদেশ গ্রহণের জন্য' কিংবা لِتُبَشِّرَ وَتُنْذِرَ 'যেন আপনি মানুষকে বেহেশ্‌তের সুসংবাদ এবং দোযখের ভীতি প্রদর্শন করিতে পারেন' বলা হইয়াছে। আর উপদেশ ছাড়া কোন কোন বিষয়ে বিশেষ সম্প্রদায় (মুজ্‌তাহেদীন) এর জন্য يَسْتَنْبِطُوْنَهُ 'তাহা হইতে শরীঅতের বিধান আবিষ্কার করিবেন' বলা হইয়াছে। অদ্যকার আলোচ্য আয়াতটি উক্ত সহজবোধ্য ও 'উপদেশ সম্বলিত আয়াতসমূহের অন্যতম। এই আয়াতটির মর্ম গভীরভাবে অনুধাবন করিলে আমাদের এক বিরাট ভুলের অপনোদন হইয়া যাইবে।

চিন্তা না করার ফলঃ تدبر অর্থাৎ, গভীর চিন্তার কথা আমি এই জন্য উল্লেখ করিলাম যে, শরীঅতের তা'লীম সহজবোধ্য হওয়া সত্ত্বেও আমাদের নিকট দুর্বোধ্য থাকার কারণ হইল আমরা উহাতে গভীরভাবে চিন্তা করি না। বস্তুত গভীর চিন্তা না করার ফলে তো অনেক দুনিয়াবী অনুভবনীয় বিষয়ও দুর্বোধ্য হইয়া দাঁড়ায়। জ্ঞানগর্ভ বিষয়সমূহের তো কথাই নাই। জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহের সহিত যখন আমলের সরাসরি সম্পর্ক রহিয়াছে, তখন গভীর চিন্তার দ্বারা উহা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম না করিলে কাজ চলিবে কিরূপে? কিন্তু অনুভবনীয় বিষয়সমূহেও যদিও উহাদের সম্পর্ক অনুভবশক্তির সঙ্গেই আছে, তথাপি গভীর চিন্তার প্রয়োজন রহিয়াছে। চিন্তার অভাবে অনেক সময় সাংঘাতিক রকমের ভুল হইয়া যায়। অদ্যকার আলোচ্য বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করুন, গভীর চিন্তা করেন নাই বলিয়া ইহা আপনাদের নিকট দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

আয়াতটির অনুবাদ এই—আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "তোমাদের নিকট যাহাকিছু আছে তাহা নিঃশেষিত এবং বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।" ইহা প্রথম বাক্যের অনুবাদ। পরবর্তী বাক্যটি ইহারই পরি-পূরণের জন্য বলা হইয়াছেঃ "যাহা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট রহিয়াছে তাহা চিরস্থায়ী।"

অনুবাদ হইতেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা এখানে কোন জটিল এবং দুর্বোধ্য বিষয়ের কথা বলেন নাই; বরং ইহা অতি সহজ এবং সরল বিষয়। কিন্তু পরিভাষার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি তত সহজ নহে। কেননা, বাস্তবিকপক্ষে ইহা একটি অতি উচ্চাঙ্গের বিষয়। কিন্তু আমরা উহাকে গভীরভাবে অনুধাবন করি না বলিয়া সহজ মনে হইতেছে। মোটকথা, সহজবোধ্য হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সরলও বটে। কিন্তু আজকাল নিতান্ত মামুলি এবং মর্যাদাহীন কথাকে সরল আখ্যা দেওয়া হয়। অতএব, এই অর্থে কোরআনের কোন একটি কথাও সরল নহে, প্রত্যেকটি বিষয়ই মর্যাদাসম্পন্ন এবং উচ্চ শ্রেণীর। অবশ্য দ্বিতীয় অর্থ—অর্থাৎ, স্পষ্ট ও জটিলতাবিহীন এবং সহজ হওয়ার দিক দিয়া কোরআনের বিষয়বস্তুগুলিতে আমরা গভীরভাবে চিন্তা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি না বলিয়া আমাদের নিকট অস্পষ্ট মনে হইতেছে এবং উহার সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া বুঝা যায়। কোরআনের বিষয়বস্তুগুলি অতিশয় মর্যাদাসম্পন্ন এবং উচ্চ শ্রেণীর হওয়া সত্ত্বেও আজকাল লোকে উহার প্রতি বিশেষ মর্যাদা বা গুরুত্ব প্রদান করে না।

অধিক শ্রবণ এবং দর্শনের ফলঃ গুরুত্ব এবং মর্যাদা প্রদান না করার একটি কারণ—অধিক শ্রবণ এবং অধিক দর্শন। রীতি আছে—কোন বিষয়কে বার বার শ্রবণ করিলে বা বার বার দর্শন করিলে উহা স্বভাবগত হইয়া দাঁড়ায় এবং উহার মর্যাদা হ্রাস পায়। অতঃপর এই কথাটিকেই যদি কেহ গুরুত্বের সহিত বর্ণনা করে, তখন বিস্ময় বোধ হয় এবং এরূপ মনে হয় যে, ইহা কোন একটি নূতন বিষয় বর্ণনা করা হইতেছে। এই ব্যাপারে মানুষ কিছুটা অক্ষমও বটে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে জ্ঞান দান করিয়াছেন, স্বভাবও দান করিয়াছেন। সুতরাং যদি জ্ঞান এবং স্বভাবের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ ঘটে, তখন শরীঅতের শিক্ষানুযায়ী আমল করা উচিত। কেননা, শরীঅতের শিক্ষায় বিবেক এবং স্বভাব উভয়ের প্রতিই লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। যেমন, কোন বস্তু হারাইয়া গেলে যদি মনে কষ্ট হয়, তখন বিবেক বলে, "দুঃখ করিও না, দুঃখ করিলেও ইহা আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না, কাজেই দুঃখ করা বৃথা।" পক্ষান্তরে স্বভাব চায়, দুঃখ করা হউক। কিন্তু একটি অবাস্তব কথার উপর ভিত্তি করিয়াই স্বভাবের এরূপ আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে। তাহা এই যে, "বস্তুটি আমা হইতে বিচ্ছিন্ন কেন হইল?" ইহা অবাস্তব কথা এই জন্য যে, স্বয়ং তোমার অস্তিত্বই তো তোমার অধিকারে নহে। তোমাদের যদি নিজেদের উপরই অধিকার থাকিত, তবে কেহই পীড়িত কিংবা অভাবগ্রস্ত হইত না। কিন্তু মানুষের অস্তিত্বে দিবারাত্র যেসমস্ত পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, তাহাতে বুঝা যায়, মানুষ স্বাধীন নহে; বরং অপর কোন শক্তির অধীনে রহিয়াছে। অতএব, সে যখন নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও স্বাধীন নহে, তবে অন্যান্য বস্তুতে অনর্থক হস্তক্ষেপ করার কি অধিকার আছে?

অতএব, স্বভাবের এই অনধিকার চর্চা বিবেকবিরোধী হইয়াছে বলিয়া বিবেক তাহা রহিত করিয়া দিয়াছে। শরীঅতের উত্তম ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করুন—দুই দিকই রক্ষা করিয়াছে। অর্থাৎ, স্বভাবের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী দুঃখ কর, বাধা নাই; কিন্তু উহাকে প্রবল করিও না। এখানে শরীঅত স্বভাবের এবং আকাঙ্ক্ষার প্রতিও লক্ষ্য রাখিয়াছে এবং বিবেকের যুক্তিও রক্ষা করিয়াছে।

দুনিয়ার অস্থায়িত্ব হইতে অমনোযোগিতাঃ এইরূপে অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ে বিবেক বলে, দুনিয়ার অস্থায়িত্ব সর্বদা চিন্তার খোরাকরূপে সম্মুখে থাকা আবশ্যক। কখনও উহা হইতে অমনোযোগী হওয়া উচিত নহে। কেননা, বাস্তবিকপক্ষে দুনিয়া যখন স্থায়ী নহে; বরং ক্ষণভঙ্গুর, তখন উহা ভুলিয়া দুনিয়াতে মগ্ন হওয়া মহাভুল।

দেখুন, বাদশাহ্ যদি কোষাগার কোষাধ্যক্ষের হাতে সোপর্দ করিয়া দেন এবং কোষাধ্যক্ষের এই জ্ঞান আছে যে, বাদশাহের কোষাগার আমার নিকট আমানতস্বরূপ অর্পণ করা হইয়াছে, কয়েকদিন পরেই ফেরত নেওয়া হইবে, তখন তাহার নিকট যে ইহা আমানতস্বরূপ রাখা হইয়াছে, একথা বিস্মৃত না হওয়া তাহার কর্তব্য। কোন কোষাধ্যক্ষ কোষাগারকে নিজের সম্পত্তি মনে করিয়া প্রকৃত মালিকের ন্যায় উহা ব্যয় করিলে নিশ্চয়ই সকলে তাহাকে বোকা বলিবে।

এইরূপে দুনিয়ার অস্থায়িত্বের কথা ভুলিয়া যাওয়া বিবেক অনুযায়ী মহাভুল। কিন্তু স্বভাব চায় মানুষ তাহা ভুলিয়া থাকুক। কেননা, দুনিয়ার অস্থায়িত্ব বার বার দেখিতে দেখিতে মানুষ তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। আর যে বস্তু অভ্যাসগত হইয়া দাঁড়ায়, স্বভাব তাহা হইতে অমনোযোগী ও অসতর্ক হইয়া পড়ে। শরীঅত এক্ষেত্রেও উভয়ের মধ্যে সমতা স্থাপন করিয়াছে এবং উভয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছে। অর্থাৎ, অমনোযোগী হওয়াতে তেমন দোষ নাই, তবে এতটুকু অমনোযো-গিতা অবশ্যই অনুমোদনীয় নহে, যাহাতে বিবেকের যুক্তিসমূহের প্রতি আদৌ লক্ষ্য করা না হয়।

দুনিয়ার অস্থায়িত্ব হইতে কিছুমাত্র অমনোযোগিতা না হইলেও আবার মানুষ সম্পূর্ণরূপে বেকার হইয়া যাইবে। কেননা, যাহার সম্মুখে সর্বদা মৃত্যু দণ্ডায়মান থাকে, সে কোন কাজই করিতে পারে না। কিন্তু এই অমনোযোগিতারও সীমা আছে। উহার বাহিরে স্বভাবের আকাঙ্ক্ষার দৌড় শেষ হইয়া যায়। উক্ত সীমা এই যে, পার্থিব জীবনের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য দুনিয়ার অস্থায়িত্ব সম্বন্ধে যতটুকু অমনোযোগী থাকা প্রয়োজন তাহা অবশ্য দূষণীয় নহে। কিন্তু এতটুকু অমনো-যোগিতা কখনই অনুমোদনীয় নহে, যাহাতে বিবেকের যুক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া যায়। অর্থাৎ, দুনিয়ার সহিত অন্তরের এমন প্রগাঢ় সম্পর্ক স্থাপন করে, যাহাতে মনে হয়, সে যেন ইহলোকেই থাকিবে।

দুনিয়ার সহিত প্রগাঢ় সম্পর্ক স্থাপনকারীকে সেই মুসাফিরের সঙ্গে তুলনা করিতে পারেন, যে ব্যক্তি হোটেল বা মুসাফিরখানার সহিত মনকে আকৃষ্ট করিয়া শুধু একটি রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে তথায় সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করে এবং উদ্যান রচনা আরম্ভ করিয়া দেয়, এরূপ ব্যক্তিকে সকলে বোকা ছাড়া আর কিছুই বলিবে না। কেননা, সে ব্যক্তি একটি রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে হোটেলে স্থায়ী বাসস্থানের উপযোগী আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করিতেছে। বস্তুত দুনি-য়ার অস্থায়িত্বের প্রতি অমনোযোগী হওয়া মূলত দূষণীয় নহে, কিন্তু তাহা সীমা অতিক্রম করা বিশেষ আপত্তিকর।

আমাদের অবস্থা সেই চামারের ন্যায় বটে। এক ব্যক্তি তাহাকে জুতার ঘা মারিলে সে বলিলঃ "আর একবার মারিয়া দেখ না?" লোকটি আবার এক ঘা বসাইয়া দিলে মুচি আবার বলিলঃ "আবার মার না দেখি?" এইরূপে লোকটি জুতা মারিতেই থাকিল এবং চামার প্রত্যেকবার সেই একই কথা বলিতে থাকিল। এইরূপে আমরাও দিবারাত্র দুনিয়ার অস্থায়িত্বের ঘটনাবলী দেখি-তেছি। কিন্তু নিজের অস্থায়িত্বের কথা ভুলিয়াই রহিয়াছি, যেন অবস্থার ভাষায় আমরা প্রকাশ করিতেছি— "আবার আসুক না মৃত্যু, আবার আসুক না প্লেগ।"

বন্ধুগণ! প্রত্যক্ষ দর্শনের চেয়ে অধিক আর কি হইতে পারে? প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াও যখন আমাদের অমনোযোগিতা দূর হইল না, তবে আর কখন দূর হইবে? ফলকথা, দুনিয়ার অস্থায়িত্ব হইতে আমরা গাফেল রহিয়াছি। অথচ দুনিয়ার অস্থায়িত্বের নিদর্শন প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বিষয় বটে।

আখেরাতের স্থায়িত্বের প্রতি উদাসীনতাঃ আখেরাতের স্থায়িত্ব যদিও চোখে দেখার বিষয় নহে, কিন্তু ইহা মুসলমানের বিশ্বাস্য বিষয়। বিশ্বাস্য বিষয়গুলির প্রতি অন্তরের অটল বিশ্বাস স্থাপন অপরিহার্য। কাজেই যাহা মনের মধ্যে দৃঢ়রূপে স্থাপিত থাকে, তাহা হইতে মনের সম্পর্ক শিথিল হওয়া উচিত নহে। কিন্তু আমাদিগকে যদি বলা হয়—'তুমি মরিবে, খোদার সম্মুখে উপস্থাপিত হইবে। কবরের মধ্যে সওয়াল-জওয়াব হইবে। কিয়ামতের দিন আমলনামা সম্মুখে ধরা হইবে', তখন কথাগুলি আমাদের নিকট স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। দুঃখের বিষয়, যাহা কাইফিয়তস্বরূপ দৃঢ়রূপে স্থাপিত থাকা উচিত ছিল তাহা স্বপ্নবৎ মনে হইতেছে। ইহার লক্ষণ এই যে, কোন উপদেষ্টা এ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলে তাহার সহিত জটিল তর্কের অবতারণা করা হয়। কেহ কেহ বা নির্বিকার চিত্তে বলিয়াই ফেলেঃ

اب تو آرام سے گزرتی ہے - عاقبت کی خبر خدا جانے

"কোন চিন্তা নাই, এখন তো আরামে দিন কাটিতেছে; পরিণামের খবর খোদা জানেন।"

যাহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল, তাহারা উপদেষ্টার কথার উত্তরে বলে, মিঞা! আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও ক্ষমা অসীম। আখেরাতের চিন্তা করিয়া আমরা কি শেষ করিতে পারি? আল্লাহ্ তা'আলা নিজ দয়াগুণে আমাদের সমস্ত গোনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন। এই ব্যক্তির উক্তি হইতে মনে হয়, পরলোকে আল্লাহ্ তা'আলার বিভিন্নমুখী ক্ষমতার মধ্যে কেবল এক দিকই প্রকাশ পাইবে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষমা করিবেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে শাস্তিও প্রদান করিবেন। কিন্তু এই ব্যক্তি কেবল তাঁহার ক্ষমাগুণের প্রতিই লক্ষ্য করিতেছে—শাস্তি প্রদানের ক্ষমতার প্রতি তাহার লক্ষ্যই নাই। কেন বন্ধু! আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করিয়া দিবেন বলিয়া আশা করিতেছেন, তিনি কোন অপরাধে শাস্তিও প্রদান করিতে পারেন এই ভয় কেন মনে আসে না? ইহাও তো সম্ভব যে, ক্ষমা না করিয়া দোযখে নিক্ষেপ করিতে পারেন।

অথচ ছাহাবায়ে কেরামের অবস্থা এরূপ ছিল যে, দিবারাত্র আল্লাহ্র এবাদতে মশগুল থাকিয়া আল্লাহ্র আযাবের ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকিতেন। একদা হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু মূসা আশ্আরী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি পছন্দ কর যে, আমরা হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে যত কাজ করিয়াছি উহার সওয়াব আমরা নির্বিঘ্নে প্রাপ্ত হই, আর তাঁহার পরে যাহা করিয়াছি, সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের কোন নিকাশই না হয়। হযরত আবু মূসা আশ্আরী (রাঃ) বলিলেনঃ "আমি তো মনে করি, হুযূরের (দঃ) সম্মুখে আমরা যাহা করিয়াছি—তাহারও পুরাপুরি সওয়াব প্রাপ্ত হইব এবং তাঁহার পরে যাহা করিয়াছি—উহারও সওয়াব প্রাপ্ত হই। কেননা, তাঁহার পরেও তো আমরা বহু কাজ করিয়াছি, তাহা বিফলে যাইবে কেন? তাঁহার এই উক্তি নির্ভুলও বটে; কেননা, ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর দিগ্বিজয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহ হুযূরের (দঃ) পরেই অধিক হইয়াছিল। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগে ইসলামের বিজয়াভিযান যত দূর-দূরান্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তৎপূর্বে এত দেশ বিজয় আর কখনও হয় নাই।

এতদ্সত্ত্বেও তিনি বলিলেনঃ "ভাই, আমি ইহাই ভাল মনে করি যে, হুযূরের সম্মুখে আমরা যত কাজ করিয়াছি, কেবল তাহাই নিরাপদে থাকুক এবং আমরা উহার সওয়াব প্রাপ্ত হই; আর তাঁহার পরে যাহা করিয়াছি—তাহাতে কোন হিসাব-নিকাশ না হইয়া কেবল আমাদিগকে পাপে-পুণ্যে সমানে সমান ছাড়িয়া দেওয়া হউক। তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। হিসাব করিলে আমরা

সওয়াবের উপযুক্ত হইব কিনা কে জানে? হুযূর (দঃ)-এর যুগে কৃত কার্যসমূহের সওয়াবের প্রত্যাশা তিনি তাঁহার আমলের প্রেক্ষিতে করেন নাই; বরং কেবল এই ভরসায় করিয়াছিলেন যে, হুযূর (দঃ)-এর সম্মুখে যেসমস্ত কাজ করা হইয়াছে, তাঁহার বরকতে উহা নির্ভুল এবং নিখুঁত হইয়া থাকিতে পারে। উহাতে খাঁটি নিয়ত এবং নূর হুযূর (দঃ)-এর বদৌলতেই আসিয়া থাকিতে পারে, এই কারণেই উহাতে সওয়াবের প্রত্যাশা দৃঢ়ভাবে করিয়াছেন। পক্ষান্তরে তাঁহার পরবর্তী-কালে কৃত কার্য সম্বন্ধে ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাহা কবূল হইয়াছে কি-না—কে জানে?

কামেল লোকের প্রয়োজনঃ বাস্তবিকপক্ষে এ সমস্ত বিষয় হইতেই আমরা গাফেল রহিয়াছি এবং ইহা একটি সূক্ষ্ম বিষয়। আমরা ইহার খবরই রাখি না যে, আমাদের কৃত কার্যসমূহের মধ্যে কতক নিজের শক্তিবলে হইয়া থাকে এবং কতক আল্লাহ্ওয়ালাগণের দৃষ্টি ও তাওয়াজ্জোহ্র বরকতে হইয়া থাকে। এই মর্মেই মাওলানা রূমী (রঃ) বলিয়াছেনঃ

یار باید راه راتنہا مرو ــ بے قلاوزاندریں صحراء مرو

"জ্ঞানী সঙ্গী ব্যতীত একাকী পথ চলিও না। বিশেষত মহব্বতের ময়দানে কামেল পীরের সাহচর্য ব্যতীত পা-ই বাড়াইও না।" অর্থাৎ, বাতেনী রাস্তার জন্য কোন অভিজ্ঞ সাথী গ্রহণ কর। একাকী দুর্গম পথ অতিক্রম করার ইচ্ছা করিও না, উহা তুমি কখনও সাথী ভিন্ন একাকী অতিক্রম করিতে পারিবে না। এ কথার উপরে একটি সন্দেহের অবকাশ থাকে যে, কোন কোন আল্লাহ্-ওয়ালার কোন পীর-মুরশিদ ছিলেন না। তাঁহারা মুরশিদ ব্যতীতই খোদার নৈকট্য লাভ করিয়া-ছেন। ইহার উত্তরে মাওলানা বলিয়াছেনঃ

هرکه تنها نادریں راه را برید ــ هم بعون همت مرداں رسید

"যদিও কদাচিৎ কেহ একাকী এই পথ অতিক্রম করিয়া ফেলে, তবে বুঝিতে হইবে তাঁহার পাছেও কোন কামেল আল্লাহ্ওয়ালা লোকের সাহায্য এবং দৃষ্টি ছিল।"

অর্থাৎ, কচিৎ যাহাদিগকে একাকী এই এশকের ময়দান অতিক্রম করিতে দেখা যায়, বাস্তবিক-পক্ষে তাহারাও একাকী এই পথ অতিক্রম করে নাই। একাকী উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে পারে নাই; বরং কোন কামেল পীরের অদৃশ্য সাহায্য এবং গোপন দৃষ্টির বরকতেই সে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছে।

نادر অর্থাৎ, 'কচিৎ' শব্দ যোগ করিয়া এ কথা বুঝাইয়াছেন যে, বাহ্যদৃষ্টিতেও দেখা যায়—প্রেমের এই দুর্গম পথ অতি অল্প লোকেই একাকী অতিক্রম করিতে পারিয়াছে, আবার দুই-একজনকে যদিও একাকী পথ অতিক্রম করিতে দেখা যায়, তাহারাও প্রকৃত প্রস্তাবে একাকী চলে না; বরং তাহাদের পশ্চাতে কোন কামেল লোকের গোপন দৃষ্টি ও অদৃশ্য সাহায্য রহিয়াছে—যদিও সে তাহা জানিতে পারে না যে, কে তাহার সাহায্য করিতেছে। যেমন, সূর্যের উত্তাপে ফল পাকিয়া থাকে, কিন্তু ভক্ষণকারী জানে না যে, ফলটি তাহার জন্য কে পাকাইয়াছে, কে প্রস্তুত করিয়াছে?

তরীকত-সূর্যের কিরণদানঃ এইরূপে প্রত্যেক যুগে আল্লাহ্র কোন খাছ বান্দা তরীকত জগতে সূর্যের ন্যায় হইয়া থাকেন। তাঁহার জ্যোতি বিকিরণে যুগের অধিবাসীবৃন্দ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া

থাকে। কিন্তু তাহারা জানিতেও পারে না যে, কে তাহাদিগকে চালাইতেছে। তাহারা মনে করে, আমরা একাকীই চলিতেছি; কিন্তু তাহা ভুল। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু এই রহস্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, হুযূর (দঃ)-এর যুগে তাঁহারই বরকতে ছাহাবায়ে কেরামের আমলে জ্যোতি বিকীর্ণ হইত। হুযূর (দঃ)-এর পরে আর সেই জ্যোতি ছিল না। যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে পরে আমলের ভাণ্ডারে অনেক কিছু দেখা যায়, কিন্তু তাহাতে পূর্ব্ববৎ জ্যোতি নাই। এই স্তূপীকৃত আমলের দৃষ্টান্ত এইরূপ মনে করুন—যেমন কোন ব্যক্তি হাজার হাজার ঝুড়ি পচা আমরূদ, আনার প্রভৃতি ফল নিয়া বাদশার সম্মুখে হাযির করিল। বাদশাহ কি পচা ফলের স্তূপটিকে শুধু ইহার বৃহত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই মর্যাদা দান করিবেন? কখনই না। দুনিয়ার বাদশাহ্গণ পূর্ণ স্তূপটিকে পচা বলিয়া আমাদের মুখের উপর নিক্ষেপ করিবেন। এই কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) হুযূর (দঃ)-এর পরবর্তী যুগে কৃত নিজের আমল সম্বন্ধে ভীত হইয়া বলিয়াছিলেন, সওয়াব তো দূরের কথা, আমি ইহাতেই রাযী আছি যে, উক্ত আমলের হিসাব হইতে অব্যাহতি দেওয়া হউক। কেননা, হিসাব যেন মুখে উল্টা নিপেক্ষ না করা হয়। হযরত ওমর (রাঃ)-এর হৃদয়ে পরকালের ভয় প্রবল ছিল এবং হযরত আবু মূসা (রাঃ)-এর মনে রহমতের আশা প্রবল ছিল। যখন হযরত ওমরের এবাদতের অবস্থাই এইরূপ ছিল যে, নিজের এবাদত কবূল হওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন না, যদিও বর্তমানকালের কোন আবেদই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন না, তবে এ সমস্ত আল্লাহ্র বান্দারা, যাহারা আল্লাহ্র দয়া ও ক্ষমার দোহাই দিয়া উপদেষ্টাগণের মুখ বন্ধ করিতে প্রয়াস পায়, গোনাহের কার্যে এরূপ ভয় কেন মনে রাখে না যে, গোনাহের জন্য আমাদের শাস্তি হইতে পারে? অতএব, বুঝা গেল, অপরিহার্যরূপে বিশ্বাস্য হওয়া সত্ত্বেও আখেরাত সম্বন্ধ আমরা এতই অমনোযোগী যে, সে সম্বন্ধে কোন খবরই রাখি না। এইরূপে দুনিয়ার অস্থায়িত্ব দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। কিন্তু ভুলেও আমাদের মনে কল্পনা হয় না যে, একদিন আমরাও শেষ হইয়া যাইব। আখেরাতের জন্য সম্বল গ্রহণ সম্বন্ধে বেপরোয়া হইয়া থাকাই ইহার প্রমাণ। রেহান্-বন্ধক ছাড়াইবার চিন্তা নাই, ঋণ পরিশোধ করার চিন্তা নাই, ওয়ারিসদিগকে তাহাদের প্রাপ্য হক দেওয়ার ইচ্ছাও নাই, যেন তাহাদের কর্জ পরিশোধ করিয়া দেওয়াও আল্লাহ্র দায়িত্ব। মোটকথা, সকলেই যেন এক উদ্দেশ্যহীন কার্যে লিপ্ত রহিয়াছে। কেহ অলঙ্কারের ধ্যানে আছে, কেহ বাড়ী-ঘর নির্মাণে ব্যস্ত আছে, কিন্তু কাহারও স্মরণে নাই যে, একদিন ইহলোক ছাড়িয়া আমাকে পরলোকে যাইতে হইবে।

ইহা এমন একটি বিষয়বস্তু, যাহা বাস্তবিকপক্ষে প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট; কিন্তু মনোযোগের অভাবে আমাদের নিকট দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বার বার আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি ইহাও বটে; যাহা আমি এখন বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

আল্লাহ্র সমীপে দো'আ করার প্রয়োজনীয়তাঃ আল্লাহ্ বলেন, হে মানব! শ্রবণ কর, তোমাদের জন্য দুই প্রকারের বস্তু রহিয়াছে। এক প্রকারের বস্তু যাহা তোমাদের হাতে রহিয়াছে এবং যাহাকে তোমরা নিজের মনে করিয়া তৎপ্রতি মন আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছ—তাহা অবশ্যই ধ্বংস এবং বিলুপ্ত হইবে। দ্বিতীয় প্রকারের বস্তু, যাহা তোমাদের জন্যই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট গচ্ছিত রহিয়াছে, তাহা চিরস্থায়ী; কিন্তু তোমরা তাহার প্রতি এত উদাসীন যেন তাহা তোমাদের নহে—অপর কাহারও।

ইহার দৃষ্টান্ত এরূপ মনে করুন, যেমন কোন শিশুর নিকট কিছু টাকা আছে। সে উহাকে নিজের বলিয়া মনে করে। কিন্তু সে উক্ত টাকাগুলিকে ভাঙ্গা মৃৎপাত্রের টুকরা মনে করিয়া বিনাশ করিয়া ফেলিতেছে এবং অবশিষ্ট সমুদয় পুঁজি বা মূলধন তাহার পিতার হাতে রহিয়াছে। শিশু ইহাকে নিজের বলিয়া মনে করে না। অথচ ইহাও তাহারই সম্পদ। কিন্তু পিতা উহাকে শিশু পুত্রের হাতে এই জন্য দিতেছে না যে, সে ইহার মূল্য না বুঝিয়া বিনাশ করিয়া ফেলিবে। অতএব, তিনি ইহাকে শিশুর বিশেষ প্রয়োজনের সময়ের জন্য তাহারই পক্ষে নিজের হাতে রক্ষা করিতে-ছেন। কিন্তু নির্বোধ শিশু পিতার হস্তে রক্ষিত নিজের সম্পদকে নিজের মনে করে না। এইরূপে আমরাও নির্বোধ। ইহলোকে আমাদের সম্মুখে নগদ যাহাকিছু আছে কেবল উহাকে নিজের মনে করিতেছি। আর খোদার নিকট আমাদের জন্য যেসমস্ত নেয়ামত রক্ষিত আছে উহাকে যেন অপর কাহারও সম্পদ বলিয়া মনে করিতেছি।

বন্ধুগণ! তাহাও আমাদেরই সম্পদ। কিন্তু যে পর্যন্ত আপনারা উহার মর্যাদাদান না করিবেন, সে পর্যন্ত উহা পাইবেন না। উহার মর্যাদা হইল, আল্লাহ্ পাকের নিকট উহা প্রার্থনা করুন। এমন কখনও সম্ভব নহে যে, আপনারা চাহেন বা না চাহেন, প্রার্থনা করেন বা না করেন, উহার প্রতি কোন মর্যাদা দান করেন বা না করেন, আল্লাহ্ তা'আলা জবরদস্তি করিয়া তাহা আপনাদের হাতে গুঁজিয়া দিবেন। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেনঃ أَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَ أَنْتُمْ لَهَا كَارِهُوْنَ

"তোমরা না চাহিলেও কি আমার নেয়ামতসমূহ আমি বলপূর্বক তোমাদের মাথায় চাপাইয়া দিব?"

আল্লাহ্ তা'আলার প্রয়োজনই বা কি যে, তোমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমাদের মাথায় তাহা চাপাইয়া দিবেন? আল্লাহ্ তা'আলার ভাণ্ডারে কি এ সমস্ত নেয়ামত রাখিবার স্থান নাই? কিংবা তাহা ভাণ্ডারে মওজুদ থাকিয়া কি পচিয়া যাইবে? কখনও নহে। আল্লাহ্র নিকট স্থানেরও অভাব নাই এবং নেয়ামতসমূহ পচিয়া যাওয়ার মতও নহে। সুতরাং সাধনা ও প্রার্থনা ব্যতীত তাহা প্রাপ্ত হওয়ার আশাও নাই। অথচ প্রার্থনার পরে তাহা পাইতে বিলম্বও হইবে না। হাদীসে কুদ্‌সীতে বর্ণিত আছেঃ

مَنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَّمَنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا — الخ

"যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তাহার দিকে দুই বিঘত অগ্রসর হইয়া থাকি। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তাহার দিকে দুই হাত অগ্রসর হইয়া থাকি। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে হাঁটিয়া অগ্রসর হয়, আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া অগ্রসর হইয়া থাকি।" অতএব, কি কারণে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার দিকে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছাও করিতেছি না?

খোদার নিকট প্রার্থনা না করার ফলঃ এক হাদীসে বর্ণিত আছে—

مَنْ لَّمْ يَسْئَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে না, আল্লাহ্ তাহার প্রতি রাগান্বিত হন।" অন্যান্য মনিব-প্রভুর অবস্থা এই যে, তাহাদের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকিলে বিরক্ত হন; বরং না চাইলেই সন্তুষ্ট থাকেন এবং প্রশংসা করিয়া বলেনঃ অমুক ব্যক্তি খুবই নীরব। কখনও কিছু যাচ্ঞা করে না। পক্ষান্তরে মহাপ্রভু আল্লাহ্ তা'আলার নিকট না

চাহিলেই তিনি রাগান্বিত হইয়া থাকেন। হাদীসে নির্দেশ আছেঃ এমন কি জুতার ফিতা ছিঁড়িয়া গেলেও তাঁহার নিকট চাহিয়া লও, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রত্যেক বস্তু প্রার্থনা কর। লবণ না থাকিলে উহাও তাঁহারই নিকট চাহিয়া লও। ইহা এই জন্য বলিয়াছেন, যেন মানুষের মন হইতে এই ধারণা দূরীভূত হইয়া যায় যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু আল্লাহ্‌র নিকট কি প্রার্থনা করিব? বাহ্যিক দৃষ্টিতে এরূপ ধারণা ভালই মনে হয়। কিন্তু ইহার পশ্চাতে নফ্‌সের ধোঁকা রহিয়াছে। হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎসম্পর্কে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষুদ্র বস্তু প্রার্থনা করে না, সে যেন নিজের ধারণায় বড় বস্তুকে আল্লাহ্‌র নিকটও বড় বলিয়াই মনে করিতেছে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সপ্ত খণ্ড বসুন্ধরার রাজত্ব এবং জুতার ফিতা একই সমান। ক্ষুদ্র বস্তুগুলির জন্য কি আর একজন খোদা আছেন? যদি না থাকে, তবে ক্ষুদ্র বস্তুও তাঁহার নিকটেই প্রার্থনা করা হয় না কেন? ক্ষমা এবং বেহেশ্‌ত প্রার্থনা করার জন্য তো কোরআন শরীফে বিভিন্ন স্থানে নির্দেশই আসিয়াছেঃ

سَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ○

"আপন প্রভুর ক্ষমা এবং বেহেশ্‌তের প্রতি ধাবিত হও; যাহার প্রস্থ আসমান এবং যমীনের সমান।"

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এক হাদীসে বলিয়াছেনঃ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُلِحِّيْنَ فِى الدُّعَاءِ "নিশ্চয়, আল্লাহ্ পাক দো'আর মধ্যে অনুনয়-বিনয়কারীদিগকে ভালবাসেন।" অতএব, দেখুন, আমাদের প্রভু কেমন দয়ালু, এতদসত্ত্বেও যদি কেহ প্রার্থনা না করে, তবে তাহার দুর্ভাগ্য। কবি বলিয়াছেনঃ

اسکے الطاف توهیں عام شهیدی سب پر - تجھ سےکیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا

"তাঁহার অনুগ্রহ সকলের জন্যই ব্যাপক, তোমার সঙ্গে কিসের শত্রুতা ছিল? যদি তুমি অবশ্যই কোন কিছুর উপযুক্ত হইতে—পাইতে!

বন্ধুগণ! আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা কর। তিনি তোমাদের জন্য নানাবিধ নেয়ামত সযত্নে নিজের কাছে রক্ষিত রাখিয়াছেন। তোমাদের নিকট যেসমস্ত নেয়ামত রহিয়াছে, তাহা চোরে চুরি করিয়া নিতে পারে। ডাকাত ছিনাইয়া বা কাড়িয়া লইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা তাহা-তেই মত্ত রহিয়াছি। আর যাহা সুরক্ষিত, নির্বুদ্ধিতাবশত তাহা সম্পূর্ণই ভুলিয়া রহিয়াছি।

আমাদের যাবতীয় বস্তুই পরেরঃ এই ভুলের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেনঃ "তোমাদের হাতে যাহা আছে বাস্তবিকপক্ষে তাহা অপরের দ্রব্য। অর্থাৎ, কিছু-দিনের জন্য আমানতমাত্র। ইহা একদিন তোমাদিগ হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে; কিংবা মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকারীগণ প্রাপ্ত হইবে। পক্ষান্তরে আমার নিকট যেসমস্ত নেয়ামত রহিয়াছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরই বস্তু। ইহা অনন্তকালের জন্য তোমাদের ভোগেই আসিবে।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা এ কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া রহিয়াছি। জ্ঞানের দিক দিয়াও এবং কর্মের দিক দিয়াও। ভুলিয়া যাওয়ার অর্থ—আমরা কখনও বিষয়টিকে অন্তরপটে উপস্থিত করিয়া সে সম্বন্ধে চিন্তা করি না। নচেৎ আমাদের প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে ইহার প্রতি বিশ্বাস রহিয়াছে। কিন্তু যেই বিশ্বাসকে কাজে পরিণত করা হয় না, উহাকে সেই নারীস্বভাব ভীরু শাহ্‌যাদার সহিত তুলনা করা

যাইতে পারে, যিনি একদা বসিয়া আছেন, এমন সময় একটি সর্প বাহির হইয়া সেখান দিয়া অতিক্রম করিতেছিল। ইহা দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেনঃ ওহে! একজন পুরুষ লোককে ডাক না। নিকটস্থ একজন বলিয়া উঠিলঃ "হুযূরও তো মাশাআল্লাহ্ পুরুষ।" তিনি চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, হাঁ, ঠিকই তো বলিয়াছ। ভাল কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছ। আচ্ছা, একটা লাঠি নিয়া আস তো। অতঃপর জানা যায় নাই—তিনি সাপ মারিয়াছিলেন কিনা? বলাবাহুল্য, সে নিজেকে পুরুষ বলিয়া অবশ্যই বিশ্বাস করিত। কিন্তু এমন বিশ্বাসে ফল কি? যদি সময়মত স্মরণে না আসে। এমন কি, অপর কেহ তাহা স্মরণ করাইয়া দিতে হয়। অবশ্য বিশ্বাস সম্বন্ধে একথা বলিতে পারি না যে, ভুলিয়া গেলে তাহা সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া যাইবে। কেননা, সুন্নী সম্প্রদায়ের মতে এরূপ বিশ্বাসও শেষ পর্যন্ত কাজে আসিবে। মারপিট খাইয়াও অবশেষে এই বিশ্বাসের বদৌলতেই কোন এক সময় বেহেশতে প্রবেশ করিবে। উহার প্রমাণ নিম্নলিখিত আয়াতে দেখুনঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ

"কেহ এক রেণু পরিমাণ নেক কাজ করিলেও তাহার ফল পাইবে এবং এক রেণু পরিমাণ মন্দ কাজ করিলেও উহার প্রতিফল পাইবে।"

এক রেণু পরিমাণ নেকীও যখন বিফলে যাইবে না, তখন দুর্বল বিশ্বাস এবং দুর্বল ঈমানের বিনিময়ও অবশ্যই পাওয়া উচিত। ইহার উপায় এই যে, পাপের শাস্তি ভুগিবার পর কোন এক সময় দোযখ হইতে বাহির করা হইবে। অতএব, এই দুর্বল বিশ্বাসও এক হিসাবে উপকারী বটে; কিন্তু যখন পূর্ণরূপে কাজে আসিল না এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বেহেশ্‌তে প্রবেশের সৌভাগ্য হইল না, তখন ইহাকে পূর্ণ হিতকর বলা হইবে না। এই কারণেই আমি বলিতেছি—আমরা এ বিষয়ে জ্ঞানের দিক হইতেও ত্রুটি করিতেছি এবং কাজের দিক হইতেও ত্রুটি করিতেছি। কিন্তু কাজের মোকাবেলায় জ্ঞানের দুই শ্রেণী আছে। একটি বিশ্বাস এবং অপরটি অন্তরে জাগরূক রাখা। আমাদের ত্রুটি দ্বিতীয় শ্রেণীর। অর্থাৎ, আমরা উহাকে মনে জাগরূক রাখিতে ত্রুটি করিতেছি।

এখন জাগরূক না থাকার একটি বড় কারণ শ্রবণ করুন। শয়তান আমাদিগকে এক ধোঁকা দিয়া রাখিয়াছে যে, "প্রথমবারেই বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবার সৌভাগ্য আমাদের কোথায়?" এই কারণে আমরা তজ্জন্য চেষ্টাও করি না এবং জ্ঞানানুরূপ কার্যও করি না। জ্ঞানকে তখনই সম্মুখে রাখা হয়, যখন তদনুযায়ী কার্য করার জন্য চেষ্টা হইবে। আমি বলিতেছিঃ সোবহানাল্লাহ্! আপনা-দের ভাগ্য পানাহারের দিক দিয়া তো বেশ প্রসন্ন এবং তীক্ষ্ণ। সেই বেলায় এমন কেন হয় না যে, হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকেন এবং বলেনঃ "আমাদের সেই ভাগ্য কোথায় যে, দুই বেলা পেট ভরিয়া রুটি খাইব, ইহা তো আমীর লোকদের ভাগ্য। আর যদি এরূপ বলেন যে, "মৃত্যু হওয়া-মাত্র বেহেশ্‌তে পৌঁছিয়া যাই, এমন ইচ্ছাও আমাদের আছে।" তবে আমি বলিবঃ আপনাদের এই চাওয়ার বা ইচ্ছা করার দৃষ্টান্ত সেইরূপ, যেমন কেহ হাত-পা সঞ্চালন না করিয়াই ইচ্ছা করে, রুটি মুখে ঢুকিয়া যাউক। এরূপ অবস্থায় সকলেই বলিবে যে, এই ব্যক্তির রুটি খাও-য়ার ইচ্ছা নাই। যদি ইচ্ছা থাকিত, তবে অবশ্যই উহার উপকরণ অবলম্বন করিত। এইরূপে আমার ভাইয়েরা ইচ্ছাও করেন যে, সোজাসুজি বেহেশ্‌তে পৌঁছিয়া যান, কিন্তু তজ্জন্য হাত-পা নাড়েন না। অর্থাৎ, উপকরণ অবলম্বন করেন না, পক্ষান্তরে দুনিয়ার যে বস্তুর ইচ্ছা করেন উহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন।

সারকথা এই যে, রুটি ভক্ষণ করিতে তো আপনারা ইচ্ছা করেন, আর ধর্ম-কর্মের ইচ্ছা আল্লাহ্ তা'আলা করুক। অর্থাৎ, যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন এবং ভাগ্যে থাকে, তবে ধার্মিক হইয়া যাইব। ইহা অবশ্য একান্ত সত্য কথা যে, কৃতকার্যতা আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায়ই হইবে। কিন্তু দুনিয়ার কাজের জন্য যে প্রকার উপকরণ এবং উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ধর্মের কাজের জন্যও উপকরণ ও উপায় অবলম্বন করা উচিত ছিল, তৎপর ফলাফল আল্লাহ্র হাতে সোপর্দ করিতেন। ইহা কেমন কথা যে, একেবারে উপায়-উপকরণ পরিত্যাগ করিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া রহিলেন? অথচ দুনিয়ার কাজে তো কোন সময় উপকরণ সংগ্রহে এবং তদবীরে কসূর করেন না, ইহার সারমর্ম এই হয়—দুনিয়ার মতলবে আপনারা বেশ হুঁশিয়ার; কিন্তু পরলোককে উদ্দেশ্যের মধ্যেই স্থান দেন না। আপনাদের অন্তরে উহার কোন মর্যাদাই নাই, কাজেই এরূপ টাল-বাহানা এবং অভিযোগ করিয়া থাকেন।

মৃত্যুর কথা মানুষের স্মরণ নাইঃ বিশেষত মেয়েলোকদের মধ্যে ইহার প্রতি লক্ষ্য খুবই কম। তাহারা যখন অলংকার পরিধান করে এবং সেলাই কার্যে কিংবা কাপড় কাটায় মশগুল হয়, তখন তাহাদের অবস্থা দেখিলে মনে হয়, একদিন তাহারা মরিবে এমন চিন্তা তাহাদের মোটেই নাই। সাধারণত মৃত্যুকে আমরা এত বেশী ভুলিয়া রহিয়াছি যে, চোখের সামনে কাহাকেও মরিতে দেখিলেও নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ হয় না। ইহার লক্ষণ এই যে, ঠিক জানাযার সময় হাসি-ঠাট্টার কথা চলিতে থাকে। কবরস্থানে যাইয়া একদিকে মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামান হইতেছে, অপর দিকে মোকদ্দমার কথাবার্তা চলিতেছে। আল্লাহ্র কসম, মানুষের নিজের মৃত্যুর কথা যদি তখন মনে থাকিত, তবে দুনিয়াদারীর কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাইত।

কথিত আছে, এক বৃদ্ধার কন্যা কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হইয়াছিল। বৃদ্ধা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে এই প্রার্থনা করিত, ইয়া আল্লাহ্! আমার মেয়েটির রোগ নিরাময় হইয়া তাহার স্থলে আমার মৃত্যু হউক। ঘটনাক্রমে একদিন গ্রামের একটি গাভী কুঁড়া বা ভূষির জালার মধ্যে মুখ ঢুকাইতেই উহাতে শিং আটকাইয়া গেল। এই অবস্থায় জালা মাথায় করিয়াই গাভীটি বৃদ্ধার গৃহে আসিল। ইহা দেখিয়া বৃদ্ধা ভীত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলঃ "আমি মৃত্যুর কামনা করিতেছিলাম, তাহা আসিয়াই উপস্থিত হইল। ইনিই আযরাঈল ফেরেশ্‌তা, আমার প্রাণসংহারের জন্য আসিয়াছেন।" কাজেই সে ভীত স্বরে বলিতে লাগিলঃ হে মৃত্যু! আমি মেহ্‌তী নই, মেহ্‌তী ওখানে পালঙ্কের উপর শায়িতা রহিয়াছে, আমি তো গরীব বৃদ্ধা।—

گفت ای موت من نه مهتیم – پیر زال غریب مهنتیم অর্থাৎ, "সে বলিল হে মৃত্যু! আমি মেহ্‌তী নই, আমি একজন দরিদ্র ও শ্রমিক বৃদ্ধা।"

বন্ধুগণ! আমরা যদি নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ রাখিতাম, তবে সম্বিৎ হারাইয়া ফেলিতাম এবং আমাদের মধ্যে উহার লক্ষণও প্রকাশ পাইত। কিন্তু উহার কোন চিহ্নই তো আমাদের মধ্যে প্রকাশ পায় নাই। যদি নিজের মৃত্যুর কথা মনে থাকিত, তবে অপরের মৃত্যুতে আমরা এত কান্নাকাটি করিতাম না। কেননা, মৃত্যুর ফলে দুনিয়ার কারাগার হইতে সে মুক্তি লাভ করিয়াছে। ইহাতে এত দুঃখিত হওয়ার কি আছে? স্বভাবত বিচ্ছেদের কিছু দুঃখ হইলেও বিবেক অনুযায়ী ইহা আনন্দের বিষয়। কাজেই কাহারও মৃত্যু দেখিয়া এই ধারণায় আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল যে, আমিও এই ব্যক্তির ন্যায় একদিন এই কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিব। কবি আরেফ বলেনঃ

خرم آں روز که زیں منزل ویراں بروم ـ راحـت جاں طلبـم وزپے جانـاں بروم
نذر کردم که گر آید بسر ایں غم روزیے ـ تا در میکـده شاداں و غزلخواں بروم

"সেইদিন কতই না আনন্দের হইবে, যেদিন আমি এই নশ্বর দুনিয়া ত্যাগ করিয়া প্রিয়জনের পথ ধরিব এবং আত্মার শান্তি কামনা করিব। আমি মানত করিয়াছি যে, যেদিন এই দূরত্বের চিন্তার অবসান ঘটিবে, সেদিন আমি আনন্দে নাচিতে নাচিতে এবং মিলন সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে শরাব-খানার দ্বার পর্যন্ত যাইয়া উপস্থিত হইব।"

মিলনাগ্রহে মৃত্যু কামনা বিধেয়ঃ আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ মৃত্যু দিবসের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। অথচ মৃত্যুর নাম শুনিলেই আমাদের কম্প দিয়া জ্বর আসে। অর্থাৎ, মৃত্যুকে আমরা এমনভাবে ভুলিয়া রহিয়াছি যে, অপরের মৃত্যু দেখিলেও আমাদের মনে চিন্তা জাগে না যে, আমাকেও এক-দিন মরিতে হইবে; বরং মনে করি যে, মৃত্যু কেবল ইহার জন্যই ছিল। কেহ কেহ স্মরণ করিলেও তাহা ওযীফার ন্যায় মাত্র, মনে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। মনে করুন, লাড্ডু ও মিষ্টির নাম লইয়া ওযীফা পাঠ করিলেই কি মুখে মিষ্ট স্বাদ পাওয়া যায়? কখনও না, এইরূপে 'মৃত্যু' 'মৃত্যু' বলিয়া ওযীফা পাঠ করিলেও কোন ফল হইবে না। ইহাকে মৃত্যুর স্মরণ বলা যাইবে না। মৃত্যুর স্মরণ হৃদয়ে বিদ্যমান আছে তখনই বুঝিব, যখন দেখিতে পাইব যে, অলঙ্কার এবং সাজ-সজ্জার বাড়া-বাড়ির প্রতি ঘৃণা জন্মিয়াছে। গৃহে অতিরিক্ত আসবাবপত্রের ঝামেলা অপছন্দ হইতেছে। যেমন, সফরে অতিরিক্ত আসবাবপত্র সঙ্গে থাকা কষ্টকর মনে হয়। এমন কি, মনে হয় যে, সফরে এত সংক্ষিপ্ত আসবাবপত্র সঙ্গে লইয়া থাকি, অথচ গৃহে এত অধিক সাজ-সরঞ্জাম রহিয়াছে যে, গৃহের মালিকও উহার হিসাব জানে না। আমরা প্রত্যহ কিছু কিছু করিয়া আসবাবপত্রের বোঝা বাড়াইয়া চলিয়াছি। ওদিকে পাপের বোঝাও দিন দিন ঘাড়ের উপর ভারী হইতেছে।

দুনিয়ার অস্থায়িত্বের বিশ্বাসে কার্যত ত্রুটিঃ ইতিপূর্বে যাহাকিছু বর্ণিত হইয়াছে—তাহার লক্ষ্য এই ছিল যে, দুনিয়ার অস্থায়িত্বের প্রতি আমাদের বিশ্বাস ত্রুটিপূর্ণ। এখন বলিতেছি যে, দুনিয়ার অস্থায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কাজেও যথেষ্ট ত্রুটি রহিয়াছে। দুনিয়াকে অস্থায়ী মনে করিয়া স্থায়ী আখেরাতের জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি না। খুব বেশী চেষ্টা করিলে এতটুকু করি যে, নির্জনে বসিয়া কতকক্ষণ আল্লাহ্‌র দরবারে শুধু কান্নাকাটি করিলাম। আল্লাহ্‌র নহরে যেন পানির অভাব ঘটিয়াছে, দুই ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন দিয়া আল্লাহ্‌র উপর যেন অনুগ্রহ করা হইল, ইহাতেই আল্লাহ্ তা'আলাকে ক্রয় করিয়া ফেলিলাম। তাঁহার নিকট দুই ফোঁটা অশ্রু ফেলিলেই যেন সমস্ত পাপ মার্জিত হইয়া গেল এবং ভবিষ্যতে আরও পাপ করার অনুমতি পাওয়া গেল। এই দুই ফোঁটা অশ্রুই সমস্ত পাপের কাফ্‌ফারা হইয়া গেল। আসল ব্যাপার এই যে, অশ্রু বিসর্জন দিতে কোন কষ্ট হয় না এবং পয়সাও ব্যয় করিতে হয় না। কাজেই সংশোধনমূলক কার্য না করিয়া কেবল অশ্রু বিসর্জন অবলম্বন করা হইয়াছে। এতদ্‌সম্পর্কে এক বেদুইনের ঘটনা আমার মনে পড়িল। সফরের সময় উক্ত বেদুইনের সঙ্গে একটি কুকুর ছিল, পথিমধ্যে কুকুরটি মরণাপন্ন হইয়া পড়িল। বেদুইন লোকটি কুকুরটিকে সম্মুখে লইয়া কাঁদিতে লাগিল। জনৈক পথিক তাহাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, 'কুকুরটি আমার সঙ্গী, আজ আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে, এই শোকে ক্রন্দন করিতেছি।' পথিক বলিল, 'ইহার রোগ কি?' সে উত্তর করিল, 'ক্ষুধায় মরিতেছে।' মুসাফির দেখিল, তাহার নিকটেই পোটলায় কিছু বাঁধা রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, 'ইহাতে কি?'

বলিল, 'শুষ্ক রুটির টুক্রা।' পথিক বলিল, 'তবে তোমার এত প্রিয় কুকুরটিকে ইহা হইতে কিছু খাইতে দিলে না কেন?'

گفت ناید بےدرم در راہ نان ـ لیك ھست اب دو دیدہ رائیگاں

"বলিল, ইহার সহিত আমার এমন বন্ধুত্ব নহে যে, পয়সার জিনিস তাহাকে খাওয়াইব। দুই চোখের অশ্রু বিসর্জনে পয়সা ব্যয় হয় না, কিছুক্ষণ বর্ষণ করিতেছি।" আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ। এরূপ ক্ষেত্রে অর্থাৎ, মহব্বতের পরিচয় দিতে আমরা কেবল কান্নাই শিখিয়াছি। ইহাতে কোন কষ্টও নাই, ব্যয়ও নাই। বন্ধুগণ! শপথ করিয়া বলুন, ক্ষুধা নিবারণের জন্য শস্য সংগ্রহে, আটা পিষাইতে এবং রুটি পাকাইতে যে পরিমাণ চেষ্টা আপনারা করিয়া থাকেন, আখেরাতের জন্যও কোন সময় এত চেষ্টা করিয়াছেন কি? কখনই করেন নাই। কেহ উপদেশ প্রদান করিলে বলিয়া থাকেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাওফীক দিলে আখেরাতের সামান প্রস্তুত করিব। যেন (নাউযুবিল্লাহ্) ইহাতেও আল্লাহ্রই অপরাধ, নিজেদের কোন অপরাধ নাই। কোন কোন সময় বলেন, আমাদের ভাগ্যই খারাপ। দুনিয়ার ঝামেলার জন্য অবসর পাই কোথায়? ইহাতেও যেন আল্লাহ্র অপরাধ বলা হইতেছে— انا لله و انآ اليه راجعون ইহা কেমন ধর্ম! যদি কোন সময় বেশীর চেয়ে বেশী আখেরাতের খেয়াল আসেও, তখন নিজে কোন চেষ্টা না করিয়া বুযুর্গানে দ্বীনের নিকট দো'আর জন্য আবেদন করা হয়।

যেমন বোম্বাই শহরের এক সওদাগর আমাদের হযরত হাজী ছাহেব রাহেমাহুল্লাহর নিকট আবেদন জানাইলঃ "হুযূর! আমার জন্য দো'আ করিবেন, যেন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে হজ্জের তাওফীক দান করেন।" তিনি বলিলেনঃ হাঁ, 'আমি দো'আ করিব, তোমাকেও এক কাজ করিতে হইবে। জাহাজ ছাড়িবার দিন আমাকে তোমার ব্যক্তিত্বের উপর পূর্ণ ক্ষমতা দান করিতে হইবে। আমি যাহা বলিব তাহা অমান্য করিতে পারিবে না। সে বলিলঃ হুযূর, এই ক্ষমতা লইয়া আপনি কি করিবেন? তিনি বলিলেনঃ 'যখন জাহাজ ছাড়িবে তখন তোমাকে ধরিয়া উহাতে চড়াইয়া দিব।' সে ব্যক্তি টালবাহানা করিতে লাগিল। হযরত হাজী ছাহেব (রঃ) বলিলেনঃ ইহা কখনও হইতে পারে না যে, তুমি বিবি বাচ্চা লইয়া রাত্র-দিন আনন্দ ও আমোদ-আহ্লাদ করিতে থাকিবে; আর আমরা দো'আর জন্য থাকিব।

আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ। নিজে কোন চেষ্টা করিব না। এদিকে উপদেশদাতাকে বলিবঃ 'আপনি আমার জন্য দো'আ করুন।' বিশেষ করিয়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদের অবস্থা এই যে, ধর্মের কাজে তাহারা সকলের পশ্চাতে। আর দুনিয়ার কাজে এই শয়তানের মাসীরা সকলের আগে। আল্লাহ্ তা'আলার কথা কল্পনাও করে না। অবশ্য বউ-বেটিদের অলঙ্কার এবং কাপড়-চোপড়ের জন্য দিবারাত্র তাকীদ করিয়া থাকে। আমরা ইহাদিগকে কম সাহসী তখন মনে করিতে পারিতাম, যদি তাহারা দুনিয়ার কাজেও কম সাহসের পরিচয় দিত। অথচ এই নির্বোধেরা চিন্তা করিয়া দেখে না যে, দুনিয়ার জন্য চেষ্টা করিলে তাহা কোন সময় সফল হয়, আবার কোন সময় সফল হয়ও না। পক্ষান্তরে আখেরাতের চেষ্টা কখনও বিফল হয় না। কেননা, কেহ আখেরাতের কাজের জন্য চেষ্টা করিয়া যদি উহা সম্পন্ন করিতে নাও পারে, কিংবা পূর্ণ নাও হয় তথাপি সে সওয়াব পাইয়া থাকে। এই কথাটি হইতে সাধারণ লোকের আরও একটি ভুলের কথা জানা যাইতেছে। তাহাদিগকে

কোরআন শরীফ ছহীহ্ করিয়া লইতে বলা হইলে উত্তর দিয়া থাকে—"আমার কি আর এখন শিক্ষা করার সময় আছে? এখন বুড়া তোতা, আর কি পড়ি?" ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কেননা, আপনাদের কাজ শুধু চেষ্টা করা, ছহীহ্ হউক বা না হউক তাতে আপনার কিছু আসে যায় না। আপনি চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য না হইলেও চেষ্টার জন্য পূর্ণ সওয়াবই প্রাপ্ত হইবেন; বরং দ্বিগুণ সওয়াব পাইবেন। পরিশ্রমের এক সওয়াব এবং অকৃতকার্যতার জন্য দুঃখ এবং আক্ষেপ করার সওয়াব। কিংবা এরূপ বলুনঃ "পড়ার সওয়াব এবং পরিশ্রমের সওয়াব।" অকৃতকার্যতা সত্ত্বেও সওয়াব পাওয়া যায় দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ

وَالَّذِىْ يَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَّهٗ اَجْرَانِ

"যে ব্যক্তি আটকিয়া আটকিয়া কোরআন শরীফ পড়ে এবং উহাতে তাহার কষ্ট হয়, সে দুই সওয়াব প্রাপ্ত হইবে।"

অকৃতকার্যতাও সওয়াবের কারণঃ ইহার উপর ভিত্তি করিয়া আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ অকৃতকার্যতা-কেও সওয়াবের কারণ বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। হযরত রাবেয়া বছরী হজ্জ-ক্রিয়া সমাধা করার পর আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করিলেনঃ ইয়া আল্লাহ্! আমি হজ্জ-ক্রিয়া সমাপন করিয়াছি, এখন আমাকে সওয়াব দান করুন, হজ্জ কবূল হউক বা না হউক। কেননা, হজ্জ কবূল হইলে তো কবূলকৃত হজ্জের সওয়াবদানের প্রতিশ্রুতিই আপনি দান করিয়াছেন। আর কবূল না হইলে তো মহাবিপদ।

از در دوست چه گویم بچه عنواں رفتم ـ همه شوق آمده بودم همه حرماں رفتم

"কি বলিব, প্রিয়জনের দ্বার হইতে কিভাবে ফিরিয়া যাইতেছি? পূর্ণ আগ্রহ সহকারে আসিয়া-ছিলাম, রিক্তহস্তে প্রত্যাবর্তন করিতেছি।"

আবার বিপন্ন ব্যক্তির জন্যও আপনি সওয়াবের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন। সুতরাং সকল অবস্থাতেই সওয়াব দিতে হইবে। ফলকথা, সেই দরবারে চেষ্টা করিয়া বিফল হওয়াও সফলতা। বিনিময় অবশ্যই পাওয়া যাইবে; হযরত রাবেয়া সওয়াব প্রার্থনার জন্য যেই ভঙ্গি অবলম্বন করিয়াছেন, উহা প্রেমাস্পদের অভিমান। সকলের জন্য ইহা সম্ভব নহে। আমরা তো এতটুকু বলিলেও অশোভন হইবে।

ناز را روئے ببابد همچوں ورد ـ چوں نداری گرد بد خوئی مگرد

پیش یوسف نازش و خوبی مکن ـ جز نیاز و آه یعقوبی مکن

عیب باشد چشم نابینا و باز ـ زشت باشد روی نازیبا و ناز

"প্রেমাভিমান করিতে গোলাব ফুলের মত সুন্দর চেহারা আবশ্যক। তাহা না থাকিলে স্বভাব কর্কশ না করিয়া নম্র ও মধুর করিও। ইউসুফের সৌন্দর্যের সম্মুখে কেবল ইয়াকুবের ন্যায় কান্না-কাটিই শোভা পায়। উহার সম্মুখে সৌন্দর্য ও রূপের গৌরব করিও না। অন্ধ চক্ষুর জন্য পরাঙ্মুখতা বড় দোষ এবং বিশ্রী চেহারার পক্ষে প্রেমাভিমান বিস্ময়কর।"

ফলকথা, ইহা প্রেমাভিমানের ভঙ্গি বটে; কিন্তু মূল বক্তব্য এই যে, যখন নিজের ধারণানুযায়ী আ'মলকে আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে গ্রহণীয় করার চেষ্টা হইয়াছে; কিন্তু চেষ্টায় ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং সেই দরবারের নিয়মানুযায়ী যদিও উক্ত আমল গ্রহণীয় হওয়ার যোগ্য নহে, তবুও তিনি অনুগ্রহপূর্বক কবূল করিয়া লইয়া ত্রুটিপূর্ণ আমলেরও বিনিময় প্রদান করিয়া থাকেন। অগ্রহণীয় কার্যের বিনিময় প্রদান করার অর্থ ইহাই। এই বিষয়টি তরীকতপন্থীদের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ, ধর্মের পথে চেষ্টা যদি সফল নাও হয় কিংবা দুর্বল হয়, তথাপি উহার বিনিময় বা পুরস্কার পাওয়া যাইবে।

বন্ধুগণ! আমলের পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছিতে না পারিলেও সওয়াব এবং নৈকট্যের উদ্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে। আপনি যদি কোরআন ছহীহ্ করার জন্য চেষ্টা করিয়া সফলকাম নাও হন তাহাতে ক্ষতি কি? আল্লাহ্ তা'আলা তো আপনার চেষ্টার জন্য সন্তুষ্ট হইলেন। আমাদের একদল লোক কোন স্থানে এক ধর্মীয় কার্যের জন্য চেষ্টা করিয়া সফলকাম হইতে পারে নাই। তাহাতে জনৈক ফাসেক ব্যক্তি প্রশ্ন করিয়া বলিল—চেষ্টা করিয়া ইহাদের কি লাভ হইল? তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্‌র এক ভক্ত বান্দা রাগত স্বরে উত্তর করিলেন ঃ

سودا قمـار عشق میں شیریں سے کوهکن ـ بازی اگـر چه پانـه سکـاسر تو کهو سکا
کس منـه سے اپنےآپ کو کهتا هےعشق باز ـ اےروسیـاه تجه سے تویه بهی نه هو سکا

"পাহাড় খননকারী আশেক এশকের বাজি রাখিয়া যদিও শিরীনকে লাভ করিতে পারে নাই; কিন্তু নিজের মস্তক তো হারাইতে পারিয়াছে। কোন্ মুখে নিজকে এশ্‌কবাজ বা আশেক বলিয়া দাবী করিতেছ? হে পোড়ামুখো! তোমার দ্বারা তো তাহাও হইল না। মাওলানা রূমী বলিয়াছেন ঃ

گر مرادت را مذاق شکـر هسـت ـ بے مرادی نے مراد دلبـر ست

"যদি তোমার সফলতায় মিষ্ট স্বাদ থাকে, তবে বিফলতার মধ্যেও স্বাদ আছে। কেননা, তাহাতেও প্রিয়জনের কামনা রহিয়াছে।" অর্থাৎ, সফলতার মধ্যে তো মজা এবং তৃপ্তি আছেই, বিফলতার মধ্যেও এক প্রকারের স্বাদ আছে, তাহা এই যে, প্রিয়জনও দেখিতে পাইলেন—আমি তাঁহাকে লাভ করার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সফলকাম হই নাই।

কবি বলেন ঃ

همـینم بس که دانـد ماه رویم ـ که من نیـز از خریـداران اویم

"আমার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সেই চন্দ্রমুখী জানে, আমিও তাহার একজন খরিদ্দার।" অর্থাৎ, সফলকাম না হইলেও ইহা কি কম সৌভাগ্য যে, তুমিও তাহার খরিদ্দারদের অন্তর্ভুক্ত হইলে। সেই ব্যক্তির জন্য আফসোস, যে ব্যক্তি খরিদ্দারদের লিষ্টিভুক্ত হইতে পারে নাই। মোটকথা, আখেরাত সেই মহামূল্যবান ধন, যাহার প্রার্থী বা প্রত্যাশী সফলকাম না হইয়াও বিনিময় এবং সওয়াবলাভের উপযোগী হইয়া থাকে। কিন্তু এমন কোন বাবত নাই যে, কিছু না করিয়াও বিনিময় পাওয়া যাইতে পারে। অতঃপর আফসোস, আমরা দুনিয়া অর্জনের জন্য প্রত্যেক প্রকা-রের চেষ্টা ও তদ্‌বীর করিয়া থাকি, অথচ এখানে বিফলতা সমূলে নষ্ট হওয়া ব্যতীত কিছুই নহে। পক্ষান্তরে আখেরাতের কাজে বিফলতাও এক প্রকারের সফলতা। তথাপি তাহার জন্য আমাদের

চেষ্টা-তদবীর মোটেই নাই। আখেরাতের চেষ্টার ক্ষেত্রে যাহারা বিফলতার অভিযোগ করিয়া বেড়ায়, তাহাদের উত্তরে কবি 'সারমাদ' কেমন সুন্দর বলিয়াছেনঃ

سرمد گله اختصارمی باید کرد ـ یك کار ازیں دو کارمی باید کرد
یا تن برضائے دوست می باید داد ـ یا قطع نظر زیار می باید کرد

'সারমাদ' অভিযোগ সংক্ষেপ কর, অর্থাৎ, বন্ধ কর। দুইটি কাজের মধ্যে কোন একটি কর। হয়তো প্রিয়জনের মর্জির উপর নিজেকে সোপর্দ করিয়া দাও, অথবা এই প্রিয়জনের প্রতি আকর্ষণ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেল।"

আল্লাহ্ তা'আলা যদি কাহারও পুত্র বা অপর কোন আত্মীয়কে উঠাইয়া লন, তবে সে ব্যক্তির অভিযোগ করার কোন অধিকার নাই। কেননা, আপনারা কেহই নিজের নহেন; বরং সকলেই খোদার। আপনারাই যখন তাঁহার অধিকারভুক্ত, তখন আপনাদের যথাসর্বস্বই তাঁহার। যখন আপনার যাবতীয় বস্তুই তাঁহার, তখন তিনি উহা হইতে কোন বস্তু গ্রহণ করিলে বা লইয়া গেলে আপনার তাহাতে কি স্বত্ব বা অধিকার আছে?

এইরূপে যদি আপনি যেকের করেন বা নামায পড়েন; কিন্তু তাহাতে কোন স্বাদ না পান, তাহাতে আপনার ক্ষতি কি? মনে করুন, কোন চাকর তাহার প্রভুর খেত চাষাবাদ করিল; কিন্তু তাহাতে ফসল উৎপন্ন হইল না। এমতাবস্থায় চাকরের কান্নাকাটি করার কি প্রয়োজন? তাতে তাহার কি ক্ষতি হইয়াছে? এইরূপে আপনি লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার যেকের করিয়াছেন, কিন্তু তাহার মজা পাইলেন না। তাহাতে আপনার ক্ষতি কি? আপনি কাজে লাগিয়া থাকুন। সেই দরবারে বিফলকামও সফলকামতুল্য। এই মর্মেই মাওলানা রূমী (রঃ) বলিয়াছেনঃ

گر مرادت را مزاق شکر هست ـ بے مرادی نے مراد دلبر ست

আমলকারীর ধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই ইহাকে ইহলোকে বিফলকাম বলা হইয়াছে। কিন্তু পরলোকে এই বিফলতার জন্যও পূর্ণ বিনিময় পাওয়া যাইবে। আফসোস, এমন মহাসম্পদের জন্য আমরা চেষ্টা করি না, যাহার প্রত্যাশী কখনও বিফলকাম হয় না। অথচ মৃতদেহতুল্য দুনিয়ার জন্য সদাসর্বদা প্রাণ দিতে প্রস্তুত, যাহাতে বিফল হইলে কেবল ক্ষতিই ক্ষতি এবং সফলকাম হইলেও তাহা নিছক অপূর্ণ এবং অস্থায়ী।

স্ত্রী-জাতির ইহলৌকিক লিপ্ততাঃ বিশেষ করিয়া স্ত্রী-জাতির দুনিয়ার জন্য প্রাণ দেওয়ার অবস্থা এই যে, তাহাদের একটা জামা প্রস্তুত করিতে হইলেও তজ্জন্য একটি কমিটি বসিয়া যায়। বলাবলি করে মাসী মা, দেখ তো ঘাড়টা ভাল কিনা? ইহার উপর লতাগুল্ম নক্‌শা লাগাইব, না পাতলা বুটা লাগাইব? কোন্‌টা ভাল দেখাইবে? যদি তাহাদিগকে বলা হয়, একটি জামা নির্মাণের জন্য সারা দুনিয়ার মানুষ জড় করিবার কি প্রয়োজন? যাহা নিজের পছন্দ হয় পরিধান কর, তবে উত্তর করিবে, বাঃ। ইহাই তো রীতি, খাও নিজের পছন্দে আর পর পরের পছন্দে। মেয়েদের মধ্যে আরও একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে—"পেটের জন্য কিসের চিন্তা, তাহা প্রস্তরখণ্ড দ্বারাই পূর্ণ করিয়া লও না কেন; কিন্তু কাপড় মান উপযোগী হইতে হইবে।"

বন্ধুগণ! এ সমস্ত মত্ততা এবং রীতি-নীতির কথা এই জন্য যে, একদিন আমাদিগকে ইহলোক ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে এ কথা কাহারও স্মরণ নাই। এই কারণেই আমার নিকট মেয়েদের পর্ব-অনুষ্ঠানে যোগদান করাই ক্ষতিকর বলিয়া মনে হয়। বিশেষত বার বার বেশ পরিবর্তনপূর্বক গমন করা নিতান্ত হীনতা এবং নীচতার পরিচায়ক। বলুন তো, শিশুদিগকে মূল্যবান কাপড় পরাইবার কি প্রয়োজন? চাই কি তাহারা উহাতে প্রস্রাব-পায়খানাই করুক। আবার বালিকাদিগকে এমনভাবে রত্নালঙ্কার সজ্জিত করা হয় যে, মাথা হইতে পা পর্যন্ত কেবল অলঙ্কারই অলঙ্কার। এদিকে বালিকা নির্বোধ শিশু, উৎসব-অনুষ্ঠানের হট্টগোলের মধ্যে কোন কোন সময় সে উহা দেহ হইতে খুলিয়া জায়গায়-বেজায়গায় ফেলিয়া দেয়। অতঃপর উহা খুঁজিয়া বাহির করিতে কষ্টের সীমা থাকে না, তদুপরি মনের অস্থিরতা তো আছেই। কাহারও প্রতি অযথা খারাপ সন্দেহ জাগিয়া উঠে, স্ত্রী-জাতির মধ্যে স্বভাবত অপরের প্রতি খারাপ সন্দেহ করার স্বভাব খুব প্রবল। তৎক্ষণাৎ কাহারও নাম লইয়াই বলিয়া ফেলে, এই কাজ অমুকের। সুতরাং অবোধ শিশুকে বাহিরে চলা-ফেরা করার সময় অলঙ্কার পরাইয়া দেওয়া মহাভুল। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে এই ঝোঁকই বিদ্যমান রহিয়াছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, শিশুদের আগ্রহ এ বিষয়ে খুব প্রকট। শৈশবেই তাহাদের নাক, কান বিঁধাইয়া না দিলে কান্নাকাটি করিতে থাকে এবং জিদ ধরিয়া শেষ পর্যন্ত বিঁধাইয়াই লয়। যতই কষ্ট হউক না কেন তাহা অকাতরে সহ্য করিয়া লয়, ইহাতে বুঝা যায়, শিশুদেরও নিজেদের মতলব সম্বন্ধে বেশ জ্ঞান আছে। কিন্তু তাহা সে ব্যবহার করে দুনিয়ার ব্যাপারে, ধর্মীয় ব্যাপারে ব্যবহার করে না।

এই কারণেই আমি বলিতেছিলাম, আমাদের কাজেও ত্রুটি রহিয়াছে। আর আভ্যন্তরীণ অব-স্থার দিক দিয়া তো যথেষ্ট ত্রুটি আছে। কেননা, আমলই যখন নাই তখন হাল বা কাইফিয়ত কোথা হইতে উৎপন্ন হইবে? হালের অর্থ—কোন বস্তুর খেয়াল অন্তরে এমনভাবে চাপিয়া বসা, যাহাতে কেবল সেই বস্তুই সর্বক্ষণ কল্পনাক্ষেত্রে বিরাজমান থাকে। আরেফ 'জামী' হালের বর্ণনা এইরূপে দিয়াছেনঃ

بسکه در جان فگار وچشم بیدارم توئی ـ هرکه پیدا می شود از دور پندارم توئی

"আমার প্রেমাপ্লুত প্রাণে এবং সদা জাগ্রত চক্ষুতে একমাত্র তোমারই স্থান রহিয়াছে। দূর হইতে যাহাকিছু আমার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা তুমি বলিয়াই আমার ধারণা হয়।"

এই অবস্থাকে স্ত্রীলোকদের অপেক্ষমাণ মনের অবস্থার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যখন তাহারা কাহারও আগমন প্রতীক্ষায় থাকে, তখন তাহাদের কল্পনা ও ধ্যান কেবল দরজার দিকেই লাগা থাকে। একটু শব্দ কানে আসামাত্রই মনে করে—"এই তো বোধ হয় সে আসিয়াছে।" এখন বুঝিয়া লউন, আল্লাহ্ তা'আলা আমলের মধ্যে এই বরকত রাখিয়াছেন যে, তাহাতে ক্রমশ আখে-রাতের আগ্রহ অন্তরে উৎপন্ন হয়, ফলে সদাসর্বদা আখেরাতের চিন্তাই অন্তরে জাগরিত থাকে, ইহাকেই 'হাল' বলে। স্ত্রীলোকদের মধ্যে 'হালের' আরও একটি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, তাহা তামাক বা জর্দা। স্ত্রী-জাতির মধ্যে কয়েকটি মুদ্রাদোষ বিদ্যমান আছে, নাকে, কানে, হাতে এবং গলায় অলঙ্কার পরিধান করা, কেবল মুখগহ্বরটি এই আপদ হইতে মুক্ত ছিল। অর্থাৎ, মুখের ভিতরে কোন অলঙ্কার পরা হয় না। তাহাই বা রক্ষা পাইবে কেন? ইহার জন্য তাহারা পান-জর্দার ব্যবস্থা করিয়াছে, ইহাতে অবশ্য প্রথম প্রথম মাথায় একটু চক্কর আসিয়া থাকে। পরিশেষে অভ্যাস এমন

দুর্দমনীয় হইয়া দাঁড়ায় যে, একটু বিলম্ব হইতেই সমস্ত ধ্যান, কল্পনা এবং খেয়াল কেবল ইহার প্রতিই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। তৎপ্রতি আগ্রহ এবং আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল হইয়া দাঁড়ায় যে, উহা না পাওয়া পর্যন্ত মন অস্থির এবং চঞ্চল থাকে।

প্রত্যেক কাজের আগ্রহ এবং আকাঙ্ক্ষা এই পর্যায়ে পৌঁছিলে উহাকে 'হাল' বলা হয়। নেক আমল করিতে করিতেও এরূপ প্রবল এবং দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়। তখন অন্তরে কেবল আল্লাহ্ তা'আলার কল্পনাই বিরাজমান থাকে। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, হঠাৎ ক্রমে কোন পাপ কার্য তাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া গেলে মনে হয় যেন কয়েক মন প্রস্রাব এবং পায়খানা তাহার মাথার উপর পতিত হইয়াছে। আবার কোন নেক কাজ করিতে পারিলেও রাজত্বলাভের সমতুল্য আনন্দ পায়। নেক আমলের প্রতিক্রিয়া এই যে, তাহাতে পাপ কার্যের প্রতি ঘৃণা জন্মে এবং মনে পরকালের আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়। বিশেষত তৎসঙ্গে যদি বুযুর্গ লোকের নেক দৃষ্টি পতিত হয় তবে তো সোনায় সোহাগা। যেমন কবি বলিয়াছেনঃ

نه کتابوں سے نه وعظوں سے نه زر سے پیدا ـ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

"কিতাবের দ্বারাও নহে, ওয়ায-নসীহতের দ্বারাও নহে এবং পয়সার দ্বারাও নহে, কেবল বুযুর্গানে দ্বীনের নেক দৃষ্টির দ্বারাই ধার্মিকতা উৎপন্ন হয়।"

বুযুর্গানে দ্বীনের নেক দৃষ্টির ফলঃ ছাহাবায়ে কেরাম (রাযিআল্লাহু আন্‌হুম)-এর মধ্যে সকলেই লেখাপড়া জানিতেন না; বরং তাঁহাদের মধ্যে অনেক এমন সাদাসিধাও ছিলেন যে, ইন্দ্রিয়ানুভূত দ্রব্যও অনুভব করিতে পারিতেন না। যেমন 'ফতুহাতে ইসলামিয়াহ্' কিতাবে এক ছাহাবীর ঘটনার উল্লেখ আছে যে, সফরকালে কোন এক রাজকন্যার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইতেই তিনি তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবেদন জানাইলেনঃ আমি অমুক শাহ্‌যাদীকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি। আপনি আমাকে একটি স্মারকলিপি লিখিয়া দিন যেন আমাদের জয় হইলে উক্ত শাহ্‌যাদীকে আমার হস্তে অর্পণ করা হয়। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাই করিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে সেই দেশে জেহাদ হইলে উক্ত রাজকন্যা মুসলমানদের হাতে বন্দী হইল, উক্ত ছাহাবী হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লিখিত স্মারকলিপি সেনাপতিকে দেখাইলে সেনাপতি শাহ্‌যাদীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। অতঃপর মেয়েটির ভাই আসিয়া উক্ত ছাহাবীকে বলিলঃ তুমি ইহাকে আমার কাছে বিক্রয় করিবে কি? তিনি বলিলেনঃ 'হাঁ'। সে বলিলঃ মূল্য কত চাও, তিনি বলিলেনঃ হাজার টাকা। সে একহাজার টাকা লইয়া আসিলে তিনি বলিলেনঃ ইহা তো অতি সামান্য টাকা। আমি মনে করিয়াছিলাম একহাজার টাকা এত বেশী হইবে যে, তাহাতে আমার ঘর পূর্ণ হইয়া যাইবে। মেয়েটির ভ্রাতা সেনাপতির নিকট অভিযোগ করিল যে, এই লোকটি বিক্রয় করিয়া বিক্রীত দ্রব্য সমর্পণ করিতে অস্বীকার করিতেছে। সেনাপতি তাঁহাকে বাধ্য করিলেন।—"তুমি যখন বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছ, এখন আর উহা রাখিবার অধিকার তোমার নাই।" শেষ পর্যন্ত সমর্পণ করিতেই হইল। আর একজন গ্রাম্য ছাহাবীর কথা হাদীসে উল্লেখ আছে যে, তিনি নামাযের পর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করিলেন—

اللهم ارحمنى و محمدا ولا تشرك فى رحمتنا احدا "হে খোদা! আমার এবং মোহাম্মদ

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন এবং আমাদের রহমতে কাহাকেও শরীক করিবেন না।” ইহা শুনিয়া হুযূর বলিলেনঃ لقد تحجرت واسعا 'তুমি একটি ব্যাপক বস্তুকে সংকীর্ণ করিয়া দিয়াছ।'

অতঃপর তিনি নামাযের স্থান হইতে উঠিয়া মসজিদের আঙ্গিনায় যাইয়া প্রস্রাব করিতে লাগিলেন। ছাহাবা (রাঃ)-গণ তাহাকে নিষেধ করিলে বলিলেনঃ থাম, থাম। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ এখন ইহার প্রস্রাবে বাধা দিও না; যাহা হইবার তাহা হইয়াই গিয়াছে। সোবহানাল্লাহ্ কি হেক্মতের কথা! এখন তাহাকে বাধা দিলে প্রথমতঃ তাহার স্বাস্থ্যের ক্ষতি, দ্বিতীয়তঃ যদি সে দৌড়াইতে আরম্ভ করে, তবে সমস্ত মসজিদই না-পাক করিয়া ফেলিবে। এমন সময় চতুর্দিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক। অতঃপর হুযূর (দঃ) আদেশ দিলেনঃ “প্রস্রাবের স্থানে এক বালতি পানি ঢালিয়া দাও।” আর বেদুইন ব্যক্তিকে ডাকিয়া নম্র ও স্নেহ-স্বরে বুঝাইয়া দিলেন, “মসজিদ নামায পড়িবার এবং আল্লাহ্‌র যেকের করিবার স্থান, এমন পবিত্র স্থানে প্রস্রাব-পায়খানা করা উচিত নহে।” বেদুইন লোকটির সঙ্গে হুযূর (দঃ) এইরূপ ব্যবহার করিলেন। অপর দিকে দেখুন, তিনি শিক্ষিত ও সভ্য ছাহাবায়ে কেরামের সহিত এই জাতীয় ব্যাপারে কেমন কঠোর ব্যবহার করিতেন, একবার মসজিদের দেওয়ালের গাত্রে কফ দেখিয়া ক্রোধে তাঁহার মুখমণ্ডল লাল হইয়া গিয়াছিল।

মোটকথা, ছাহাবায়ে কেরাম সকলেই লেখাপড়া জানিতেন না; বরং তাঁহারা কেহ কেহ এমন সাদাসিধা ছিলেন যে, যাঁহাদের ঘটনা এইমাত্র আপনারা শ্রবণ করিলেন। তথাপি তাঁহারা সমগ্র উম্মতমণ্ডলীর মধ্যে উত্তম ছিলেন। এমন কি, হযরত গাউছুল আ'যমকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলঃ 'হযরত মোআবিয়া (রাঃ) শ্রেষ্ঠ ছিলেন, না হযরত ওয়াইস ক্বরণী এবং ওমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রঃ)।' তিনি উত্তর করিলেনঃ“হযরত মোআবিয়ার (রাঃ) ঘোড়ার নাকের মধ্যে যে ধূলি জমিয়াছিল, তাহাও হযরত ওয়াইস ক্বরণী এবং ওমর ইব্‌নে আবদুল আযীয অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।” তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এই ছিল যে, তিনি হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন।

সুতরাং আমলের সহিত যদি আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের দৃষ্টিও মিলিত হয়, তবে তাঁহার অবস্থা আরও শক্তিশালী হইয়া পড়ে এবং উদ্দেশ্য দ্রুত সফল হইয়া থাকে, কিন্তু নিশ্চেষ্ট থাকিয়া 'হাল' অর্জন করা অসম্ভব; বরং তুমি কোন আগন্তুকের প্রতীক্ষায় যেমন দরজার দিকে তাকাইয়া থাক, তদ্রূপ আখেরাতের ধ্যান সর্বক্ষণ অন্তরে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। তবেই তুমি 'হালে'র পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারিবে। কাপড় পরিধানে, কাপড় রঙ্গাইতে এবং পানাহারে—মোটকথা, প্রত্যেক কার্যে আখেরাতের ধ্যান রাখিবে। অর্থাৎ, প্রত্যেক কার্যেই তোমার মনে এই চিন্তা আসিবে—শীঘ্রই এমন দিন আসিতেছে, যেদিন আমি দুনিয়াতে থাকিব না। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথারই তালীম দিয়াছেন। এক ছাহাবীকে বলিয়াছেনঃ 'হে আবদুল্লাহ্! সন্ধ্যায় প্রাতঃকালের কল্পনা বা চিন্তা এবং প্রাতে সন্ধ্যার চিন্তা করিও না। সর্বদা নিজেকে মৃত বলিয়া ধারণা করিও।' ইহা সত্য কথা যে, হাল উৎপন্ন না হওয়া পর্যন্ত শুধু আমলের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। 'হাল'শূন্য আমলের দৃষ্টান্ত এরূপ মনে করুন—যেমন, রেলগাড়ীকে কুলিরা ধাক্কাইয়া

নিতেছে। আর 'হাল'সহ আমলের দৃষ্টান্ত—যেমন, ইঞ্জিল রেলগাড়ীকে টানিয়া নিতেছে। এই মর্মেই কবি এরাকী বলিয়াছেনঃ

صنمـــاره قلنـــدر سزاوار بمن نمـــائى ـ كه دراز و دور ديـدم ره ورسم پار سائى

"হে আমার মুরশিদ! আমাকে আকর্ষণের পথ প্রদর্শন করুন। কেননা, এবাদত, রিয়াযত ও পরিশ্রমের পথ বড়ই দীর্ঘ এবং কঠিন বলিয়া মনে হইতেছে।"

এখানে 'আকর্ষণের পথ' বলিতে 'হাল'সহ আমল এবং এবাদতের পথ বলিতে নীরস সংসার-বিরাগ অর্থাৎ, 'হাল'বিহীন আমল উদ্দেশ করা হইয়াছে, যাহাতে উদ্দেশ্য বিলম্বে সফল হইয়া থাকে এবং তাহাও তত হয় না। এই মর্মেই মাওলানা রূমী (রঃ) বলিয়াছেনঃ

قال را بگـذار مرد حال شو ـ پيش مرد كاملے پامـال شو

"কথার বাহাদুরী ত্যাগ করিয়া নিজের আমলের মধ্যে 'হাল' উৎপন্ন কর এবং কোন কামেল পীরের সম্মুখে নিজের অস্তিত্বের গর্বকে পদদলিত করিয়া দাও।"

বন্ধুগণ! চিন্তা করিয়া দেখুন, যদিও সর্ববিষয়ে আমাদের এই বিশ্বাস আছে যে, দুনিয়া ধ্বংস-শীল, তথাপি আমরা এই বিষয়ে আমলের এবং হালের দিক হইতে নিতান্ত অপক্ক। এই মর্মেই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেনঃ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ "তোমাদের নিকট যাহা আছে—নিঃশেষিত হইয়া যাইবে এবং যাহাকিছু আল্লাহ্র নিকট আছে তাহা চিরস্থায়ী থাকিবে।"

সারমর্ম এই যে, দুনিয়াকে অস্থায়ী মনে কর। তদ্রূপ কাজও কর এবং প্রত্যেক সময় প্রত্যেক কাজে সেই বিশ্বাসকে মনের মধ্যে হাযির রাখ। তাহাতে 'হালের' পর্যায়ে পৌঁছিতে পারিবে। বিশ্বাসের মধ্যে যে ব্যক্তি এরূপ পক্কতা ও দৃঢ়তা অর্জন করিতে সমর্থ হইবে, নেক কাজ করিবার তাওফীক তাহার খুব বেশী হইবে। কেননা, মূল রোগ হইতেছে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট থাকা। ইহার একমাত্র চিকিৎসা হইল, সর্বক্ষণ দুনিয়ার অস্থায়িত্বের বিশ্বাসকে হৃদয়ে হাযির রাখা এবং সর্বদা সে বিষয়ে ধ্যান করা। দুনিয়ার অন্যান্য বিষয়ে অস্থায়িত্ব অন্তরের সম্মুখে উপস্থিত রাখা একটু কষ্টকর হইলেও নিজের মৃত্যুর কথা মনের মধ্যে সর্বক্ষণ উদিত রাখিতে কোনই কষ্ট নাই। চন্দ্র-সূর্যের অস্থায়িত্বের চিন্তা কতক্ষণ করিবে? তুমি নিজের মৃত্যুর কথাই চিন্তা করিতে থাক। এই কারণেই হুযূরে আকরাম (দঃ) বলিয়াছেনঃ اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ "অধিক পরিমাণে মৃত্যুকে স্মরণ কর।" দুনিয়া হইতে মন উঠাইয়া আখেরাতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহার সারমর্ম এই যে, প্রত্যহ এক নির্দিষ্ট সময়ে কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া চিন্তা করিবে—হে নফ্স! একদিন মরিতে হইবে এবং দুনিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে।

এখন আমি ওয়ায শেষ করিতেছি এবং আমার আলোচ্য বিষয়ের অনুকূলে একটি কবিতার কতকাংশ আবৃত্তি করিতেছি। ইহার বিষয়বস্তু মৃত্যু-চিন্তার সহায়ক হইবে বলিয়া আশা করি।

كل هوس اس طرح ترغـيـب دى تهـى مجـهـے ـ خوب ملك روس هے اور سر زمـين طوس هے
گر ميسر هو تو كيـا عشرت سے كيجئے زنـدگى ـ اس طرف آواز طبـل ادهـر صدائے كوس هے

صبح سے تا شام جلتا رھے گلگوں کا دور - شب ھوئی تو ماھر دیوں سے کنارو بوس ھے
سنتے ھی عبرت یہ بولی ایك تماشا میں تجھے - چل دکھاؤں تو جو قید از کا محبوس ھے
لے گئی ایکبار گی گور غریباں کی طرف - جس جگہ جان تمنا سو طرح مایوس ھے
مرقدیں دو تین دکھلا کر لگی کھنے مجھے - یہ سکندر ھے یہ دارا ھے یہ کیکاؤس ھے
پوچھ تو ان سے کہ جاہ و حشمت دنیا سے آج - کچھ بھی ان کے ساتہ غیر از حسرت و افسوس ھے؟

"একদিন আমার কামনা আমাকে এইরূপে উৎসাহ প্রদান করিতেছিল—রুশ রাজ্য এবং তুসের ভূমি কত মনোহর। যদি তাহা অধিকারে আসে, তবে মহানন্দে জীবিকানির্বাহ করিতে পার। একদিকে দামামার শব্দ আর একদিকে ডঙ্কা নিনাদ। ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত শরাবে লিপ্ত এবং নিশার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সুন্দরী রমণীদের সহিত আলিঙ্গন। ইহা শুনিতেই সুমতি বলিয়া উঠিল, চল, আমি তোমাকে এক তামাশা দেখাইতেছি। তুমি যে লোভের কবলে আবদ্ধ হইয়াছ একবার চল, দেখ। অবশেষে আমাকে এক কবরস্থানে লইয়া গেল, যথায় কামনা ও বাসনার অন্তরে শত প্রকারে হতাশার উদয় হইয়া থাকে। তিনটি কবর আমাকে দেখাইয়া বলিতে লাগিলঃ ইহা সেকান্দরের, ইহা দারার এবং ইহা কায়কাউসের কবর। ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, আক্ষেপ ও আফসোস ভিন্ন দুনিয়ার আড়ম্বর ও জাঁকজমকের বিন্দুমাত্র তাহাদের সঙ্গে আছে কি?" এই দারা ও সেকান্দর একদিন বিশ্বের অধিপতি ছিলেন। আজ তাহাদের কবরের উপর কেহ প্রস্রাব করিলে বাধা দিবার ক্ষমতাও তাহাদের নাই। এই মর্মে আরও একটি কবিতাংশ শ্রবণ করুনঃ

کل پاؤں ایك کاسہ سر پر جو آگیا - یکسروہ استخوان شکستہ سے چور تھا
بولا سنبھل کے چل تو ذرا راہ بے خبر - میں بھی کبھی کسی کا سرپر غرور تھا

"গতকল্য একটি মস্তকের খুলির উপর আমার পা পড়িতেই তাহা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল, উহা আমাকে বলিলঃ ওহে সাবধান! একটু দেখিয়া-শুনিয়া পথ চল, কোন একদিন আমিও কোন ব্যক্তির গর্বিত মস্তক ছিলাম।"

শুধু মন নরম করার উদ্দেশ্যে আমি এই কবিতাগুলি পাঠ করিলাম। কবিতা পাঠে সাধারণত মন অধিক নরম হইয়া থাকে এবং কবিতা মনেও রক্ষিত থাকে। অন্যথায় কোরআন এবং হাদীসই আমাদের প্রকৃত এবং মূল জিনিস। মোটকথা, প্রত্যেক রাত্রিতে এতটুকু চিন্তা করিবেন যে, আমাকেও একদিন মরিতে হইবে। মৃত্যু অবশ্যই আসিবে, নফ্সকে যখন প্রতিদিন এইরূপে উৎপীড়ন করিবেন, তখন সে অবশ্যই সোজা পথে চলিয়া আসিবে। আমার উদ্দেশ্য এই নহে যে, দুনিয়ার যাবতীয় প্রয়োজনীয় সম্পর্ক ত্যাগ কর; বরং আমি বলি, সমস্ত কাজই কর, কিন্তু উহার সহিত মন লাগাইও না। ফল এই হইবে যে, যদিও দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় নফ্স হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না, কিন্তু উহার জন্য মনে কোন লোভ থাকিবে না। এই লোভ বা মোহকে মন হইতে বিতাড়নের উপায় অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক। হযরত আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) ইহারই চেষ্টা-তদ্বীর খুব গুরুত্বের সহিত করিয়াছেন এবং শিখাইয়াছেন। হাদীস শরীফ পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন, হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ কামনা, লোভ ও আকাঙ্ক্ষা হইতে

মানুষকে কেমন দৃঢ়তা সহকারে বারণ করিয়াছেন এবং উহার করণের জন্য কত প্রকারের উপায় ও চেষ্টা-তদবীর তা'লীম দিয়াছেন।

এখন দো'আ করুন, আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমাদের অসতর্কতা এবং লোভ দূর করিয়া দেন এবং আখেরাতের প্রতি আগ্রহ ও দুনিয়া হইতে বিরাগ এবং বীতশ্রদ্ধতা দান করেন। আর এই মৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা করিয়া দেন, যাহার মৃত্যু উপলক্ষে অদ্যকার এই ওয়ায অনুষ্ঠিত হইল এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনের অন্তরে ছবর দান করিয়া সকলকে আখেরাতের জন্য প্রস্তুতির তাওফীক দান করেন। —আমীন!

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

■

থানাভুন শহর, মুন্সী আকবর আলী ছাহেবের গৃহ
হিজরী ১৩৩১ সন, ৩০শা জমাদাল উখরা

আল-বাক্বী

[পরকালের স্থায়িত্ব]

■

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ - اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ ط وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

অস্থায়িত্বের ঘোষণা অপরিহার্য

"তোমাদের নিকট যাহা আছে তাহা নিঃশেষ হইয়া যাইবে। আর আল্লাহ্‌র নিকট যাহা আছে তাহা চিরস্থায়ী থাকিবে, যাহারা দৃঢ়পদ রহিয়াছে, তাহাদের নেক কার্যের বিনিময়ে আমি তাহাদিগকে তাহাদের পুরস্কার অবশ্যই প্রদান করিব।"

এই আয়াতটিরই প্রথমাংশ ما عندكم ينفد সম্বন্ধে (আল-ফানী শীর্ষক নামে) গতকল্য বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়াংশ ما عند الله باق "আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যাহা আছে তাহা অবিনশ্বর" বর্ণনা করা হয় নাই। তাহাই এখন বর্ণনা করার ইচ্ছা করিতেছি। মোটের উপর এই আয়াতটিতে দুইটি বিষয় জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে—(১) যাহা তোমাদের নিকট আছে নিঃশেষ হইয়া যাইবে, (২) আর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যাহা আছে তাহা চিরস্থায়ী থাকিবে। প্রথম বিষয়টি গতকল্য বর্ণিত হইয়াছে, দ্বিরুক্তির প্রয়োজন নাই। অধিকন্তু তাহা কেহ অস্বীকারও করিতে পারে না। ইহাতে একটু সন্দেহ এই থাকে যে, ইহা অনস্বীকার্য ও স্পষ্ট হইলে তৎসম্বন্ধে খবর দেওয়ারই প্রয়োজন কি ছিল? ব্যাপার এই যে, সংসার এবং তন্মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তুর খেয়াল মানুষের হৃদয় হইতে দূর করাই আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য। আর উহার প্রচলিত পন্থা হইল, বিদূরণীয় পদার্থের কোন দোষের উল্লেখ করা। কিন্তু প্রিয় পদার্থের যেই দোষই বর্ণনা হউক না

কেন—প্রেমিক উহার কোন বিকল্প ব্যাখ্যা করিয়া লয়। ফলে তাহার অনুরাগ নষ্ট হয় না। যেমন, কবি মুতানাব্বী বলিয়াছেনঃ

عَذْلُ الْعَـوَاذِلِ حَوْلَ قَلْبِىْ التَّـائِـهِ ـ وَهَـوَى الْاَحِبَّـةِ مِنْـهُ فِىْ سَوْدَائِـهِ

"তিরস্কারকারীদের তিরস্কার হৃদয়ের চতুষ্পার্শ্বে থাকে, আর প্রিয়জনের মহব্বত অন্তরের অন্তঃস্থলে অবস্থিত।" আল্লাহ্ তা'আলা যদি পৃথিবী ও পার্থিব পদার্থের দোষাবলী বর্ণনা করিতেন, তবে সংসারানুরাগী ব্যক্তিগণ তৎসম্বন্ধে তর্ক জুড়িয়া দিত এবং সংসারানুরাগ অন্তর হইতে দূর হইত না। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা উহার যাবতীয় দোষের মধ্য হইতে এমন একটি দোষ বর্ণনা করিলেন যাহা সম্বন্ধে তাহাদের কোন উত্তরই চলে না। আল্লাহ্ তা'আলার কথার সারমর্ম এই যে, "সংসারানুরাগীগণ! আমি ক্ষণেকের জন্য মানিয়া লইতেছি যে, দুনিয়া মনোরমও বটে, সর্বপ্রকার শান্তিদায়কও বটে, উহার সবকিছুই অর্থপূর্ণ; কিন্তু তাহাতে এমন একটি দোষ রহিয়াছে যাহা সর্বপ্রকারের গুণকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে। দোষটি হইল এই—উহা অস্থায়ী এবং অনিত্য। অস্থায়িত্ব সম্বন্ধে সংবাদ প্রদানের এক কারণ তো এই হইল। আরও একটি কারণ এই যে, পার্থিব পদার্থসমূহের মধ্যে 'অস্থায়িত্ব' ছাড়া অপর কোন দোষ এরূপ নাই, যাহা সর্ব-পদার্থের মধ্যে ব্যাপক; বরং ইহা ভিন্ন আর যেসমস্ত দোষ সেগুলি ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য। সুতরাং প্রত্যেক পদার্থকে অন্তর হইতে দূর করিতে হইলে বিভিন্ন ধারায় বর্ণনা করিতে হইত। যেমন, কোন বস্তু সম্বন্ধে বলা হইত—ইহা মনোরম নহে। কোনটি সম্বন্ধে বলা হইত, ইহা ক্ষতিকর ইত্যাদি। আবার উহাদের মধ্যে কোনটির দোষ প্রমাণসাপেক্ষ এবং কোনটির দোষ প্রমাণের মুখাপেক্ষী নহে। সুতরাং প্রমাণ-সাপেক্ষ দোষাবলী সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইত এবং বিবিধ ধারায় দীর্ঘ-সূত্র আলোচনা সত্ত্বেও তাহা আয়ত্ত করা সম্ভব হইত না এবং ইহার ন্যায় এত অর্থবোধকও হইত না এবং এমন নিরুত্তরকারীও হইত না। সুতরাং এমন একটি গুণ বর্ণনা করিয়াছেন যাহা ব্যাপকও বটে, স্পষ্টও বটে এবং পার্থিব বস্তুসমূহের অনুরাগ অন্তর হইতে দূর করিতে সম্পূর্ণ সক্ষমও বটে। সোবহা-নাল্লাহ্! কেমন ব্যাপক অথচ সংক্ষিপ্ত বাক্য! মোটকথা, এই গুণটি অনস্বীকার্য হওয়া সত্ত্বেও কেবল দুনিয়ার মহব্বত অন্তর হইতে বিদূরিত করার উদ্দেশ্যেই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

এস্থলে পুনরায় কেহ এরূপ প্রশ্ন করিতে পারে যে, আসমান-যমীন অস্থায়ী নহে? ইহার উত্তর প্রথমতঃ এই যে, জ্ঞানসম্মত প্রমাণ দ্বারা ইহাদের অস্থায়িত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কালামে আমাদের আভ্যন্তরীণ রোগের চিকিৎসা বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ, যে-সমস্ত পদার্থের সহিত আমাদের মহব্বতের সম্পর্ক রহিয়াছে উহাদের নিন্দাবাদ দ্বারা উক্ত মহব্বত-সম্পর্ককে বিদূরিত করিয়াছেন। বস্তুত আসমান এবং যমীনের সহিত আমাদের মহব্বত-সম্পর্ক নাই।

এবাদত করার স্বাভাবিক কারণঃ অবশ্য মহব্বত-সম্পর্ক না থাকিলেও নানাবিধরূপে আসমান-যমীনের সহিত আমাদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে। আমরা স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আসমান-যমীন বরং অন্যান্য যাবতীয় পদার্থেরই মুখাপেক্ষী। কিন্তু আসমান-যমীন আমাদের মুখাপেক্ষী নহে। মানুষ না হইলে পৃথিবীর কোন পদার্থেরই কোন ক্ষতি হইত না। এককালে মানুষ ছিল না; অথচ আসমান, যমীন, গাছপালা, পাথর এবং সর্বপ্রকারের প্রাণী সবকিছুই ছিল, ধর্মবিহীন এবং ধর্মানুসারী সকলেই এ কথা স্বীকার করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে এমন কোন কাল অতীত হয় নাই

যাহাতে মানুষ ছিল, কিন্তু অন্য কোন পদার্থ ছিল না। পৃথিবীর সমস্ত পদার্থের কথাও স্বতন্ত্র, কোন একটি পদার্থের অভাব ঘটিলেও মানুষের জীবন দুর্বিষহ হইয়া পড়িবে। অতএব, বুঝিতে হইবে—সমস্ত পদার্থই মানুষের প্রয়োজনীয়। কিন্তু মানুষ অপর কোন পদার্থের প্রয়োজনীয় বলিয়া দেখা যায় না। অর্থাৎ, মানুষ না হইলে কোন পদার্থের কোন ক্ষতি হয় না অথচ পার্থিব পদার্থসমূহের কোন একটি অভাবে মানুষ হয়তো ধ্বংসপ্রাপ্তের ন্যায় হইয়া যাইবে। আবার ইহাও দেখা যায় যে, মানুষ ভিন্ন অন্যান্য পদার্থ একে অন্যের মুখাপেক্ষী। অর্থাৎ, প্রত্যেকে মুখাপেক্ষীও বটে এবং মুখা-পেক্ষিতও বটে। অথচ মানবজাতি কেবল পরের মুখাপেক্ষীই বটে, কিন্তু কোন পদার্থই তাহাদের মুখাপেক্ষী নহে। ব্যাপার যখন ইহাই, তখন মানুষ ভিন্ন অন্যান্য যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু মানুষ সৃষ্টির কোন উদ্দেশ্যই বুঝা যায় না যে, এই জাতিকে কোন্ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। আবার ইহা তো সত্য কথা যে, ইহাদের সৃষ্টি (নাউযুবিল্লাহ্) উদ্দেশ্যহীন এবং অনর্থক নহে এবং সৃষ্ট পদার্থসমূহের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মানুষের সৃষ্টি নহে। সুতরাং অবশ্যই বুঝা যায়, সৃষ্টিকর্তা নিজের কোন মহৎ উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষ সৃষ্টিকর্তার কাজে লাগার অর্থ এই নহে যে, তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার কোন কাজ করিবে। আল্লাহ্ নিজ কাজে-কর্মে কখনও কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন; বরং তিনি সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের সেব্য এবং নিজের সেবক হওয়ার উদ্দেশ্যে মানবজাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। পরিতাপের বিষয়, আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যের বিপরীত এমনভাবে চলিয়াছি যে, সৃষ্টিকর্তাকে ত্যাগ করিয়া সৃষ্টজীবের সেবক হইয়া পড়িয়াছি। কেহ মাতার সেবক, কেহ সন্তানের সেবক, কেহবা দালান কোঠার, কেহবা বাগ-বাগিচার, কেহবা গবাদিপশুর সেবক হইয়াছি এবং ইহারই নাম দিয়াছি উপার্জন করা এবং খাওয়া। হাঁ, এক অর্থে ইহাকে উপার্জনও বলা যাইতে পারে। যেমন, মেথর উপার্জন করিয়া থাকে—তদ্রূপ আমরাও উপার্জন করি আর খাই। আমরা যেন মেথর হইয়া পড়িয়াছি। আল্লাহ্ পাক মানুষকে মন্ত্রীত্ব প্রদান করিয়াছিলেন, প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু মানুষ তাহা হইতে বিমুখ হইয়া সেবক সাজিয়াছে। কি দুর্ভাগ্য! সারা জগতের সেব্য হওয়ার জন্য তাহার সৃষ্টি, অথচ সে দুনিয়ার যাবতীয় পদার্থের সেবায় নিজের সময় নষ্ট করিতেছে। অতএব, প্রমাণ হইল যে, মানুষ খোদার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। খোদার উপকারের জন্য নহে; বরং তাঁহার সেবা ও এবাদত করিয়া নিজে উপকৃত হওয়ার জন্য।

ইহা অপ্রাসঙ্গিকরূপে মধ্যস্থলে ব্যক্ত করিলাম, আমার মূল বক্তব্য এই ছিল যে, যদিও মানুষ নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে সকল পদার্থের মুখাপেক্ষী, কিন্তু অন্যান্য ব্যবহার্য পদার্থসমূহের সহিত যেমন তাহার মহব্বত-সম্পর্ক বিদ্যমান, আসমান-যমীনের সহিত তেমন সম্পর্ক নাই। অথচ এই সমস্ত পদার্থের অস্থায়িত্ব স্পষ্ট ব্যাপার। আসমান-যমীনের অস্থায়িত্বের কথা যদিও এই আয়াতে উল্লেখ হয় নাই, তাহাতে আয়াতের আসল উদ্দেশ্যে কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। বিচিত্র নহে যে, ما عندكم "তোমাদের হস্তস্থিত বস্তুসমূহ" বলিতে আমাদের এইসব প্রিয় পদার্থসমূহই উদ্দেশ করা হইয়াছে। মোটকথা, কোরআন শরীফ একটি রূহানী চিকিৎসাগ্রন্থ। চিকিৎসাগ্রন্থে রোগ ও সুস্থতার প্রেক্ষিতে আলোচনা হইয়া থাকে। সুতরাং যেসমস্ত পদার্থের সহিত আমাদের আন্তরিক মহব্বত রহিয়াছে, কেবল সেগুলির অস্থায়িত্ব বর্ণনাই লক্ষ্যস্থল। এই কারণেই ينفد অর্থাৎ, 'নিঃশেষ হইয়া যাইবে' বাক্যে উক্ত প্রিয় বস্তুসমূহই অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। যমীন এবং আসমান সম্বন্ধে কোন আলোচনাই এখানে থাকিবে না। অতএব, আসমান-যমীন যদি স্থায়ী পদার্থও হয়, তথাপি

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের কোন হানি হইবে না। কিন্তু অন্যান্য প্রমাণের সাহায্যে ইহাদের অস্থা-য়িত্ব সপ্রমাণিত রহিয়াছে। মানুষের বাসগৃহ, ধন-সম্পত্তি এবং সন্তান-সন্ততির প্রতিই মনে আকর্ষণ থাকে, সুতরাং ماعندكم বলিতে সেই সমস্ত পদার্থই উদ্দেশ্য হইবে। যেমন, মধ্যস্থলে আল্লাহ্ তা'আলা একই আয়াতে এই সমস্ত পদার্থের ফিরিস্তিও বর্ণনা করিয়াছেনঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاۤءُكُمْ وَ اَبْنَاۤءُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَاۤ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ ○

"হে মোহাম্মদ (দঃ), আপনি বলিয়া দিন, যদি তোমাদের বাপ-দাদা, তোমাদের পুত্র, প্রপৌত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের পরিবার, তোমাদের উপার্জিত ধন-সম্পদ এবং তোমাদের ব্যবসায়, যাহা মন্দা পড়িবার আশঙ্কা কর এবং তোমাদের বাসগৃহ যাহা তোমরা পছন্দ করিতেছ—এই সমুদয় আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল অপেক্ষা এবং তাঁহার রাস্তায় যুদ্ধ করা অপেক্ষা তোমাদের নিকট অধিকতর প্রিয় হয়, তবে প্রতীক্ষা করিতে থাক, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম আসিয়া পৌঁছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা অবাধ্যগণকে হেদায়ত করেন না।" আর এক স্থানে বলিতেছেনঃ

اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَهَا وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ○

"তোমরা কি প্রত্যেক উচ্চস্থানে এক নিদর্শন স্থাপন করিতেছ? যাহাতে খেল-তামাশা করিতেছ এবং সুদৃঢ় অট্টালিকা নির্মাণ করিতেছ? যেন ইহাতেই চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে।"

বস্তুত মানুষ এমন প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করে, যাহাতে মনে হয় যে, তাহারা সকলে এখানেই বাস করিবে এবং বড় আমোদ-আহ্লাদে দিনাতিপাত করিবে। কদাচ কল্পনাও হয় না যে, এখান হইতে অন্যত্র যাইতে হইবে। কবি কেমন সুন্দর বলিয়াছেনঃ

اَلَا يَا سَاكِنَ الْقَصْرِ الْمُعَلّٰى ـ سَتُدْفَنُ عَنْ قَرِيْبٍ فِى التُّرَاب

لَهٗ مَلَكٌ يُنَادِىْ كُلَّ يَوْمٍ ـ لِدُوْا لِلْمَوْتِ وَابْنُوْا لِلْخَرَاب

قَلِيْلٌ عُمْرُنَا فِىْ دَارِ دُنْيَا ـ وَمَرْجِعُنَا اِلٰى بَيْتِ التُّرَاب

"স্মরণ রাখিও, হে উচ্চ অট্টালিকার অধিবাসী! শীঘ্রই তুমি মাটির নীচে প্রোথিত হইবে। তাঁহার একজন ফেরেশ্‌তা আছে, সে প্রত্যেক দিন সম্বোধন করিয়া বলে, মৃত্যুর জন্য বাঁচিয়া থাক এবং ধ্বংস হওয়ার জন্য গৃহ নির্মাণ কর, পৃথিবীতে আমাদের আয়ুষ্কাল অতি অল্প এবং আমাদের সকলেরই গন্তব্যস্থান মাটির গৃহ।"

নবজাত শিশুর কর্ণে আযান দেওয়ার রহস্যঃ জনৈক সূক্ষ্মদর্শী লিখিয়াছেনঃ নবজাত শিশুর কর্ণে আযানের শব্দ উচ্চারণ করার মধ্যে রহস্য এই যে, তাহাকে শুনান হয়—এই আযানকে নামাযের একামত মনে কর। এখন হইতে জানাযার নামাযের প্রতীক্ষায় থাক। এতদ্ভিন্ন আরও একটি রহস্য আছে—আযান এবং তাক্‌বীরে আল্লাহ্‌র নাম রহিয়াছে। নবজাত শিশুর কর্ণে আযান

ও একামতের শব্দগুলি অর্থাৎ, আল্লাহ্র নাম এই জন্য উচ্চারণ করা হয়, যেন ঈমানের যোগ্যতা ও শক্তি সবল হয়, শয়তান তাহা হইতে দূর হইয়া যায়। উভয় যুক্তির মধ্যে যেন এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, সংসারে অসতর্ক থাকা উচিত নহে। কিন্তু আমাদের অসতর্কতা চরমে পৌঁছিয়াছে। এতটুকু বিষয়ের খেয়ালও আমাদের নাই।

সূক্ষ্মদর্শীদের উপহাস ঃ যাঁহাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত, তাঁহারা সংসারের যাবতীয় পদার্থকে তুচ্ছ মনে করেন; বরং নিজেদের অস্তিত্বকে এমনিভাবে বিলীন করিয়া দিয়াছেন যে, নিজেদেরকে জীবিতই মনে করেন না; বরং মৃত বলিয়া মনে করেন। কোন একজন বুযুর্গ লোক নিজের সন্তান-গণকে বলিতেন ঃ আফসোস, ইহারা এতীম হইয়া গেল। আমাদের আকাঙ্ক্ষা এবং আমাদের সুদৃঢ় ঘর-বাড়ী দেখিয়া চিন্তাশীল লোকগণ হাস্য করেন এবং এ সমস্ত ঘর-বাড়ী নির্মিত হওয়ার পূর্বেই তাঁহাদের দৃষ্টিতে ইহাদের ধ্বংস এবং অস্থায়িত্ব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে।

বালিকারা একত্রিত হইয়া খেলার ছলে বালির ঘর নির্মাণ করে। অতঃপর তাহাদেরই একজন উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে অন্যান্য বালিকারা তাহার সহিত ঝগড়া করে—তুই আমাদের ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিস্। আমরা বালিকাদের এই কাণ্ড দেখিয়া হাসিয়া থাকি এবং মন্তব্য করি, "ইহাও একটা ঘর! ইহা ভাঙ্গার জন্য আবার ঝগড়া।" এইরূপে আল্লাহ্ওয়ালাগণ আমাদের পাকা বাড়ী-ঘর এবং তাহা লইয়া আমাদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ দেখিয়া হাসেন। তাহারা এ সমস্ত পাকা বাড়ী-ঘর ধ্বংস হওয়াকে বালিকাদের বালির ঘর ধ্বংস হওয়ার সমতুল্যই মনে করিয়া থাকেন। আপনারা স্বচক্ষে দেখিতেছেন, কত বিরাট বিরাট অট্টালিকাসমূহ জনশূন্য অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। ইহাতে অবস্থানকারীদের মনে কত বড় বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং তাহারা কত রঙ্গিন রঙ্গিন স্বপ্ন দেখিতে-ছিল; কিন্তু তাহাদের সর্বপ্রকারের আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে।

যেমন, শেখ চুল্লীর ঘটনা—পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল, এই তেলের কলসীটি বহন করিয়া লও, তোমাকে এক পয়সা দিব। শেখ চুল্লী কলসীটি বহন করিয়া লোকটির পাছে হাঁটিতে হাঁটিতে কল্পনা করিতে লাগিল—এই একটি পয়সা দ্বারা একটি মুরগীর ডিম ক্রয় করিব। তাহা বিক্রয় করিয়া আবার ডিম ক্রয় করিব। এইরূপে অনেক পয়সা হইলে তদ্দ্বারা একটি মুরগী খরিদ করিব। মুরগী অনেক হইয়া গেলে তাহা বিক্রয় করিয়া বকরী খরিদ করিব। আবার বকরী অনেক হইলে তাহা বিক্রয় করিয়া মহিষ এবং মহিষ বিক্রয় করিয়া ঘোড়া এবং ঘোড়া বিক্রয় করিয়া হাতী ক্রয় করিব। অতঃপর বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া এক উযীর কন্যাকে বিবাহ করিব। তখন আমার সন্তান জন্মিবে এবং সে বলিবে, আব্বা আব্বা! আমাকে পয়সা দাও, আমি তাহাকে ধমক দিয়া বলিব, "দূর হ।" এই কথাটি উচ্চারণ করিতেই মাথা নড়িয়া উঠিল এবং মাথার উপর হইতে তেলের কলসীটি পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল। লোকটি তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। তখন শেখ ছাহেব বলেন ঃ খোদার বান্দা! তোমার তো শুধু এক কলসী তেলই নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু আমার সমস্ত পরিবারই ধ্বংস হইয়া গেল।

আমরা শেখ চুল্লীর অলীক কল্পনার কথা শুনিয়া হাসিয়া থাকি; কিন্তু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, আমাদের প্রত্যেকেই শেখ চুল্লী। দিবারাত্রি কল্পনা করিয়া থাকি, আমার বিবাহ হইয়া গেলে কি উত্তম হইত! বিবাহ হইলে আবার সন্তানের আকাঙ্ক্ষা হয়, সন্তান হইলে আবার সন্তানের সন্তান কামনা করিতে থাকি। এরূপ অবস্থার মধ্যে মৃত্যু আসিয়া পড়ে এবং কামনা অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। কবি কি সুন্দর বলিয়াছেন ঃ

وَمَا قَضٰى اَحَدٌ مِّنْهَا لُبَانَتَهٗ ـ لَا يَنْتَهِىْ اَرْبٌ اِلَّا اِلٰى اَرْبٍ

"পৃথিবীতে কোন মানুষই নিজের প্রয়োজন মিটাইতে পারে নাই। এক প্রয়োজন শেষ হইলে আর এক প্রয়োজন পাছে লাগিয়া যায়।

ধার্মিক লোকের আত্মপ্রবঞ্চনাঃ এ পর্যন্ত যাহা বর্ণনা করিলাম, তাহা হইল ধর্ম সম্বন্ধে বে-পরোয়া লোকের অবস্থা, আর যাহারা ধার্মিক নামে পরিচিত এবং যাহাদের আখেরাত সম্বন্ধে কিছু চিন্তা আছে, তাহারা এরূপ প্রতিশ্রুতির মধ্যে লিপ্ত আছে যে, অমুক কার্যটি সমাধা করিয়া লই, অতঃপর সবকিছু ত্যাগ করিয়া কেবল 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' করিব। কোন কবি এ সম্বন্ধে বলেনঃ

هر شبے گویم که فردا ترک ایں سودا کنم ـ باز چوں فردا شود امروز را فردا کنم

"প্রত্যেক রাত্রে এরূপ বলিয়া থাকি, আগমীকল্য এই কল্পনা ছাড়িয়া আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা আরম্ভ করিব? আবার পরবর্তী দিন আসিলে ঠিক ইহাই বলি যে, আগামীকল্য ত্যাগ করিব।" এইরূপে সমস্ত আয়ুই শেষ হইয়া যায়; মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইলে তখন অবস্থা এরূপ দাঁড়ায়—যাহা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেনঃ

لَوْلَآ اَخَّرْتَنِىْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَ اَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

"অর্থাৎ, মৃত্যু উপস্থিত হইলে মানুষ বলিবে; প্রভো! সামান্য সময়ের জন্য আমাকে অবকাশ দেওয়া হইলে আমি দান-খয়রাত করিয়া নেক্‌কার লোকদের দলভুক্ত হইতে পারিতাম।" কিন্তু আল্লাহ্ বলেনঃ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا "আল্লাহ্ কোন প্রাণীকেই অবকাশ প্রদান করিবেন না—যখন উহার নির্দিষ্ট সময় আসিয়া পৌঁছিবে।" অর্থাৎ, সে নবীই হউক আর ওলীই হউক, নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হইয়া গেলে আর অবকাশ প্রাপ্ত হইবে না। তখন প্রত্যেক মুমূর্ষু ব্যক্তি কামনা করিবে—"সারা দুনিয়ার ধনভাণ্ডার আমার হইলে তাহার বিনিময়েও বস্তুত একটি দিনের অবকাশ গ্রহণ করিতাম।" কিন্তু তাহা সম্ভব হইবে না।

হযরত সুলায়মানের চেয়ে বড় কে আছে? বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদ নির্মাণকালে তাঁহার মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি নিবেদন করিলেনঃ "ইয়া আল্লাহ্! অন্তত মসজিদটি সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত আমাকে সময় দিন; নচেৎ ইহা অসমাপ্তই থাকিয়া যাইবে।" নির্দেশ আসিলঃ "সময় দেওয়া সম্ভব নহে, তবে মসজিদের কাজ সমাধা হইয়া যাইবে। তুমি লাঠি ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাক।" তিনি তাহাই করিলেন। এই অবস্থায়ই তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। তাঁহার প্রাণহীন দেহকে দণ্ডায়মান দেখিয়া জ্বিনেরা মনে করিত, স্বয়ং হযরত সুলায়মান দণ্ডায়মান আছেন, কাজেই মসজিদের কাজ অবিরাম চলিতে লাগিল এবং সমাপ্ত হইল। এক বৎসরের মধ্যে লাঠিটিকে উই পোকা খাইয়া ফেলিলে প্রাণহীন দেহ পড়িয়া গেল এবং হিসাব করিয়া দেখা গেল—মৃত দেহটি এক বৎসর পর্যন্ত প্রাণহীন অবস্থায় দাঁড়াইয়া ছিল।

দেখুন, সুলায়মান নবী ছিলেন এবং কাজ ছিল মসজিদ নির্মাণের, তবুও সময় প্রদান করা হয় নাই। অতএব, যদি এই অপেক্ষাই করিতে থাকেন যে, অমুক কাজ সম্পন্ন হইলে আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যানে মনোযোগ প্রদান করিব, তবে স্মরণ রাখিবেন, এমন সময় কখনও আসিবে না।

ইহার মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দেওয়াই দুনিয়ার ঝামেলা হইতে পরিত্রাণলাভের একমাত্র উপায়। দুনিয়া হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার দিন আমরা বহু দূরবর্তী বলিয়া মনে করি; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা অতি নিকটবর্তী। চিন্তা করিয়া দেখুন, আমাদের পিতা-পিতামহ কোথায় গেলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তো উদীয়মান পুত্র, পৌত্রও চোখের সামনেই চলিয়া যায়। আর যদিও আমাদের মৃত্যুর পরেই সন্তানের মৃত্যু হয়, তাহাতেই বা ফল কি? আমাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তো যাবতীয় কামনা-বাসনার পরিসমাপ্তি ঘটিল। মানুষ নিজের নাম জীবিত থাকার জন্য সন্তানের কামনা করিয়া থাকে। কিন্তু নামের প্রকৃত তথ্য এই যে, বাপ-দাদা পর্যন্ত সকলেরই স্মরণ থাকে, এই ব্যক্তি অমুকের পুত্র, অমুকের নাতি। কিন্তু ইহার পরবর্তী স্তরে প্রপিতামহ এবং তদুর্ধ্বতন পুরুষের নাম জিজ্ঞাসা করিলে অপরে তো দূরের কথা, স্বয়ং সন্তানেরাই বলিতে পারে না। মোটকথা, দুনিয়া কিছুই নহে, সমস্তই কল্পনা এবং কামনা, প্রকৃত প্রস্তাবে উহা কোন বস্তুই নহে। কোন একটি জীবনচরিতে কবরবাসীদের লড়াইয়ের কথা লিখিত আছে। আপনারা কখনও হয়তো মৃত লোক-দের লড়াইয়ের কথা শ্রবণ করেন নাই। কিন্তু এই কাহিনী হইতে জানিতে পারিবেন। কোন এক কবরস্থানে একটি কবর গাত্রে লিখিত ছিলঃ "আমি সেই মহাপুরুষের পুত্র, বায়ু যাঁহার অধীন ছিল।" ইহাতে বুঝা গেল, এই ব্যক্তি হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর সন্তান। আর একটি কবরে লিখিত ছিল, সে সুলায়মান (আঃ)-এর পুত্র নহে; বরং এক কর্মকারের পুত্র, যাহার নিকট 'হাপর' থাকে। যাক, ইহা একটি কৌতুক কথা ছাড়া আর কিছুই নহে! বস্তুত বায়ু যাঁহার অধীন ছিল— অর্থাৎ, সুলায়মান (আঃ), তিনিও আজ জগতে নাইঃ

که برباد رفتے سحر گاه و شام ـ سریــر سلیمــان علیــه السلام
بآخــر نه بینی که بربــاد رفت ـ خنـك آنکـه باعدل و باداد رفت

"সুলায়মানের (আঃ) সিংহাসন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে বায়ুর উপর চলিত। পরিশেষে তুমি দেখিয়াছ যে, তাহাও ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সেই ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান, যিনি ন্যায়নিষ্ঠা ও ন্যায়-বিচারের সহিত ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।"

যদি কামনানুযায়ী সন্তান বংশ পরম্পরায় হইতেও থাকে, পরিশেষে এই পারম্পর্যেরও একদিন অবসান ঘটিবে। আমাদের চোখের সম্মুখেই কত বড় বড় সমাজ এবং বংশের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। সংসারে দীর্ঘায়ু ব্যক্তিকেই ভাগ্যবান মনে করা হয়। অথচ দীর্ঘায়ু ব্যক্তিকে অধিক বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। কেননা, তাহার সম্মুখে তাহার যুবক যুবক আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু ঘটে। সেই শোকের আগুন তাহাকে পোহাইতে হয়। অবশ্য এই বিপদ তাহাদেরই সহিতে হয়, যাহাদের অন্তর সংসারের প্রতি আকৃষ্ট থাকে।

আল্লাহ্ওয়ালাদের পেরেশানী নাইঃ যাঁহারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আকৃষ্ট, কোন বিপদই তাঁহাদিগকে দুঃখিত এবং অধীর করিতে পারে না। আমার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, তাঁহাদের অন্তরে কোন দুঃখই হয় না। স্বাভাবিক দুঃখ অবশ্যই হইয়া থাকে, কিন্তু সেই দুঃখে তাঁহারা সীমা লঙ্ঘন করেন না। আদবের খেলাফ কিংবা অভিযোগের কোন শব্দ তাঁহাদের মুখ হইতে নির্গত হয় না। তাঁহাদের হৃদয় সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। বাহ্যদৃষ্টিতে এখানে সন্দেহ হয়, ইহা কেমন করিয়া সম্ভব যে, দুঃখও হইয়া থাকে এবং সন্তুষ্টও থাকে? একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই প্রশ্নের উত্তর আমি বুঝাইতেছি। মনে করুন, এক ব্যক্তির দেহে ফোড়া উদ্‌গত

হইয়াছে। সে ভীষণ কষ্ট পাইতেছে, চিকিৎসক পরামর্শ দিলেন, ইহাতে অস্ত্রোপচার না করিলে মূল বিনষ্ট হইবে না। তদনুযায়ী অস্ত্রোপচারককে ডাকিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমতি দেওয়া হইল, "ইহা কাট।" অস্ত্রোপচারক অস্ত্র প্রয়োগ করিতেছে, রোগী কষ্টও পাইতেছে, কিন্তু মনে মনে বেশ সন্তুষ্ট, এখনই আরাম হইবে, মাঝখানে যদি চিকিৎসক অস্ত্র প্রয়োগ বন্ধ করিয়া দেয় কিংবা চালাকি করিয়া কোথাও চলিয়া যায়, তখন রোগী বলে, অস্ত্র কেন সরাইয়া লইলে? আমার কষ্ট ও ভয়ের কারণে তুমি নিজের কাজ বন্ধ করিও না। আমাকে ভয় করিতে দাও, রোগ তো আরোগ্য হইবে।

আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের দৃষ্টান্তও ঠিক এইরূপই বটে। পার্থিব বিপদ-আপদে তাঁহারা স্বাভাবিক দুঃখ-কষ্টও অনুভব করেন, কিন্তু অন্তরে সন্তুষ্ট থাকেন। "প্রকৃত মাহ্‌বুব আমাদের জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতেই আমাদের মঙ্গল এবং হেকমত নিহিত আছে!

بدرد و صاف تراحـكـم نيـست دم دركش ـ كه آنچه ساقى ما ريخت عين الطاف ست

"শান্তি ও অশান্তি এবং সুখ ও দুঃখের. বিষয় সিদ্ধান্ত করার কোন অধিকার তোমার নাই। প্রকৃত মাহবুবের তরফ হইতে যাহাকিছু প্রদত্ত হয় তাহাই যথার্থ মেহেরবানী।"

আল্লাহ্‌ওয়ালা এবং দুনিয়াদারের মধ্যে এই পার্থক্যের কারণ এই যে, আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ খোদাকে খোদা মনে করেন। (নাউযুবিল্লাহ্) কুটুম্ব মনে করেন না। পক্ষান্তরে দুনিয়াদারগণের কার্যকলাপে মনে হয়, তাহারা আল্লাহ্‌কে নিজের ঋণী কিংবা আত্মীয় মনে করিয়া থাকে। কামনা বা আক্ষেপ প্রকাশ করা খোদার সহিত লড়াই করারই নামান্তর; কিন্তু যেহেতু আমরা সংসারাসক্ত এবং আখে-রাত হইতে অসতর্ক, সুতরাং এই লড়াইয়ের জন্য কোন শাস্তি হইবে না। অবশ্য ইহা বেআদবী, ধৃষ্টতা এবং একগুঁয়েমী হওয়াতে কোন সন্দেহ নাই। অনেক গোঁয়ার লোক এমন আছে যে, হাকীমের সামনেও অনর্থক কথা বলিয়া ফেলে এবং হাকীম তাহাদের স্বল্প বুদ্ধির প্রেক্ষিতে তাহা-দিগকে ক্ষমা করিয়া থাকেন। কিন্তু বিবেক তো তাহাকে ধৃষ্টতাই মনে করিবে।

স্ত্রীজাতির বাচালতাঃ এ সম্পর্কে একটি ঘটনা স্মরণ হইয়াছে। এক তহ্‌সীলদারের বাড়ীতে জনৈক গেঁয়ে স্ত্রীলোক এবং তাহার সঙ্গে একটি বালক আসিল। তহ্‌সীলদার জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে! এই ছেলেটি তোমার কি হয়? সে বলিল, "হুযূর, এইটি আমার সতাই বেটা।" তহ্‌সীলদার বলিলেন, "সতাই বেটা কাহাকে বলে?" সে উত্তর করিল, মনে করুন, আপনার পিতার মৃত্যুর পর আপনার মাতা আমার পাণি গ্রহণ করিলেন এবং আপনি তাহার সহিত আমার গৃহে গেলেন। এমতাবস্থায়, আপনি আমার সতাই ছেলে। তহ্‌সীলদার ইহা শুনিয়া নীরব হইয়া গেলেন। এইরূপ মেয়েলোকেরা বড়ই মুখরা হইয়া থাকে, তাহাদের মুখ হইতে অনেক সময় এই শ্রেণীর কথা নির্গত হইয়া থাকে। কোন সময় আমি তাহাদিগকে টুকিলে উত্তর দিয়া থাকে, আমাদের কল্পনায়ও কোন সময় উদয় হয় নাই যে, এই কথা ধৃষ্টতাজনক হইতে পারে। তাহাদের কথা সত্য এবং এই কারণেই আশা করা যায় যে, তাহারা ক্ষমা প্রাপ্ত হইবে। তথাপি ইহা বেআদবী ও মূর্খতা বলিয়া অবশ্যই গণ্য হইবে। এই শ্রেণীর কথা শুনিয়া আমার খুবই ঘৃণা ও ভয় হয় এবং দর্শকরা অবাক হইয়া পড়েন যে, ইহা তো এমন কিছু দূষণীয় নহে? আবার তাহাদিগকে দোষ ধরিয়া বুঝাইয়া দিলে কোনই ফল হয় না; বরং বাক-বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়া পড়ে।

এই শ্রেণীর কথা আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের মুখে কখনও আসে না। তাঁহাদের উপর যত বিপদই আসুক না কেন, সকল অবস্থাতেই তাঁহারা ছবর ও শোকর করিয়া অদৃষ্টের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুক্রা হযরত ইব্রাহীমের এন্তেকাল হইলে হুযূর (দঃ) কেবল অশ্রুনেত্রে এতটুকু বলিয়াছিলেনঃ اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا اِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ "হে ইব্রাহীম! তোমার বিয়োগে আমরা দুঃখিত।" এমন খেদ করেন নাই। ইহার বয়সই আর কত হইয়াছিল! সে দুনিয়ার কিই-বা দেখিয়াছে!! বৃদ্ধকালে আমাকে এই শোকাগুনে দগ্ধ হইতে হইল!!! এ সমস্ত উক্তির প্রকাশ্য অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ইহা একটি অসঙ্গত ব্যাপার ঘটিয়াছে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা যেন (নাউযুবিল্লাহ্) অসঙ্গত কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন। আরও বিচিত্র এই যে, তাহাদের মধ্যেকার জ্ঞানীরা তাহাদিগকে বাধাও দেয় না। এই কারণেও আমি মেয়েলোকদের সমাবেশ পছন্দ করি না। এই সমস্ত ত্রুটি তাহাদের সমাবেশের কারণেই হয়।

দেখুন, আপনাদের সম্মুখে যদি কেহ আপনাদের পিতাকে মন্দ বলিতে আরম্ভ করে, তবে আপনাদের নিকট তাহা অসহনীয় হইবে না কি? এইরূপে আপনাদের মধ্যেও মর্যাদাবোধ থাকা উচিত। জ্ঞানীদের সম্মুখে কেহ অশোভন উক্তি করিলে তৎক্ষণাৎ ধমকাইয়া দেওয়া উচিত, "সাবধান! কি বলিতেছ? এই জাতীয় কথা পুনরায় মুখে আনিও না"

ইহার কারণ—তাহাদের হৃদয়ে আল্লাহ্র মহব্বত নাই। অন্যথায় এমন উক্তি কখনও মুখে আনিত না। দেখুন, স্নেহের পুত্র যদি কোন বস্তু নষ্ট করিয়া ফেলে, তাহার কোন পরোয়াই আপনারা করেন না। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তাহাদের মনে কিছুমাত্র মহব্বত থাকিলেও তাহারা বলিতঃ "সহস্র পুত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য কোরবান হউক।" ইহার প্রমাণস্বরূপ মনে করুন, কোন মেয়েলোকের পুত্র টাকা হারাইয়া ফেলিলে যদি মেয়েলোকটি পুত্রকে মারধর করে, তবে লোকে তাহাকে বলে, "মেয়েলোকটি কেমন নিষ্ঠুর! সে পুত্রের চেয়ে টাকা-পয়সাকেই অধিক ভালবাসে।" অনুরূপ এখানেও মনে করুন। সন্তান বিয়োগে এবম্বিধ ধৃষ্টতামূলক উক্তি করিলে মনে করিবেন, মৃত সন্তানের মাতা-পিতা বা আত্মীয়-স্বজনের মহব্বত মৃত ব্যক্তির জন্যই বটে, আল্লাহ্ তা'আলার সহিত কোন মহব্বত নাই।

এক স্ত্রীলোকের বাপ, ভাই ও ছেলে হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যুদ্ধে গিয়াছিল। যোদ্ধগণের প্রত্যাবর্তনের সময়ে সে যুদ্ধের খবর লইবার জন্য মদীনার বাহির প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। জনৈক আগন্তুক ব্যক্তি বলিল, "তোমার বাপ-ভাই সকলেই শহীদ হইয়াছেন। স্ত্রীলোকটি অস্থির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলঃ "আগে বল, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) জীবিত আছেন কি না?" আগন্তুক লোকেরা উত্তর করিল, "হাঁ, তিনি জীবিত আছেন।" স্ত্রীলোকটি তখন বলিলঃ "তবে আর কাহারও মৃত্যুর পরোয়া আমি করি না।"

পয়গম্বরগণের চেয়ে আল্লাহ্ তা'আলার হক্ আরও অধিক। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ইহা অপেক্ষা অধিক মহব্বত হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় মহব্বত নাই, অন্যথায় এমন ধৃষ্টতা ও বেআদবীমূলক উক্তি মুখে তো দূরের কথা, মনেও আসিত না। অস্ত্রোপচারক অস্ত্রোপচার আরম্ভ করিলে যেমন কেহ এরূপ অভিযোগ করে না যে, "তুমি কেমন মানুষ হে? আমার দেহ হইতে এত রক্ত ও পুঁজ বাহির করিয়া দিলে" যদি বলে, তবে বুঝিতে হইবে যে, লোকটি অস্ত্রোপচারে সম্মত ছিল না।

কোন কোন মেয়েলোক বলিয়া থাকে, "আপনি যাহাকিছু বলিতেছেন, তাহা বুযুর্গ লোকের কাজ। আমরা দুনিয়াদার, আমাদের দ্বারা তাহা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে?" আমি বলি, তোমাকে

বুযুর্গ হইতে কে নিষেধ করিয়াছিল? তুমি বুযুর্গ হইয়া যাও। তুমি দুনিয়াদার কেন সাজিতেছ? রূহ্‌কে খাদ্য প্রদান কর, এমনিই বুযুর্গ হইয়া যাইবে। রূহের খাদ্য—আল্লাহুর নাম লওয়া, আল্লাহ্‌র প্রদত্ত নেয়ামত সম্পর্কে চিন্তা করা এবং মৃত্যুকে স্মরণ করা। এ সমস্ত খাদ্য গ্রহণ করিতে থাক, তখন দেখিবে দুই সপ্তাহেই কোথা হইতে কোথায় পৌঁছিয়াছ। তোমরা তো অহরহ দুনিয়ার চিন্তাই করিতেছ। যেমন, গর্তে অবস্থানকারী জন্তু মূত্রে অবস্থানকারী ব্যাঙ মলমূত্রই ভক্ষণ করিয়া থাকে। সে কেমন করিয়া উপলব্ধি করিবে সমুদ্র কেমন বস্তু? (কূপের ব্যাঙ কি করিয়া সমুদ্রের খবর রাখিবে?) তোমাদের সারাজীবনই দুনিয়ার ধ্যান-চিন্তায় কাটিয়াছে। কেহ উপদেশ প্রদান করিলেও তাহার সহিত তর্ক বাধাইয়াছ। যেমন, উক্ত মলমূত্রে অবস্থানকারী ব্যাঙকে কেহ পরিষ্কার পানি দ্বারা ধুইয়া দিলেও সে চেঁচাইতেই থাকে।

এক মেথর আতর বিক্রেতাদের মহল্লায় গিয়াছিল। আতরের সুগন্ধি তাহার নাকে প্রবেশ করিতেই সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। কেননা, সুঘ্রাণ গ্রহণের সুযোগ তাহার জীবনে কখনও ঘটে নাই। তাহার সারাজীবন পায়খানা বহন করিয়াই কাটিয়াছে। কেহ তাহার নাকের কাছে 'লাখ-লাখ' নামক তীব্র সুগন্ধযুক্ত দ্রব্য আনিয়া ধরিল। কেহবা তাহার নাকে আতর লাগাইয়া দিল। কিন্তু ইহাতে তাহার সংজ্ঞাহীনতা বাড়িল বৈ কমিল না। ইতিমধ্যে তাহার ভাই আসিল এবং অবস্থা দেখিয়া উপস্থিত লোকদিগকে বলিলঃ আপনাদের এই প্রচেষ্টায় কোনই ফল হইবে না। আপনারা ক্ষান্ত হউন, আমি ইহার চিকিৎসা করিব। একথা বলিয়াই সে কোন স্থান হইতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ পায়খানা আনিয়া তাহার নাকে লাগাইয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মেথর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল।

এইরূপে পায়খানার ন্যায় অপবিত্র পদার্থ খাইতে খাইতে দুনিয়াদারদের বাস্তব জ্ঞান লোপ পাইয়াছে। সুতরাং সুগন্ধময় কথা তাহাদের পছন্দ হইবে কেমন করিয়া?

সংসারানুরাগের তত্ত্বকথাঃ সংসারানুরাগের অপবিত্রতা এতই খারাপ যে, সংসারানুরাগী লোকের মধ্যে থাকিয়া ধর্মপ্রাণ লোকও পরিবর্তিত হইয়া যায়। আমার মতে এই শ্রেণীর মেয়ে-লোকেরা যেখানে একত্রিত হয়, তাহাদের কথাবার্তার প্রতি কর্ণপাতই করিও না, অন্যথায় অবস্থা দুই প্রকার হইতে পারে। (১) তুমি তাহাদের কথাবার্তা শ্রবণ করিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিলে বিপদ বাধিতে পারে। (২) ঘৃণা প্রকাশ না করিয়া শুনিতে থাকিলে তোমার স্বভাব পরিবর্তিত হইয়া তাহাদের ন্যায় হইবে।

এ কথায় আমার একটি ঘটনা মনে পড়িল, জনৈক আতর ব্যবসায়ীর কন্যা চর্ম ব্যবসায়ীর বাড়ীতে বিবাহিতা হইল। আতরের গুদাম হইতে বাহির হইয়া চামড়ার দুর্গন্ধ তাহার সহ্য হইবে কেন? নিজের প্রকৃতির উপর বল প্রয়োগ করিয়া নীরবে এক স্থানে বসিয়া থাকিত। থাকিতে থাকিতে ক্রমশ দুর্গন্ধের সহিত অভ্যস্ত হইয়া পড়িল! শাশুড়ী একদিন বলিলঃ "এই বধূ কোন কাজেরই নহে, সর্বদা বসিয়াই থাকে।" ইহাতে বধূ উত্তর করিলঃ "আমার দ্বারা আর কিছু না হইলেও এমন মহৎ কাজ হইয়াছে যে, আমি আসার সঙ্গে সঙ্গে আপনার বাড়ীর দুর্গন্ধ ক্রমশ বিদূরিত হইয়াছে।"

প্রকৃতপক্ষে দুর্গন্ধ বিদূরিত হয় নাই; বরং সে দুর্গন্ধের সহিত অভ্যস্ত হইয়াছিল। এইরূপে বদ-লোকের মধ্যে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে ভাল লোকের স্বভাবও বদ হইয়া যায়। অতএব, আমি বলি, ভদ্র মহিলাগণ! এই অপবিত্র মজলিস হইতে সরিয়া পড়ুন এবং সুগন্ধময় পবিত্র মজলিসে যোগ-দান করুন, সুগন্ধে অভ্যস্ত হইয়া পড়িবেন। তখন বুঝিবেন যে, এতকাল দুর্গন্ধময় মজলিসে

ছিলেন। এখন আপনারা সৎসঙ্গের পবিত্রতা ও সুগন্ধ অনুভব করিতে পারিতেছেন না। অন্যথায় এই অভিযোগ করিতেন না এবং কামনা ও আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন না। যদি কেহ বলেন, আমরা মুখ বন্ধ করিলেও আমাদের অন্তরে এসমস্ত কথা আসিয়াই থাকে, তাহা হইতে মুক্ত হই কি প্রকারে? আসল কথা এই যে, অন্তরে যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য চিন্তা না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই শ্রেণীর কল্পনা আসিবেই। বোতল শূন্য থাকিলে তাহাতে বায়ু প্রবেশ করিবেই। বোতল বায়ুমুক্ত করিতে হইলে উহাকে পানি দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিন। এক ফোঁটা পানি উহাতে ঢালিলে ঐ পরিমাণ বায়ু উহা হইতে নির্গত হইয়া যাইবে। এমন কি উহাকে পানি দ্বারা পূর্ণ করিলে সম্পূর্ণ বায়ুই বাহির হইয়া যাইবে। আপনারাও আল্লাহ্‌র যেকেরের সঞ্জীবনী পানি দ্বারা অন্তরকে পূর্ণ করিয়া দিন, তাহাতে এ সমস্ত অপবিত্র চিন্তা ও কল্পনা আপনাদের কাছেও ঘেঁষিতে পারিবে না।

উহার প্রণালী এই যে, আপনাদের অন্তরে কোন দুঃখ-চিন্তা বা কামনা-বাসনা আসামাত্র স্মরণ করুন, "আল্লাহ্ পাক খুব দয়ালু এবং দাতা। তিনি আমার জন্য যখন ইহা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, তখন ইহাতেই আমার মঙ্গল। দেখুন, হযরত খিযির আলাইহিস্‌সালাম বালকটিকে মারিয়া ফেলিলেন, ইহা তাহার পিতা-মাতার জন্য মঙ্গল হইয়াছিল। কেহ কেহ বলে, অমুক ব্যক্তি জীবিত থাকিলে এরূপ উন্নতি হইত। মানুষ তাহা দ্বারা উপকৃত হইত, এগুলি অর্থহীন আক্ষেপ। কেমন করিয়া নিশ্চিতরূপে জানা গেল যে, সে জীবিত থাকিলে উপকারই হইত। ভবিষ্যতে সে কিরূপ হইত আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া কে বলিতে পারে? পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধকেও আমরা দেখি, সারাজীবন ধার্মিক থাকিয়া পরিশেষে ধর্মহীন হইয়া পড়ে। সত্য পথে থাকিয়া মৃত্যু-বরণ করা বড় নেয়ামত।

আল্লাহ্‌র মহব্বতের প্রয়োজনীয়তাঃ এ সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকে, তবে তো কোন বস্তুর সহিতই মহব্বত রাখা উচিত নহে। আমি তাহা বলি না, আমি শুধু বলিতেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সর্বাপেক্ষা অধিক মহব্বত হওয়া উচিত। এই কারণেই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللهِ "আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক প্রিয়।" শুধু 'প্রিয়' বলেন নাই, ইহার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সর্বাপেক্ষা অধিক মহব্বত হওয়া উচিত। এই অর্থ নহে যে, কোন বস্তুর সহিত মহব্বতই না হউক। যাহার পুত্র একটি পয়সা হারাইয়া ফেলে, পয়সার জন্য মহব্বত আছে বলিয়া মনে কষ্ট হয় বৈকি; কিন্তু সে উহার পরোয়া করে না। কেননা, তাহার মনে পয়সার মহব্বতের চেয়ে পুত্রের মহব্বত অধিক।

দেখুন, সূর্যের উদয়ে আকাশের নক্ষত্রের অস্তিত্ব লোপ পায় না বরং বিদ্যমান থাকে। কিন্তু সূর্যের কিরণ অতি প্রখর বলিয়া নক্ষত্র দৃষ্ট হয় না। এইরূপে হৃদয়ে এশকে এলাহীরূপ সূর্য উদিত হইলে অন্যান্য পদার্থসমূহের মহব্বত নক্ষত্রের ন্যায় অদৃশ্য হইয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক পদার্থের স্বাভাবিক মহব্বত অন্তরে বিদ্যমান থাকে; বরং আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ পার্থিব প্রয়োজনীয় পদার্থকে তোমাদের চেয়ে অধিক ভালবাসেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র মহব্বত তদপেক্ষা অধিক প্রবল থাকে। অনুরূপভাবে কেহ কষ্টে পতিত হইলে তাঁহারা অধিক অস্থির হইয়া থাকেন। দুঃখীর দুঃখে অধিক দুঃখিত হইয়া থাকেন। কেননা, তাঁহাদের হৃদয় অত্যধিক কোমল, কাজেই কাহারও কষ্ট তাঁহারা দেখিতে পারেন না, সমবেদনায় ব্যথিত হইয়া পড়েন।

একদা জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোৎবা পাঠ করিতেছিলেন। তখন তাঁহার দুই পৌত্র হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রাঃ) আসিলে তিনি খোৎবা বন্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) হুযূরের এত অধিক প্রিয়া ছিলেন যে, দুনিয়ার কাহারও স্ত্রী তাহার নিকট তত প্রিয় নহে। কিন্তু হযরত আয়েশা বলেনঃ فَاِذَا نُوْدِىَ قَامَ كَاَنَّهٗ لَا يَعْرِفُنَا "যখন নামাযের আযান দেওয়া হইত, তখন এমনভাবে উঠিয়া দাঁড়াইতেন যেন আমাদিগকে তিনি চিনেনেই না।"

সারকথা এই যে, দুনিয়ার কোন পদার্থই ভালবাসার যোগ্য নহে। এই কারণেই আল্লাহ্ পাক দুনিয়াবী পদার্থসমূহের এমন দোষ বর্ণনা করিয়াছেন যাহা ব্যাপক এবং প্রমাণের মুখাপেক্ষী নহে। অর্থাৎ, তোমাদের নিকট যাহা আছে তাহা ধ্বংসশীল, কাজেই উহা আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপনের যোগ্য নহে।

এই অংশটি সম্বন্ধে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল না। কেননা, গতকাল তাহা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আনুষঙ্গিকভাবে বর্ণনা আসিয়া গিয়াছে। এখন আমি অদ্যকার ওয়াযের উদ্দেশ্য দ্বিতীয় অংশটি সম্বন্ধে বর্ণনা করিতেছি।

স্থায়ী পদার্থঃ আল্লাহ্ বলেনঃ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ "যাহাকিছু আল্লাহ্র নিকট আছে তাহা স্থায়ী।" আয়াতের প্রথম অংশ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ "তোমাদের নিকট যাহাকিছু আছে তাহা নশ্বর।" ইহা প্রকাশ্যেই অনুভূত হইতেছে, গতকাল একজন মরিয়াছে আজ আর একজন মরিয়াছে ইত্যাদি। ইহা বুঝিবার জন্য ঈমানদার হওয়ার প্রয়োজনীয়তা নাই। মু'মিন-কাফের নির্বিশেষে সকলেই চোখের সামনে ধ্বংস ও পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। কিন্তু দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ, 'আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যাহা আছে তাহা অবিনশ্বর,' ইহা ঈমানদার ভিন্ন অপর কেহ বিশ্বাস করিবে না। ঈমানদার আল্লাহ্র কালাম সত্য বলিয়া মনে করিবে এবং বিশ্বাস করিয়া লইবে যে, আল্লাহ্র নিকট যাহা আছে তাহা স্থায়ী ; বরং এখানে অন্য উদ্দেশ্য আছে, তাহা হইল, আল্লাহ্ পাকের নিকট যাহা-কিছু আছে সে বস্তুর সহিত মনের সম্পর্ক স্থাপন কর। ইহা হইতে একটি ব্যাপক নীতি আবিষ্কৃত হইল। "যে বস্তু স্থায়ী ও অবিনশ্বর তাহাই ভালবাসার যোগ্য।" এই উক্তিটি দুনিয়াদারগণেরও স্বীকার্য, স্থায়িত্বকে তাহারাও ভালবাসার ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে।

একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করিয়া দিতেছি। মনে করুন, আমাদের অধীনে দুইটি বাড়ী আছে। একটি কিছুদিনের ব্যবহারের জন্য আরিয়ত (ধার নেওয়া) এবং অপরটি হেবা-সূত্রে আমরা মালিক। কিন্তু উভয় বাড়ীরই ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ভাঙ্গাচুরা ও শোচনীয় অবস্থা। দেওয়াল ভাঙ্গা, কড়িকাঠগুলি পড়িয়া গিয়াছে। উভয় বাড়ীই মেরামতের প্রয়োজন। এক হাজার টাকা মোরামতের জন্য বরাদ্দ করা হইল। এখন প্রশ্ন এই যে, এক হাজার টাকা আরিয়ত নেওয়া বাড়ীতে ব্যয় করা হইবে, না মালিকানা স্বত্বের বাড়ীতে? বলাবাহুল্য, প্রত্যেক জ্ঞানীই পরামর্শ দিবেন যে, যাহা নিজের বাড়ী তাহাতেই টাকা ব্যয় করা হউক। কেননা, উহা আমাদের হাতে স্থায়ী থাকিবে। পক্ষান্তরে আরিয়তের বাড়ীটি হস্তচ্যুত হইয়া যাইবে। তাহাতে টাকা নষ্ট করার কোন অর্থ হয় না। সুতরাং বুঝা গেল, সেই বস্তুতেই চেষ্টা-যত্ন করা এবং টাকা-পয়সা ব্যয়

করা উচিত যাহা নিজের হাতে স্থায়ী থাকিবে। যদিও সে স্থায়িত্ব কেবল কল্পনার স্তরেই আছে। আর যে বস্তু নিজের হাতে স্থায়ী থাকিবে না ; বরং অতিসত্বর হস্তচ্যুত হইয়া যাইবে, তাহাতে যদি কেহ নিজের চেষ্টা-যত্ন ব্যয় করে, তবে তাহাকে বেওকুফ ছাড়া কিছুই বলা যায় না।

যেমন, কোন ব্যক্তি এক রাত্রির জন্য কোন হোটেলে বিশ্রাম গ্রহণ করিল। সে পুত্র পরিবারের জন্য হাজার টাকা উপার্জন করিয়া আনিয়াছিল। ঘটনাক্রমে হোটেলে তাহার জন্য যে কামরা নির্ধারিত হইয়াছে, উহা বাসের অনুপযোগী দেখিয়া রাজমিস্ত্রী ডাকাইয়া হাজার টাকা ব্যয়ে তাহা মেরামত করিয়া লইল। এদিকে স্ত্রী পুত্র-পরিজনসহ প্রতীক্ষা করিতেছে—স্বামী টাকা উপার্জন করিয়া আনিবে। অথচ তিনি এমন কাণ্ড করিয়া বসিলেন! এ ব্যক্তিকে নির্বোধ বলিবেন, না বুদ্ধিমান? বলাবাহুল্য, তাহাকে বেওকুফই বলা হইবে। তবে এই ব্যক্তি বেওকুফ কেন? শুধু এই কারণে যে, ক্ষণেক পরে যাহা হস্তচ্যুত হইয়া যাইবে এরূপ পদার্থে নিজের যথাসর্বস্ব বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে।

আয়ুষ্কাল অমূল্য সম্পদ ঃ আয়ুষ্কাল তো এক মহামূল্য সম্পদ, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদিগকে মূলধনরূপে দান করিয়াছেন। উহার এক একটি মিনিট সারাজগত এবং তন্মধ্যস্থিত যাবতীয় পদার্থ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। মূল্যবান হওয়ার প্রমাণ এই যে, মুমূর্ষু ব্যক্তিকে যদি কেহ বলে, দশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তোমাকে এক ঘণ্টা করিয়া সময় দেওয়া হইবে। যদি তাহার নিকট টাকা থাকে, তবে তাহা দিতে একটুও ইতস্তত করিবে না। এমন কি রাজা হইলে পূর্ণ রাজত্ব দিতেও অস্বীকার করিবে না।

কোন এক বুযুর্গ লোক এক বাদশাহ্কে উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্যে বলিলেনঃ বাদশাহ্ নামদার! আপনি যদি কোন নিবিড় অরণ্যের মধ্যে পাত্র-মিত্রগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন এবং অত্যধিক পিপাসাতুর হন, অথচ তথায় পানি না পাওয়া যায়, এমন কি আপনি পানির অভাবে মরণাপন্ন অবস্থায় পতিত হন ; এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি এক পেয়ালা পানি আনিয়া যদি আপনাকে বলে, অর্ধেক রাজত্বের বিনিময়ে ইহা আপনাকে দিতে পারি। তখন আপনি কি করিবেন? বাদশাহ্ বলিলেনঃ তৎক্ষণাৎ অর্ধেক রাজত্ব তাহাকে দান করিয়া ফেলিব।

আবার বলিলেনঃ 'খোদা না করুন, যদি আপনার প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায় এবং সমস্ত চিকিৎসকই চিকিৎসায় অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন, আর কোনই উপায় রহিল না। এমন সময় কেহ আসিয়া যদি বলে, অর্ধেক রাজত্বের বিনিময়ে এখনই আমি আপনার প্রস্রাব স্বাভাবিক করিয়া দিতে পারি। আপনি তাহা দিবেন কি?' বাদশাহ্ বলিলেনঃ নিঃসন্দেহ, আমি দান করিব। তখন বুযুর্গ লোকটি বলিলেনঃ দেখুন, আপনার রাজত্বের মূল্য এই এক পেয়ালা পানি আর এক পেয়ালা প্রস্রাব বুঝা গেল, আয়ুষ্কাল সপ্তখণ্ড পৃথিবীর রাজত্ব অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। চিন্তা করিয়া দেখুন, এই অমূল্য মূলধনকে আপনি কোথায় ব্যয় করিয়াছেন? হোটেলের কোঠা মেরামতে? হোটেলের কামরা তো কেবল দুই-এক রাত্র অবস্থানের জন্য নির্ধারিত ছিল। উহাতেই সমস্ত পুঁজি নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। এখন আপনাকে শূন্য হস্তে বাড়ী ফিরিতে হইবে। কিয়ামতের বাজারে আক্ষেপ করিতে হইবে। কবি বলিয়াছেনঃ که بازار چندانکه آگنده تر ـ تهیدست رادل پرا گنده تر অর্থাৎ, "বাজার যতই পণ্যদ্রব্যে সুসজ্জিত থাকিবে, রিক্তহস্ত ব্যক্তির হৃদয় ততই চিন্তান্বিত থাকিবে।"

আক্ষেপের পর আক্ষেপ বাড়াইবার জন্য কাফেরের সহিত এরূপ ব্যবহার করা হইবে যে, ইহাদিগকে বেহেশ্‌ত দেখান হইবে। তখন তাহাকে বলা হইবে, তুমি মু'মিন হইলে এই মনোরম বাসস্থান তোমারই হইত। ইহাতে তাহার আক্ষেপ ও অনুতাপ আরও অধিক হইবে। দুঃখের বিষয়, এখন তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না, মুসাফিরখানার কামরা মেরামতে সমস্ত পুঁজি নিঃশেষ করিতেছ; বরং দুনিয়া তো মুসাফিরখানার কামরার চেয়েও অধিকতর অস্থায়ী। কেননা, মুসাফিরের অন্তত একটি রাত্রি তথায় বাস করিবার আশা আছে। দুনিয়াতে এতটুকু আশাও তো নাই। প্রতি মুহূর্তে মানুষ মৃত্যুর সম্মুখীন। কবি বলেনঃ شاید همیں نفس نفس واپسیں بود "সম্ভবত এই নিঃশ্বাসই সর্বশেষ নিঃশ্বাস হইতে পারে।" সুতরাং এখানে এক রাত্রির আশা করাও তো নিরর্থক। রাত্রিকালে শায়িত রহিয়াছ। হঠাৎ ভূমিকম্পে দালান-কোঠা ভূমিসাৎ হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। ঘুমন্ত অবস্থায় সর্পও দংশন করিতে পারে। ভুলে প্রাণসংহারক কোন ঔষধও খাইয়া ফেলিতে পার, কিংবা হঠাৎ পা পিছলাইয়া উপর হইতে নীচে পড়িয়া যাইতে পার। যদিও এরূপ ঘটনা মূলত অসংখ্য, (সর্বদা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলেও) কিন্তু কদাচিত ঘটিয়া থাকে। মানুষ তো দৈনিক দুইবার সাক্ষাৎ মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া থাকে। দৈনিক দুইবার খাদ্য গ্রহণ মৃত্যুর পূর্ণ উপকরণই বটে। কেননা, গলদেশে দুইটি নালী আছে। একটি খাদ্যবাহী এবং অপরটি শ্বাস-প্রশ্বাসবাহী। দেখুন, প্রত্যেক ইচ্ছাধীন কার্য প্রথমতঃ কল্পনা করা হয়, অতঃপর সংঘটিত হয়। আপনারাই বলুন, আপনার খাদ্য গলাধঃকরণকালে ডান দিকের নালী দিয়া প্রবেশ করে, না বাম দিকের নালী দিয়া? আপনারা কেহই তাহা বলিতে পারেন না। অতএব, বুঝা যায়, গলাধঃকরণ করা তো নিজের ইচ্ছাধীন। কিন্তু নির্দিষ্ট নালী দিয়া গিলিয়া ফেলা ইচ্ছাধীন নহে। সুতরাং যদি খাদ্যদ্রব্য নির্দিষ্ট পথ ছাড়িয়া অন্য পথে চলিয়া যায়, তবে তাহা রোধ করার কি ক্ষমতা আপনার আছে? অতএব, দুই বেলা আহারের সময় আপনি এমন কার্য করিয়া থাকেন, যাহাতে ভুল হওয়ামাত্র আপনার মৃত্যু অনিবার্য। সুতরাং খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণ করাও কেমন বিপজ্জনক? যদি কোন 'খেয়ালী' ব্যক্তি কল্পনা করে যে, খাদ্যদ্রব্য শ্বাসবাহী নালীতে প্রবেশ করিলে মৃত্যু অনিবার্য, তবে খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করাই তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে। বস্তুত সময় সময় এরূপ হইলে প্রাণ বিপন্ন হইয়া পড়ে; বরং খাদ্যদ্রব্য বিপথে যাইয়া কেহ কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেও দেখা গিয়াছে।

যদি ভালয় ভালয় গিলিয়াও ফেলা হয়, তথাপি ইহা একটি বিপজ্জনক কাজ সন্দেহ নাই। যদিও আমরা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া বিপজ্জনক বলিয়া মনে হয় না, মূলত ইহাও অতি বিপদসঙ্কুল। কেননা, যাহা গলাধঃকরণ করা হইল উহা আপনার সমজাতীয় নহে। পাকস্থলীতে যাইয়া হজম নাও হইতে পারে। তখন আপনি উহাকে বাহির করিয়া ফেলার জন্য চিন্তিত হইবেন। যদি ঘটনাক্রমে তাহা বাহির না হয় এবং পাকস্থলীতে, মূত্রাশয়ে গিয়া মূত্র নালীতে পাথরি উৎপন্ন হয়, তবে বলুন, এমতাবস্থায় নিজের হাতে মৃত্যুর উপকরণ প্রস্তুত করেন কিনা? অদৃষ্টক্রমে আমরা রক্ষা পাই বটে; কিন্তু মৃত্যুর উপকরণ যোগাইতে আমরা মোটেই ত্রুটি করিতেছি না। এত উপকরণ সত্বে যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করা হয়, তবে মৃত্যু মোটেই বিচিত্র নহে; বরং জীবিত থাকাই বিস্ময়কর ব্যাপার।

সংসার ও সংসারী লোকের দৃষ্টান্তঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দুনিয়ার বিষয় বর্ণনা করিতেছেনঃ مَالِىْ وَلِلدُّنْيَا اِنَّمَا مَثَلُ رَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ بِشَجَرَةٍ

"দুনিয়ার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ? আমার দৃষ্টান্ত তো এইরূপ, যেমন কোন অশ্বারোহী পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং বিশ্রাম গ্রহণের নিমিত্ত এক বৃক্ষের নীচে ক্ষণেককাল অবস্থান করে। শ্রান্তি দূর হইলে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া নিজের গন্তব্য পথে চলিতে থাকে।"

দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট লোকের দৃষ্টান্ত এইরূপ, যেন বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণকারী ব্যক্তি উহার ডাল বাঁকা দেখিয়া করাতি ডাকাইয়া উহাকে সোজা করিতে নিজের সমস্ত পুঁজি নিঃশেষ করিয়া ফেলে। দুনিয়াতে মজিয়া থাকা উহার জন্য প্রাণদানের মতই বটে ; এক বুযুর্গ লোক দুনিয়ার দৃষ্টান্ত বর্ণনায় বলিয়াছেন ঃ

در رہ عقبی است دنیا چوں پلے - بے بقا جائے وویراں منزلے

অর্থাৎ, "আখেরাতের পথে দুনিয়া পুলের মত। ইহা একটি ধ্বংসশীল স্থান এবং একটি ভগ্ন বাড়ী।"

পুলের উপর দিয়া গমনকালে মানুষ থামেও না। কিন্তু হুযূর (দঃ) যে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছেন, উহাতে সমস্ত চিহ্নের প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কেননা, বৃক্ষের নীচে পৌঁছিলে পথিক কিছু আরাম পায়। কিন্তু পুলে তাহা পাওয়া যায় না। দুনিয়া বৃক্ষের ছায়ারই ন্যায় বটে। কেননা, দুনিয়াতে কিছু আরাম আছে। এতদ্ভিন্ন বৃক্ষ এমন বস্তুও বটে, যাহার সবলতা ; সতেজতা ও সরসতা দেখিয়া পথিক উহার নীচে নিজের মূল্যবান সময়ের এক বড় অংশ কাটাইয়া দেয়। এইরূপে দুনিয়াও সুজলা-সুফলা এবং শস্য-শ্যামলা বলিয়া মনে হয়, পক্ষান্তরে পুলের মধ্যে এ সমস্ত তুলনা নাই। মোটকথা, দুনিয়াকে আখেরাতের পথে পুলই বলুন আর ছায়াদার বৃক্ষই বলুন, দুনিয়া মন লাগাইবার যোগ্য পদার্থ নহে, বরং মন লাগাইবার ভিত্তি স্থায়িত্ব এবং স্থায়িত্ব শুধু সেসমস্ত পদার্থের আছে যাহা আল্লাহ্র নিকট রহিয়াছে। সুতরাং আল্লাহ্র নিকটস্থিত পদার্থের প্রতিই মনকে আকৃষ্ট করা উচিত।

আখেরাতের নেয়ামতসমূহ ঃ আখেরাতের নেয়ামতসমূহকে "আল্লাহ্র নিকটস্থিত" বলার মধ্যে কয়েকটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব রহিয়াছে। (১) যাহাকিছু আল্লাহ্র কাছে থাকিবে, কেহ উহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না, পক্ষান্তরে পার্থিব নেয়ামতের জন্য সর্বদা এই আকাঙ্ক্ষা থাকে যে, খোদা জানেন কখন ইহা হাতছাড়া হইয়া যায়। আর আল্লাহ্ তা'আলার নিকটস্থ অর্থাৎ, আখেরাতের নেয়ামত সরকারী তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে, কাজেই উহা নিরাপদে থাকিবে। এই হিসাবেও আখেরাতের নেয়ামতই একমাত্র কাম্য। (২) আখেরাতের নেয়ামত আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে রহিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা ভিন্ন কেহ উহা পাইতে পারিবে না এবং নেক কাজ ভিন্ন আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন না। সুতরাং নেক আমল ব্যতীত কেহ আখেরাতের নেয়ামতের আশা করিতে পারে না। যেমন, রাজ-ভাণ্ডারের সরকারী পাহারায় রক্ষিত বস্তু পাইতে প্রথমে খোশামোদ-তোষামোদ দ্বারা রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া লইতে হয়। অতঃপর রাজা কোষাধ্যক্ষের নামে অনুমতিপত্র লিখিয়া দিলে সে তাহা পাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন রাজ-ভাণ্ডারের বস্তু পাওয়ার অন্য উপায় নাই। (৩) "আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যাহা আছে" বলিতে কেবলমাত্র আখেরাতের নেয়ামতই বুঝান হইয়াছে। কেননা, দুনিয়ার নেয়ামতসমূহও যদ্যপি মুখ্যভাবে আল্লাহ্ তা'আলারই স্বত্বাধীন, তথাপি গৌণভাবে আরিয়তস্বরূপ ইহার সহিত আমাদেরও সম্পর্ক রহিয়াছে। কাজেই مَا عِنْدَ كُمْ বাক্যে কেবল দুনিয়ার নেয়ামত এবং مَا عِنْدَ اللهِ বাক্যে কেবল আখেরাতের নেয়ামতই বুঝান হইয়াছে।

সারকথা এই যে, আখেরাতের নেয়ামতই কাম্য হওয়ার যোগ্য, উহা লাভ করার চেষ্টা কর। ইহা নিশ্চিত যে, আখেরাত যাহার কাম্য হয়, ওৎপ্রোতভাবে সে নিজের জন্য এবং নিজের আত্মীয়-স্বজনের জন্য ইহলোকে থাকা অপেক্ষা আল্লাহ্‌র সন্নিধানে থাকাই অধিক পছন্দ করিবে।

মনে করুন, দুই ব্যক্তি ভ্রমণে বাহির হইয়া নানাবিধ কষ্ট ও দুঃখ সহ্য করিতেছে। তাহাদের একজনকে তৎকালীন বাদশাহ্ ডাকিয়া বলিলেনঃ তোমার ভ্রমণের মেয়াদ পূর্ণ হইয়াছে, এখন তুমি শান্তি গ্রহণের নিমিত্ত আমার কাছে চলিয়া আস। অপর ব্যক্তি সঙ্গীর বিচ্ছেদ সংবাদে কিছু দুঃখিত হইলেও এই ভাবিয়া আনন্দিত হইবে যে, ভালই হইল, বন্ধু নিজের গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া গেল এবং নিজেও আকাঙ্ক্ষী থাকিবে—কোনদিন আমারও সফরের মেয়াদ পূর্ণ হইবে এবং আমিও বাদশাহের খেদমতে যাইয়া পৌঁছিতে পারিব। হযরত হাজী ছাহেব (রঃ) জনাব হাফেয শহীদ (রঃ) সম্বন্ধে "মাসনবী তোহ্‌ফাতুল ওশশাক" কিতাবে একটি কবিতা লিখিয়াছেনঃ

جو که نوری تھے گئے افلاك پر – مثل تلچھٹ رہ گیا میں خاك پر

"যিনি ছিলেন জ্যোতির্ময় তিনি আসমানে চলিয়া গিয়াছেন। তেলের গাদের ন্যায় আমি মাটিতে রহিয়া গেলাম।"

আর আমাদের অবস্থা এই যে, নিজে মৃত্যুর কামনা করা তো দূরের কথা, অপরের মৃত্যুতেও দুঃখ এবং আক্ষেপ করা হয় এবং মনে করা হয় যে, মৃত্যু সঙ্গত হয় নাই। আমরা মৃত্যুর কামনাই বা কোন্ মুখে করিব? যাহার নিকট প্রচুর নেক আমল আছে সে ব্যক্তি মৃত্যুর কামনা করিতে পারে। এখানে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, তবে যাহারা মৃত্যু কামনা করিয়া থাকে, তাহারা কি নিজেদের নেক আমলের উপর নির্ভর করে?

নেক আমলের বিশেষত্বঃ নেক আমলের উপর কাহারও ভরসা থাকা উচিত নহে। মৃত্যুর কামনা যাঁহারা করেন তাহারা কখনও নিজেদের নেক আমলের ভরসা করেন না, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক পদার্থে এক বিশেষত্ব রাখিয়াছেন। নেক আমলের বিশেষত্বই এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাৎলাভের জন্য মনে আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়। যদি এই সম্ভাবনাও থাকে যে, আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিত হইলে পাপের জন্য শাস্তিও ভোগ করিতে হইবে। তথাপি আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ কামনায় সে দুনিয়ার সুখ-শান্তি অপেক্ষা আখেরাতে শাস্তি ভোগই শ্রেয় মনে করে। বস্তুত প্রত্যেক মুসলমানই মরিয়া স্বীয় প্রভুর সহিত মিলিত হয়। এই মিলনেই সেই আনন্দ। কাজেই সে আযাবের পরোয়া করে না এবং সেই মিলনানন্দের আশায় ইহলোকে মন বসে না। اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ "দুনিয়া মু'মিনের জন্য কারাগার" কথার অর্থ ইহাই বটে। ইহলোকে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে লিপ্ত আছেন বলিয়া তাঁহারা মৃত্যু কামনা করেন না; বরং জেলখানার ন্যায় ইহলোকে তাঁহাদের মন বসে না বলিয়াই মৃত্যুর প্রত্যাশী থাকেন। এখানে থাকিতে চান না। সাধারণত কুঁড়েঘর হইলেও নিজের বাসস্থানেই মানুষের মন বসে। কাজেই ইহলোকে তাঁহাদের মন না বসার কারণ দুঃখ-কষ্ট নহে। ইহা নেক আমলের ফল। যাঁহার নেক আমল যত বেশী হইবে, দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা এবং আখেরাতের প্রতি আগ্রহ তাঁহার মনে তত অধিক হইবে।

আমাদের হযরত হাজী ছাহেব কেবলার মধ্যে এই অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্ট হইত। তাঁহার একটি ঘটনা আমার স্মরণ হইল, এক বৃদ্ধ তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, "হুযূর, আমার স্ত্রীর মরণাপন্ন

অবস্থা, তাহার আরোগ্যের জন্য দো'আ করুন।" তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেনঃ "দেখ, লোকটির বুদ্ধি কত অল্প! একজন মুসলমান কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিতেছে, আর এই ব্যক্তি তাহার জন্য আফসোস করিতেছে!" আবার তাহাকে বলিলেন, "বড় মিঞা! তুমিও এখান হইতে মুক্তি লাভ করিবে।" আমি মনে মনে বলিলাম, বুড়া লোকটি স্ত্রীকে ভাল করিবার জন্য আসিয়াছিল, হযরত স্বয়ং তাহার মৃত্যুর সুসংবাদ শুনাইয়া দিলেন। সারকথা এই যে, মু'মিন লোক নেক্ আমল করিলে তাহার হৃদয় আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাৎলাভের কামনা অবশ্যই করিবে।

মনে করুন, দুই জন তহ্সীলদারের মধ্যে একজন ঘুষখোর, যালেম এবং কাচারীতে অনুপস্থিতও থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অপরাধমূলক বহু কাজও করে। অপরজন সৎস্বভাব, কাহারও প্রতি অত্যাচার করেন না, ঘুষও গ্রহণ করেন না। খুব সাবধানতার সহিত নিজের কর্তব্য সমাধা করিয়া থাকেন। ঊর্ধ্বতন কর্মচারী তাহাদের উভয়কে কার্য পরীক্ষার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন, এই সংবাদ শুনিয়া ঘুষখোর, অত্যাচারী তহ্সীলদার অবশ্যই ঘাবড়াইয়া যাইবে এবং কামনা করিবে যে, কোন প্রকারে পরিদর্শনের দিন যেন পিছাইয়া যায়। কিন্তু অপরজন এই সংবাদে আনন্দিত হইবেন। ভালই হইল—সময় আসিয়া গেল। হাকীম সন্তুষ্ট হওয়ার পরোয়ানা পাইলাম। যদিচ হাকীমের প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্য মনে ভয়ও থাকে।

ইবনুল কাইয়্যেম একটি হাদীস লিখিয়াছেন। উহার সারমর্ম বলিতেছিঃ "আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তোমার বিশ্বাস এবং ধারণা নিখুঁত না হওয়া পর্যন্ত তোমার মৃত্যু হওয়া উচিত নহে।" তিনি বলিলেনঃ ইহার অর্থ হইল, নেক্ আমল কর। কেননা, নেক্ আমল করিতে থাকিলেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সুষ্ঠু ও নিখুঁত ধারণা উৎপন্ন হয়। এই নেক্ আমলই আল্লাহ্ তা'আলার নিকটস্থ নেয়ামতসমূহকে ভালবাসার উপায়। ইহার ফলে তোমার নিজের এবং আত্মীয়-স্বজনের জন্য ইহলোক ছাড়িয়া পরলোকে বাস করা অধিক পছন্দনীয় হইবে। এই বিষয়টি আমি বহু কষ্টে এবং চেষ্টায় প্রমাণ করিলাম।

আর এক বেদুইন ব্যক্তি দুইটি কবিতায় তাহা সহজে ব্যক্ত করিয়া দিয়াছে। হুযূর (দঃ)-এর চাচা হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর এন্তেকাল হইলে তৎপুত্র হযরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ) অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া পড়েন। এক বেদুইন আসিয়া মাত্র দুইটি কবিতা পাঠ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ

اِصْبِرْ نَكُنْ بِكَ صَابِرِيْنَ فَاِنَّمَا ـ صَبْرُ الرَّعِيَّةِ بَعْدَ صَبْرِ الرَّاسِ

خَيْرٌ مِّنَ الْعَبَّاسِ اَجْرُكَ بَعْدَهٗ وَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّنْكَ بِالْعَبَّاسِ

"আপনি ছবর করুন, আপনার ছবর দেখিয়া আমরা ছবর করিব। কেননা, মনিবের ছবরের পরেই প্রজাবৃন্দের ছবর আসিয়া থাকে। (বড়দের উচিত ছোটদের সম্মুখে শোক-দুঃখের আলোচনা না করা। আজকাল বড়দের অবস্থা এই যে, তাহারা ছোটদের আগেই শোক-তাপ আরম্ভ করিয়া দেয়।) আপনি হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর মৃত্যুতে শোকাতুর কেন হইয়া পড়িয়াছেন? আপনি আব্বাস অপেক্ষা উত্তম বস্তু সওয়াব লাভ করিতেছেন। আর যদি এ কারণে ব্যথিত হইয়া থাকেন যে, আব্বাস (রাঃ) আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন, তবে মনে রাখিবেন, আব্বাস (রাঃ) আপনার চেয়ে উত্তম অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। খুশী থাকুন, শোকর করুন, তিনি উত্তম স্থানে পৌঁছিয়াছেন।" হযরত ইব্নে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ এই বেদুইনের চেয়ে

অধিক সান্ত্বনা আমাকে কেহ দান করিতে পারে নাই। তৎকালীন গেঁয়ো অশিক্ষিত লোকের অবস্থাও এইরূপ ছিল। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সহিত যাঁহাদের সম্পর্ক রহিয়াছে, তাঁহাদের অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে।

হযরত মাওলানা ইয়াকুব ছাহেবের ভগ্নি হজ্জে গিয়াছিলেন। বহুদিন যাবৎ তাঁহার কোন শুভ-সংবাদ না পাইয়া মন অস্থির ছিল। মোরাকাবায় বসিয়া দেখিতে পাইলেন, তাঁহার সম্মুখে এক বিরাট দফতর আসিয়া উপস্থিত। উহাতে নক্‌শা ও ঘর আঁকা রহিয়াছে। এক ঘরে লেখা আছে 'আল্-আমেল', দ্বিতীয় ঘরে 'আল-আমল', তৃতীয় ঘরে 'আল্-জাযা' ; আর উহাতে সহস্র নাম লিখিত রহিয়াছে। অনুসন্ধান করিয়া যে ঘরে 'আল্-আমল' লিখা আছে তথায় তাঁহার ভগ্নির নাম পাইলেন। 'আল্-হজ্জ' এবং 'আল্-জাযার' ঘরে লিখিত আছেঃ فِىْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ

"শক্তিশালী আল্লাহ্ তা'আলার সন্নিধানে উত্তম বাসস্থানে রহিয়াছেন।" ইহাতে তিনি বুঝিলেন, তাঁহার ভগ্নি হজ্জক্রিয়া সমাপনের পর এন্তেকাল করিয়াছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলার সন্নিধানেই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা জানিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন এবং সান্ত্বনা পাইলেন। অবশ্য পরে তিনি জীবিত আছেন বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য হইল, মৃত্যুর ধারণায় তিনি বিচলিত হন নাই। আল্লাহ্ওয়ালা লোকেরা প্রিয়জনের জন্য নিজের কাছে থাকা অপেক্ষা আল্লাহ্র কাছে থাকাই অধিক পছন্দ করেন এবং আনন্দিত হন। বুযুর্গ লোকেরা মৃত্যু প্রাপ্ত হওয়ার জন্য মানত করিতেছেনঃ

نذر کردم که گر آید بسر ایں غم روزے ۔ تا در میکده شاداں و غزلخواں بروم

"আমি মানত করিয়াছি যে, মৃত্যুর দিন আসিলে আনন্দ-চিত্তে মিলনের গান গাহিতে গাহিতে মাহ্বুবের দরবার পর্যন্ত যাইয়া পৌঁছিব।"

মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষাঃ কোন বুযুর্গ লোক স্বীয় জানাযার সহিত গযল পাঠ করিয়া যাওয়ার জন্য ওসিয়ত করিয়াছিলেন যে, আমার মৃত্যুর পর তোমরা এই গযলটি পাঠ করিতে করিতে আমার জানাযার অনুসরণ করিওঃ

مفلسانیم آمده در کوئے تو ۔ شیئا لله از جمال روئے تو
دست بکشا جانب زنبیل ما ۔ آفریں بر دست و بر بازوئے تو

"আমরা রিক্তহস্তে আপনার দরবারে আসিয়াছি, আপনার মহিমাময় জাতের কিছু ছদকা দান করুন। আমাদের ঝুলির প্রতি হস্ত প্রসারিত করুন, আপনার হাত এবং বাহুকে ধন্যবাদ, শত ধন্যবাদ।" বলাবাহুল্য, ইহা বড়ই প্রশান্ত মনের কথা। ইহাতে বুঝা যায়, তাঁহারা মৃত্যুকে জীবনের উপর প্রাধান্য দান করিতেন। তদুপরি দেখুন, কোন কোন বুযুর্গ লোক মৃত্যুর পরেও প্রেমোন্মত্ত হইয়াছিলেন। হযরত সুলতানুল আওলিয়া, সুলতান নিযামুদ্দীন কুদ্দেসা সিররুহুর এন্তেকাল হইলে তাঁহার এক খলীফা তাঁহার জানাযার সহিত গমনকালে এই গযল পাঠ করিয়াছিলেনঃ

سرو سیمینا بصحرا می روی ۔ سخت بےمہری که بےمامی روی
اے تماشا گاه عالم روئے تو ۔ تو کجا بهر تماشا می روی

"হে প্রিয়! আপনি জঙ্গলের দিকে যাইতেছেন, অতিশয় নিষ্ঠুরতা যে, আপনি আমাদের ছাড়িয়া একাকী যাইতেছেন। হে প্রিয়! আপনার দীপ্তিমান মুখমণ্ডল সারাজগতের কৌতুককেন্দ্র, আপনি কৌতুক করিবার জন্য কোথায় যাইতেছেন?"

লিখিত আছে যে, কাফনের মধ্য হইতে তাঁহার হাত উঁচু হইয়া গেল, সঙ্গীয় লোকেরা গযল পাঠকারীকে নীরব করিয়া দিলেন। কাফনের মধ্যে কি ছিল?

هر گز نمیرد أنکه دلش زنده شد زعشق – ثبـت ست بر جریـدهٔ عالم دوام ما

অর্থাৎ, "যিনি এশকে হাকিকীর বদৌলতে আত্মিক জীবন লাভ করিয়াছেন, তিনি মরিয়া গেলেও সান্নিধ্যের পূর্ণ স্বাদে নিমগ্ন আছেন বলিয়া তাঁহাকে জীবিতই বলা উচিত।" যাঁহাকে তুমি মনে করিতেছ মরিয়া গিয়াছেন, তিনি বাস্তবিকপক্ষে সত্যিকারের জীবন লাভ করিয়াছেন। আল্লাহ্ বলেনঃ بَلْ اَحْيَاۤءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ "বরং তাঁহারা তাঁহাদের প্রভুর সন্নিধানে জীবিত রহিয়াছেন।"

মৃত্যুর দৃষ্টান্ত এইরূপ, যেমন শিশু মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইল, শিশু মাতৃগর্ভে থাকাকালে উহাকেই জগত মনে করে। তথা হইতে নির্গত হইয়া আসিলে দেখিতে পায় এবং বুঝিতে পারে যে, আমি অতি সংকীর্ণ অন্ধকার স্থানে আবদ্ধ ছিলাম। এইরূপে যখন ইহলোক ত্যাগ করিবে তখন বুঝিতে পারিবে, বাস্তবিকই আমি জেলখানায় আবদ্ধ ছিলাম, সত্যিকারের জগত তো এইটি। অতএব, পরলোক-যাত্রী প্রকৃতপক্ষে মরে না, জীবন প্রাপ্ত হয়, ইহজগত হইতে অবশ্য বিচ্ছিন্ন হয় বটে, কিন্তু আর এক জগতে চলিয়া যায়। তোমরা যদি সেই জগত দেখিতে পাইতে, তবে মৃত ব্যক্তির তিরোধানের জন্য কখনও ক্রন্দন করিতে না; বরং তোমাদের এখানে থাকার জন্য কাঁদিতে, অবশ্য তথায় যাওয়ার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর। কোন কবি বড় সুন্দর কথা বলিয়াছেনঃ

یاد داری که وقـت زادن تو ـ همـه خنـداں بودنـد و تو گریاں
ان چنــاں زی که بعـد مردن تو ـ همـه گریـاں بودنـد و تو خنداں

"তোমার স্মরণ আছে কি? তোমার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় সকলে হাস্যরত ছিল এবং তুমি ছিলে ক্রন্দনরত। এমনভাবে জীবিত থাক যেন তোমার মৃত্যুর পরে সকলে কাঁদিতে থাকে আর তুমি হাসিতে থাক।" আল্‌হামদুলিল্লাহ্, আমি জেলখানা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি, জেলখানা হইতে সদ্যমুক্ত ব্যক্তি আনন্দিতই থাকে।

দুনিয়ার জেলখানাঃ বাস্তবিকপক্ষে দুনিয়া একটি জেলখানা। হাদীস শরীফে দুনিয়াকে 'সিজন' বলা হইয়াছে, ইহার অর্থ কারাগার। দুনিয়ার প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়ার পর তাহা আর লক্ষণীয় হওয়ার যোগ্য থাকে না।

حال دنـیـا را بپرسـیـدم من از فرزانهٔ ـ گفـت یا خوابـیـسـت یا بادیست یا افسـانـهٔ
باز گفـتم حال آنکس گوکـه دل دردی به بست ـ گفـت با غولیـسـت یا دیـوےیا دیـوانـهٔ

"জনৈক জ্ঞানী লোককে দুনিয়ার অবস্থা সম্বন্ধে আমি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেনঃ দুনিয়া একটি স্বপ্ন কিংবা বায়ু কিংবা একটি অলীক কাহিনী। অতঃপর আমি ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম, যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি উত্তরে বলিলেনঃ সে ব্যক্তি

ভূত নতুবা পাগল। দুনিয়া যখন এমনি ধরনের বস্তু, তখন এখান হইতে সরিয়া পড়ার ফেকেরেই থাকা উচিত, থাকার চিন্তা করা উচিত নহে। বিশেষত সম্মুখে কেহ মরিলে অধিকতর উপদেশ গ্রহণ করা উচিত। দুনিয়ার দৃষ্টান্ত রেলগাড়ীর মত। মানুষ উহাতে উঠে আর নামে। আজ অমুক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিল, কাল সে মরিল। সচেতন করার ঘণ্টা দমে দমে বাজিতেছে। হাফেয বলেনঃ

مرا در منزل جاناں چه امن و عیش چوں هردم ـ جرس فریــادمی دارد که بر بنــدیــد محملهــا

"প্রিয়জনের বাড়ীতে আমার কি আনন্দ, কি আরাম, যখন প্রতিমুহূর্তে ঘণ্টাধ্বনি দেয়—আসবাব বাঁধ, প্রস্তুত হও।" অর্থাৎ, দুনিয়ার ধার লওয়া জীবনে আমি কি শান্তি পাইব? যখন মৃত্যুর তাকীদ কখনও কোন স্থানে আমাকে আরাম করিতে দেয় না। নিজের বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-কুটুম্বের মৃত্যুই সেই ঘণ্টা। তথাপি আমরা এমন অসতর্কতার নিদ্রায় বিভোর হইয়া রহিয়াছি যে, কোন উপদেশই গ্রহণ করি না।

অসতর্কতার চিকিৎসাঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বড় সংক্ষেপে এই অসতর্কতার চিকিৎসাপদ্ধতি বলিয়া দিয়াছেন যে, তোমরা ধ্যান কর—দুনিয়া অস্থায়ী, ভালোবাসার অযোগ্য; আর আখেরাত চিরস্থায়ী। নিজের গোনাহ্সমূহ হিসাব-নিকাশ এবং কবর হইতে পুনরুত্থিত হওয়া ইত্যাদি বিষয় চিন্তা কর। যেখানে ২৪ ঘণ্টা দুনিয়ার কাজ কর, সেখানে ৫টি মিনিট এই কাজের জন্য নির্ধারিত করিয়া লও। ইন্‌শাআল্লাহ্, এই ধ্যান-চিন্তার ফলে আখেরাতের প্রতি মহব্বতের যেসমস্ত লক্ষণ এ যাবৎ বর্ণনা করিলাম, সবকিছুই উৎপন্ন হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ, "অবশ্য অবশ্য আমি বিনিময় প্রদান করিব সেসমস্ত লোককে, যাহারা ছবর করে ...."

ছবরের অর্থ দৃঢ়পদ থাকা, আমাদের মধ্যে ইহারও ত্রুটি রহিয়াছে। একবার একটু নেক আমল করিলে একটু পরেই আর নাই, অর্থাৎ, স্থায়িত্ব নাই। অতঃপর বলেনঃ "তাহাদের নেক আমলের কারণে।" অতএব, বুঝা গেল, وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ "আল্লাহ্‌র নিকট যাহা আছে তাহা চিরস্থায়ী।" সেই স্থায়ী নেয়ামত লাভ করিবার পন্থা নেক আমল। এখন আমি বক্তব্য শেষ করিতেছি। আবার সারাংশ বলিতেছি, দুনিয়া অস্থায়ী এবং আখেরাত চিরস্থায়ী হওয়ার প্রতি যেমন বিশ্বাস আছে, তদ্রূপ ধ্যান কর যেন এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া যায়। এখন দো'আ করুন আল্লাহ্ যেন আমাদিগকে নেক আমলের তাওফীক দান করেন। আমীন!!

■

হযরত থান্‌বী (রঃ)-এর নিজ গৃহ
১৩৩১ হিজরী, ১লা রজব

—সমাপ্ত—